সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য-বিচিত্রা

রথীন্দ্রনাথ রায়

॥ জিজ্ঞাসা ॥
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

নব সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬৮ | এপ্রিল ১৯৬১
দ্বিতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৭১ | অক্টোবর ১৯৬৪

প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে

সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

'সাহিত্য-বিচিত্রা' (প্রথম সংস্করণ) প্রায় তিন বছর হলো নিঃশেষিত হয়েছে। কতকগুলি অনিবার্য কারণে বর্তমান সংস্করণের প্রকাশ বিলম্বিত হলো। বর্তমান সংস্করণকে সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ বলা যায়। পূর্ববর্তী সংস্করণের তিনটি প্রবন্ধকে এখানে সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করা হয়েছে। চারটি প্রবন্ধ বর্জিত হয়েছে। তাদের বদলে নূতন আটটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ এর আগে বিবিধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'জিজ্ঞাসা'র আদর্শনিষ্ঠ প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড এই বই প্রকাশে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। শ্রীগোপাল প্রেসের শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বহু অপূর্ণতা সত্ত্বেও 'সাহিত্য-বিচিত্রা'র পূর্ববর্তী সংস্করণ সুধীসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বর্তমান সংস্করণটিও যদি তাঁদের সস্নেহ অনুমোদন লাভ করে তা হলে শ্রম সার্থক হলো মনে করব।

তৃতীয় সংস্করণ

'সাহিত্য-বিচিত্রা' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। পূর্ববর্তী সংস্করণকেই পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মতোই সুধী সমাজের স্নেহদৃষ্টি লাভ করলে কৃতার্থ হব।

৬ সি রামকৃষ্ণ লেন
কলকাতা-৩
মহালয়া, ১৩৭১

রথীন্দ্রনাথ রায়

লেখকের অন্যান্য বই

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

ছোটগল্পের কথা

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার

॥ সূচীপত্র ॥

বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের সমুন্নত ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ কর্মময় জীবনের এমন একটি তীব্রোজ্জ্বল মহিমা আছে, যা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তাঁর বহুবিচিত্র জীবনের ঋজুতা ও বিশালত্ব এমন অভিভূত করে যে, বৈচিত্র্যের দিকটি তেমন চোখে পড়ে না। বনস্পতির সামগ্রিক বিস্তৃতি ও বিশালতাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আলাদা করে তার প্রতিটি অংশ এক নিমেষে চোখে পড়া সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাই মোহিতলালের মনে হয়েছে: 'সেকালে তাঁহার জীবদ্দশায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সেই সারস্বত রূপ কেহ দেখিবার অবকাশ পায় নাই—পর্বতের শিখরই সকলে দেখিয়াছিল, সানুদেশ দেখে নাই!' বিদ্যাসাগরের সারস্বত-সাধনা সম্পর্কে আলোচনার এক প্রধান অন্তরায় হলো তাঁর অভ্রভেদী ব্যক্তিত্বের বিদ্যুদ্‌গর্ভ রূপ। অপরপক্ষে আর একটি কথাও বিবেচ্য। তাঁর এই সারস্বত-সাধনাকে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মসাধনা থেকে পৃথক করে দেখাও সম্ভব নয়।

তিনি ছিলেন কর্মযোগী। যুক্তিবাদ ও বাস্তববুদ্ধি ছিল তাঁর এই কর্মযোগের দুটি বীজমন্ত্র। সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, সারস্বত-সাধনা প্রভৃতি সমস্ত-কিছুর মূলে ছিল তাঁর বাস্তববুদ্ধি। তিনি নিজের কাল ও আগামী কালকে একই চিন্তাসূত্রে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। সমকালীন যুগের প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য করে তাঁর সমস্ত কর্মপদ্ধতি পরিচালিত হয়েছে। তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক-প্রেরণার জন্য লেখনী ধারণ করেন নি। বিচিত্র কর্ম-প্রচেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যই তাঁর গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছে। গ্রন্থ রচনা না করে যদি তিনি কার্যসিদ্ধি করতে পারতেন, তা হলে তিনি হয়তো এই পথে মোটেই অগ্রসর হতেন না। পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষাপ্রসারে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। তাই তিনি এই অভাব দূর করার জন্য অক্লান্ত লেখনী ধারণ করেছিলেন; তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা অর্ধ-শতাধিক। পাঠ্যগ্রন্থ রচনার অবকাশে তিনি বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন।

বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনের সময় তিনি প্রতিপক্ষদের বিরোধিতার উত্তর দিতে গিয়ে যে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন, তাদেরও একটি স্বতন্ত্র আস্বাদন আছে।

পাঠ্যপুস্তক ও বাদপ্রতিবাদমূলক পুস্তিকাগুলি বিদ্যাসাগর প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় হিসেবেই রচনা করেছিলেন। প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর কোনো রচনাতেই নেই। মাত্র দুটি রচনায় এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়ঃ 'আত্মচরিত' ও 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ'। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেও একটি বিষয় লক্ষণীয়। আত্মজীবন-চরিত দুটি পরিচ্ছেদের বেশী অগ্রসর হয় নি। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থটি শেষ করার কোনো প্রেরণাই তিনি অনুভব করেন নি। আলস্য ও অবসাদ যে তাঁর গ্রন্থ শেষ করার প্রতিকূলে দাঁড়িয়েছিল, এ কথা অবিশ্বাস্য। কারণ তাঁর অক্লান্ত কর্ম-সাধনা কোনোদিনই পশ্চাৎপদ হয় নি, কোনো কাজই তিনি ফেলে রাখতে জানতেন না। 'আত্মচরিত' রচনায় হাত দেওয়ার আগে ও পরে তিনি বহুবার লেখনী ধারণ করেছেন, কিন্তু 'আত্মচরিত' শেষ করার কোনো প্রেরণা অনুভব করেন নি। এর কারণ নিঃসন্দেহে উদ্যমের অভাব নয়। এর প্রধান কারণ হলো, প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনায় তিনি কোনোদিনই প্রেরণা অনুভব করেন নি। লেখনী চালনার দ্বারা তিনি তাঁর অনলস কর্ম-সাধনাকেই অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন। আত্মজীবন-চরিতের সঙ্গে তাঁর কর্মের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ নেই। তাই বিদ্যাসাগর একবার কৌতূহল-বশে লেখনী ধারণ করে, তার পরেই লেখনী সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এর থেকে আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী তাঁর কর্মসাধনারই রূপভেদ মাত্র। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ'-ও একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—ছোট্ট একটি শোকমূলক স্মৃতি-কাহিনী বললেও অত্যুক্তি হয় না। কর্মঘন জীবনের কঠিন শিলাখণ্ডের অন্তরালে যে করুণাকাতর গোপন বেদনার উৎস ছিল, তিন বৎসরের একটি শিশুর মৃত্যু অবলম্বন করে সেই উৎসই লেখনীমুখে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও বিদ্যাসাগর-মানসের সত্যটি অনুপস্থিত নয়। এ রচনাটিও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। যে কারণে তিনি

আত্মজীবন চরিত শেষ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কতকটা সেই কারণেই তিনি 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' প্রকাশ করার কোনো তাগিদ অনুভব করেন নি। অথচ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের মূলসূত্রগুলি এত স্পষ্ট করে আর কোথায় উচ্চারিত হয়েছে ?

আসল কথা কর্মের মধ্যেই তিনি তাঁর অভ্রভেদী জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাত্র দু'বার তিনি আপন মনে কর্মনিরপেক্ষভাবে আত্মচরিত উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন। একবার অর্ধপথেই থেমে গেল, আর একবার তাঁর মানস-সংঘাতের চূড়ান্ত মুহূর্তে আঘাতে-বেদনায় রক্ত-কমলের মতো যে ব্যথার অর্ঘ্য ফুটে উঠল, তাও তিনি লোকচক্ষুর অগোচরেই রেখে গেলেন! এই অসাধারণ কর্মযোগী চিরকাল অপরের কথাই বলেছেন, নিজের কথা বলতে গিয়ে তাই তাঁর থামতে হয়েছে—যেটুকু লেখা হয়েছিল তাকে তিনি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন নি। হয়তো বা 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' নিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার কোনো মূল্যই তাঁর চোখে পড়ে নি। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধার নিজের কথা ভাবার অবকাশ কোথায়? তা ছাড়া সৈনিকের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য চিন্তা করা স্বধর্মচ্যুতিও বটে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীরাও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই লেখনী ধারণ করেছিলেন, রামমোহনের রচনা সম্পর্কেও ঠিক সেই কথাই বলা চলে। বিদ্যাসাগরও প্রয়োজনবশেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী গদ্য-রচয়িতাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিরাট পার্থক্য ছিল। তাঁর সুকঠিন ও প্রবল পৌরুষের আড়ালে যেমন একটি করুণাকাতর মন ছিল, তেমনি তাঁর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখনীর নেপথ্যেও ছিল একটি শিল্পীমন। হয়তো তিনি এ সম্পর্কে মোটেই সচেতন ছিলেন না, কখন যে তাঁর রচনা প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে সাহিত্য হয়ে উঠেছে, তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি। পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ, বাদপ্রতিবাদমূলক পুস্তিকা—সর্বত্র উদ্দেশ্যই সুপ্রকট। কিন্তু উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠছিল বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পরূপ।

২

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব-চরিত' (১৮৪২-৪৭) নামক একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু সে গ্রন্থ ছাপা হয় নি। ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করে বইখানি লেখা হয়। উক্ত কলেজ-কর্তৃপক্ষের খ্রীষ্টানী সংস্কার এই কৃষ্ণচরিতখানির মুদ্রণের অন্তরায় হয়েছিল। গ্রন্থটি মুদ্রিত তো হয়ই নি, অধিকন্তু তার পাণ্ডুলিপিরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখক বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "বাসুদেব চরিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। বাসুদেব চরিতে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত; কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল ভাষান্তরিত। ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক; লিপিমাধুর্যে ও ভাষা-সৌন্দর্যে মূল সৃষ্টি সৌন্দর্যের সমীপবর্তী।"

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পূর্ববর্তী গদ্য-গ্রন্থগুলির তুলনায় 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র ভাষা অনেক সরল ও স্বচ্ছন্দ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত ও মুদ্রিত হিন্দী 'বৈতাল-পচ্চিসী' অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত হয়। কিন্তু হিন্দীর সঙ্গে বাংলা গ্রন্থের পার্থক্যও কম নয়। হিন্দী গ্রন্থের কোনো কোনো কাহিনীকে তিনি সংক্ষিপ্ত করেছেন, তা ছাড়া পূর্বোক্ত গ্রন্থের অশ্লীল অংশগুলিও বাংলা গ্রন্থে বর্জন করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অধিকার ছিল, তবু তিনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বন না করে হিন্দী অনুবাদের আশ্রয় কেন গ্রহণ করলেন, এবিষয়ে বিদ্যাসাগর-জীবনীকার বিহারীলাল সরকার আলোকপাত করেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বয়ং সুগভীর সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও, মূল সংস্কৃত প্রসঙ্গের অনুবাদ না করিয়া, অনুবাদিত হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করিলেন কেন, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এই সময় তিনি হিন্দী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় স্বরূপই বোধ হয় হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ। বস্তুতই অনূদিত 'বেতালে' তাঁহার নবার্জিত হিন্দী ভাষাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র একটি কাহিনীরসও আছে। সম্ভবত, ধর্ম ও নীতি-নিরপেক্ষ কাহিনীগুলি বিদেশী পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারে, এ ধারণাও তাঁর ছিল। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভাষা শ্রুতিকঠোর ও সমাস-সমন্বিত ছিল। পরবর্তী সংস্করণে এই ভাষাকে তিনি অনেকখানি মার্জিত করেছেন। শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটা থেকে মুক্ত হয়ে ভাষার লালিত্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দুই-ই বেড়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবযুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহাস-চেতনার উদ্ভব ও ইতিহাস গবেষণার বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণ। বিদ্যাসাগর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো ইতিহাস গবেষণা করেন নি সত্য, কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের অভাব অনুভব করেন। মার্শম্যান রচিত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের একাদশ থেকে উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ করেন—সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ কাল থেকে আরম্ভ করে বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ হয়েও গ্রন্থটির মধ্যে অনুবাদের কোনো গন্ধ নেই। তিনি মার্শম্যানের মতবাদগুলিরও অনুবাদ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণের কোনো উদ্দেশ্যই তাঁর ছিল না। তাই ঐতিহাসিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিদ্যাসাগরকে দায়ী করা যায় না।

বিদ্যাসাগর চেম্বার্সের '**Biography**' গ্রন্থটি অবলম্বন করে 'জীবন-চরিত' (১৮৪৯) রচনা করেন। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ ন'জন জ্ঞানতপস্বী উদ্যমী পুরুষের জীবনী এখানে সঙ্কলিত হয়েছে। এখানে বিদেশীদের জীবনকাহিনীই বর্ণিত হয়েছে, এই মর্মে কেউ কেউ এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্যও করেছিলেন। কিন্তু এতে বিদ্যাসাগর-চরিতের একটি মূল রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হবে। বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন, সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন; পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন খাঁটি হিন্দু ব্রাহ্মণ, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনায় ও শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক। আধ্যাত্মিকতার নাগপাশ থেকে বিদ্যাকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর সাধনা। যে সমস্ত বিদেশী জ্ঞানতাপস বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পৌরুষের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যাসাগরের

দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি এই সমস্ত পাশ্চাত্য মনীষীর জীবনের সঙ্গে হয়তো কোথায়ও নিজের জীবনের সাদৃশ্য অনুভব করেছিলেন। ছাত্ররা যাতে ঐ সমস্ত জীবনাদর্শ থেকে উৎসাহিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বোধোদয়' (১৮৫১) বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে বেথুন স্কুলের জন্য রচিত হয়। লেখক উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপনেই বলেছিলেন : "বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি তদ্‌পাঠে, অমূলক গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।" বোধোদয় অনুবাদমূলক গ্রন্থ হলেও ছাত্র-সমাজের সম্মুখে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বত্রিশ বছরে একাশীটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়, এই থেকেই এর জনপ্রিয়তা অনুমান করা যায়।

'বোধোদয়' প্রকাশের কিছুকাল আগে থেকেই বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তিনি এই অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বিদ্যাসাগর আর অনুবাদকার্যে অগ্রসর হননি। আদি পর্বের প্রথম যে বাষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেন, তা পুস্তকাকারে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন মহাভারতের ভূমিকায় বলেছেন : "বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।'—কালীপ্রসন্নের অনুবাদের পিছনে যে বিদ্যাসাগরের কত বড় সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

৩

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রথম মৌলিক রচনা 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' মুদ্রিত হয়েছিল। এর দু'বছর আগে তিনি

বীটন সোসাইটিতে প্রবন্ধটি পাঠ করেন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে গ্রন্থটির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এই অতি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি সংস্কৃত সাহিত্যের সন তারিখযুক্ত কালানুক্রমিক ইতিহাস নয়; বিষয়ানুসারে তিনি পাঁচটি ভাগ করেছেন: মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, চম্পূকাব্য, দৃশ্যকাব্য ও নীতিগ্রন্থ। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন, তার কিছুকাল আগে থেকেই য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী হন। তাঁদের অনলস গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের লুপ্ত-প্রায় অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদ্যাসাগর জোনস্‌, ম্যাক্‌সমূলর প্রমুখ পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মনে সংস্কৃতসাহিত্যের ক্লাসিকগুলিকে অনুবাদের আকাঙ্ক্ষা জাগে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' নাটক অবলম্বন করে তিনি 'শকুন্তলা' আখ্যায়িকা (১৮৫৪) রচনা করেন। কালিদাসের মূল গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা এক দুঃসাহসিকতার ব্যাপার। তাই বিদ্যাসাগর সে পথ বর্জন করেছেন। তিনি মূলগ্রন্থের আখ্যায়িকা-রসটিকে শুধু বাংলা ভাষায় পরিবেশণ করেছেন। 'শকুন্তলা'র বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তাঁর কর্তব্যের দুরূহতার কথা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন:

"ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।"

কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' তথাকথিত অনুবাদগ্রন্থ নয়, একজাতীয় নূতন সৃষ্টিই। নাটককে আখ্যায়িকায় পরিণত করতে গিয়ে তিনি আখ্যায়িকাকে নাটকীয় রসমণ্ডিত করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ এখানে দুইই আছে। নান্দী, প্রস্তাবনা ও পাত্র প্রবেশ প্রভৃতি অংশ পরিত্যাগ করে সরাসরি কাহিনী শুরু করে দিয়েছেন—বাহুল্যবর্জিত গল্পবলার ঢঙে তিনি কাহিনী বিবৃত করেছেন। মূল নাটকের সাত অঙ্ক এখানে সাতটি পরিচ্ছেদে পরিণত

হয়েছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিকগুলিকে সাধারণের জন্য সহজভাবে পরিবেষণ করার রীতি প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগর সম্ভবত সেই জাতীয় আদর্শের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'শকুন্তলা' আখ্যায়িকায় তিনি অলৌকিক ঘটনা যতদূর সম্ভব বর্জন করেছিলেন। 'শকুন্তলা'র গদ্যরীতি যেমন স্থললিত তেমনি শিল্পসুষমামণ্ডিত। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি এখানে বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

'শকুন্তলা' রচনার পর বিদ্যাসাগরের জীবনে চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। এ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর যা রচনা করেছেন, তা প্রধানত পাঠ্য পুস্তক ও অনুবাদমূলক গ্রন্থ। কিন্তু এবার তিনি বৃহত্তর সমাজ-বিপ্লবের জন্য অস্ত্র ধারণ করলেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত তাঁর দুখানি পুস্তিকাই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক পুস্তিকাগুলি স্বতন্ত্র বিচারের অপেক্ষা রাখে। একদিকে যেমন তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও তিনি বিরতি দেননি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কথামালা' এবং 'চরিতাবলী'—দুখানি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়।

'কথামালা' রেভাঃ টমাস জেমস্ সম্পাদিত 'ঈসপ্‌স ফেবল্' অবলম্বনে রচিত হয়। ঈসপের নামে প্রচলিত গল্পগুলি য়ুরোপখণ্ডে দীর্ঘকালব্যাপী ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। গল্পগুলির মধ্যে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যেমন আছে তেমনি একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগর গল্পগুলির বৈদেশিক আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ বাঙালীর পরিবেশে পরিণত করেছেন। আসলে যে গল্পগুলি বিদেশী এ কথা আমরা ভুলেই যাই। নিঃসন্দেহে বিদেশী গল্পগুলিকে দেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের।

'চরিতাবলী'তে বিশজন য়ুরোপীয় মনীষীর জীবনী সঙ্কলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "সংক্ষেপে, সরল ভাষায় কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালকদিগের লেখাপড়ার অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।" স্বাবলম্বী, অধ্যবসায়ী, আত্মশক্তি-নির্ভর

চরিত্রগুলি যাতে বাঙালী ছাত্রদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাই ছিল বিদ্যাসাগরের আকাঙ্ক্ষা।

বিদ্যাসাগরের আর একখানি খ্যাতনামা গ্রন্থ 'সীতার বনবাস', ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি কোনো বিশেষ একখানি গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয় নি। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে গৃহীত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ প্রধানত বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কার বিরুদ্ধ, তাই ভবভূতি তাঁর নাটকের উপসংহারে রাম-সীতার মিলন দেখিয়েছেন। 'সীতার বনবাস' বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা। বিদ্যাসাগরের যুক্তিনিষ্ঠ মন 'পাতাল প্রবেশ' বৃত্তান্তকেও অলৌকিক ও আকস্মিক কাহিনী হিসেবে বর্জন করেছে। সীতার দৈহিক মৃত্যুই তিনি বর্ণনা করেছেন: "বাল্মীকিও সীতার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাঁহার সমুদয় প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন সীতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।" ভবভূতির ছায়াসীতার দৃশ্যটিও বিদ্যাসাগর বর্জন করেছেন। এখানেও যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ। রাম-সীতা চরিত্রকে তিনি রক্তমাংসের মানব-মানবীর চরিত্রেই পরিণত করতে চেয়েছেন। 'শকুন্তলা'র তুলনায় 'সীতার বনবাসে'র ভাষা অনেক বেশী গুরুগম্ভীর।

'আখ্যান মঞ্জরী'র (১৮৬৩-৬৪) মাধ্যমেও বিদ্যাসাগর ছাত্রদের জন্য গল্পরস পরিবেষণ করেন। পরবর্তীকালে নূতন কয়েকটি আখ্যায়িকা যুক্ত করা হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থের আর একটি ভাগ প্রকাশিত হয়। শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব্ এরার্স' নিয়ে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) রচনা করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের কৌতুকাবহ রোমান্সনাট্যের রসটিকে তিনি বাংলা ভাষায় পরিবেষণ করেছেন। কৌতুককর কাহিনী ও হাস্যরস পরিবেষণ করাই তাঁর অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন: "ভ্রান্তিপ্রহসন কাব্যাংশে, শেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যারপরনাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য

করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়।" 'ভ্রান্তিবিলাস' ইংরেজী নাটক অবলম্বনে রচিত হলেও বিদ্যাসাগর তাকে প্রাচ্যপরিচ্ছদে মণ্ডিত করেছেন। পটভূমিকা, ব্যক্তি ও স্থানের নামকরণে প্রাচীন ভারতের আস্বাদন পাওয়া যায়। ইংরেজী নাটকের প্রসঙ্গ না জানলে প্রাচীন সংস্কৃত আখ্যায়িকার অনুবাদ বলেই মনে হবে। ঐ বছরেই 'রামের রাজ্যাভিষেক' ছাপা শুরু হয়। কিন্তু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক' মুদ্রিত হচ্ছে জেনে বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থ মুদ্রণ বন্ধ করেন। প্রকৃত পক্ষে 'ভ্রান্তিবিলাস'ই বিদ্যাসাগর-রচিত স্কুল পাঠ্য শেষ পুস্তক।

৪

স্কুল পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বিদ্যাসাগর যে সমাজ-সংস্কার মূলক পুস্তিকাগুলি রচনা করেছিলেন, তাদের মূল্যও কম নয়। সে যুগে বাদ-প্রতিবাদমূলক পুস্তিকার অভাব ছিল না। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষে বিদ্যাসাগরের বাদ-প্রতিবাদমূলক পুস্তিকাগুলি তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তীদের এই শ্রেণীর গ্রন্থাবলীকে অতিক্রম করেছে। রামমোহনের বাংলা গ্রন্থ ও পুস্তিকাগুলি অধিকাংশই প্রচার পুস্তিকা। তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মতামত খণ্ডন করেছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ড পীড়ন' (১৮২৩) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭) পুস্তিকা দুটি রামমোহনের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে রচিত বিতর্কমূলক গ্রন্থ। কিন্তু এই সমস্ত বিতর্ক পুস্তিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাগুলির তুলনা করলেই পার্থক্য সহজেই চোখ পড়ে।

বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে পুস্তিকা রচনার প্রায় পাঁচবছর আগে 'বাল্য-বিবাহের দোষ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর যুক্তিতর্ক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধটিকেই পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকাদ্বয়ের ভূমিকা বলা যায়। এই প্রবন্ধেই সংস্কারের অচলায়তনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। এই প্রবন্ধের পাঁচবছর পরে (১৮৫৫) বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। বিদ্যাসাগর

নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এ দেশে শাস্ত্রীয় সংস্কার এত প্রবল যে, বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিবাদীকেও শাস্ত্র-পুরাণের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। প্রথম প্রস্তাবের শেষে বিদ্যাসাগর বাস্তবের দিক থেকেও সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন: "বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণার নিবারণ, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের পরিহার ও তিন কুলের কলঙ্কবিমোচন হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।"

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধবাদীরাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। প্রতিবাদমূলক বহু পুস্তিকা তখন রচিত হয়েছিল। বেশীরভাগ পুস্তিকাই সংস্কৃতে রচিত হওয়ার জন্য সাধারণ লোকের কাছে চিরকালের মতো দুর্বোধ্যই থেকে গেল। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলিকে জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন, সংস্কৃত শ্লোককে সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। বাহুল্য-বর্জিত সহজ অনাড়ম্বর ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও ঋজু তেমনি সর্বপ্রকার গুরুভারমুক্ত। সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বিদ্যাসাগরের বক্তব্য মোটেই দুরূহ ও দুর্বোধ্য ছিল না।

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তিকাকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের পর তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষরা যে ভাবে তাঁকে অসংযত ও হীন আক্রমণ করেছিলেন, তার জবাব দিতে গিয়ে দ্বিতীয় পুস্তিকার ভাষা মাঝে মাঝে উগ্র হয়ে উঠেছে। এই পুস্তিকায় শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বিস্তৃততর করা হয়েছে। শাস্ত্র-পুরাণ মন্থন করে যেভাবে তিনি বক্তব্যকে যুক্তিনিষ্ঠ ও ক্ষুরধার করে তুলেছিলেন তা বাংলা দেশে ও বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বিতর্কমূলক রচনার একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বক্তব্যের স্পষ্টতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্টতা বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক রচনা দুটির প্রধান গুণ। কিন্তু এইটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। যুক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণ-প্রবণতার সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত করুণা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। শুষ্ক যুক্তিতর্কও এই

অসাধারণ মানুষটির হৃদয়ের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পুস্তিকার উপসংহার অংশে যোদ্ধবেশের আড়ালে করুণাকাতর মানুষ বিদ্যাসাগরের যে আর্তকণ্ঠ শোনা যায় তার আবেদন চিরন্তন: "তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।...হায়, কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"

বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকা দুটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পনের বছর পরে বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা' বিচারের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (১৮৭১)। বাংলার যে সমস্ত কুলীনের একাধিক বিবাহ, তার তালিকাও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই তালিকা বহুবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁকে প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিরত্ন, মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরত্ন প্রমুখ অনেকেই তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। তর্কবাচস্পতি ছাড়া অন্য সকলে বাংলায় লিখেছিলেন। প্রতিবাদীদের মত খণ্ডনের জন্য বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন (১৮৭২)।

বহুবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর বেনামীতে দুখানি বিদ্রূপাত্মক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন: 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) ও 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। রচয়িতার নামের জায়গায় লেখা ছিল 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত'। দুটি পুস্তিকাই তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে আক্রমণ করে লেখা হয়েছে। বিতর্কের বিষয় এখানে গৌণ, ব্যক্তিগত আক্রমণটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রথম পুস্তিকায় তর্কবাচস্পতির বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে বিদ্রূপকটাক্ষ ও দ্বিতীয় পুস্তিকায় পাইকপাড়া রাজবাড়ীর ঘটনা উল্লেখ করে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অতিমাত্রায় উগ্র। পুস্তিকা দুটিতে

কোনো আবরণ বা রূপক নেই, সরাসরি ভাবেই আক্রমণ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের শেষজীবনে যে তিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, এই সময়েই যে তার সূত্রপাত হয়েছে, তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু পুস্তিকা দুটির মূল্য অন্য কারণে। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি যে একটি পর্যায়ে এসেই তুষার-স্তূপের মতো নিশ্চল হয়ে ছিল না, বিষয়ানুসারে যে তার রূপ ও রীতি পরিবর্তিত হতো তার প্রমাণ বিভিন্ন রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। 'সীতার বনবাসে'র মহিমাম্বুগম্ভীর মেদমন্থর ভাষা ও 'অতি অল্প হইল' পুস্তিকার দ্রুত-তালমণ্ডিত কথ্যভাষা যে একই হাতের রচনা এ কথা যেন বিশ্বাস করাই যায় না। বিদ্যাসাগরের জাদুমন্ত্রে তা অনায়াসে সম্ভব হয়েছে।

৫

পাঠ্যপুস্তক ও বিতর্কমূলক পুস্তিকা ছাড়া দুখানি মৌলিক গ্রন্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'বিদ্যাসাগর চরিত' ও 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' দুটি রচনাই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যাসাগর চরিত' অসম্পূর্ণ রচনা। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ভূমিকায় জানিয়েছেন: "তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণমাত্র লিপিবদ্ধ আছে।" এই অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞাপন থেকে বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ 'আত্মচরিত'খানির মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এত বড়ো কর্মী পুরুষের সারস্বত সাধনা তাঁর কর্মেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু আত্মজীবন-চরিত তাঁর বৃহত্তর কর্মজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় হিসেবে রচিত হয় নি। পাঠ্যপুস্তকের অভাবপূরণ অথবা সামাজিক বিতর্ক, কোনোটিই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই 'আত্মচরিত' গ্রন্থে কর্মী পুরুষ নয়, মানুষ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিরহস্যের যতটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার মূল্যও কম নয়! পিতৃমাতৃকুলের যে কয়েকটি চরিত্রকে তিনি স্বল্পরেখায় এঁকেছেন, তা যেমন উজ্জ্বল তেমনি মহিমান্বিত। কঠোর দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা দৃঢ়তা ও চরিত্রবল হারান নি। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের দেহ ও মনের বলিষ্ঠতায় দারিদ্র্যও ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে। প্রভাবশালী শ্যালকের

বিমুখতা ও আক্রোশ তাঁর উন্নতশিরকে কখনো নত করেনি। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রটি প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য : "আমরা তাঁহার চরিত্র-বর্ণনা বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিলাম। তাহার কারণ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়-সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ড-ভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

পিতামহী দুর্গাদেবীও স্বামীর যোগ্যা সহধর্মিণীই ছিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই নিঃসহায় মহিলা কোনো রকমে চরকায় সুতো কেটে ও সুতো বেচে জীবিকানির্বাহ করেছেন। পিতা ঠাকুরদাসেরও প্রথম জীবনের যতটুকু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। সততা ও চরিত্রবলের দ্বারা তিনি দারিদ্র্যকেও অলঙ্কারে পরিণত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-চরিতের উপাদান তাঁর পিতৃ-মাতৃকুলের মধ্যেই বীজাকারে নিহিত ছিল। সেই বীজই ভবিষ্যতের অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষটিকে ঋজু ও উন্নত মহিমায় রচনা করেছিল।

পিতা ঠাকুরদাস চাকরীর সন্ধানে অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন, সেই সময় "একজন মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী" দই মুড়কি দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।" আর একটি ছবিও বালক বিদ্যাসাগরের চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বড়বাজারের জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর ও তাঁর পিতা আশ্রয় নিয়েছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণি তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন করেছিলেন। উত্তরকালে 'আত্মচরিতে' বিদ্যাসাগর রাইমণি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়ন গোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে

করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ দয়া সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" স্ত্রীজাতির প্রতি এই কৃতজ্ঞতাবোধ বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তাঁর সামাজিক আন্দোলনগুলির মূলে আছে বন্দিনী নারীর শৃঙ্খল মোচনের কাহিনী। নবযুগের হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের জীবনাচরণের ভিত্তি এই জাতীয় বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তারই দুটি কাহিনী 'আত্মচরিতে' শ্রদ্ধায় মমতায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত 'আত্মচরিতে' তাঁর গদ্যরীতিরও একটি বিশেষ পরিণাম লক্ষণীয়। সমাসবদ্ধ ও শব্দমন্থর ভাষার কোনো লক্ষণই এখানে নেই। গদ্যরীতি এখানে অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছন্দ। 'আত্মচরিতে' যেমন পূর্বপুরুষদের এবং নিজের সম্পর্কে কোনো রকম অতিরিক্ত রঙ্‌ফলানোর চেষ্টা নেই, ভাষাও তদুপযোগী হয়েছে।—এ ভাষা সহজ বিবৃতিরই ভাষা। শিল্পসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস পর্যন্ত যেন এখানে অনুপস্থিত। বিদ্যাসাগর তাঁর জন্মের সুবিদিত কাহিনীকে এমনভাবে বিবৃত করেছেন, যাতে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের পরিহাসনৈপুণ্য 'আত্মচরিতে'ও উদ্ভাসিত হয়েছে। 'এঁড়ে গরু'র প্রসঙ্গে নিজের সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, তা যেমন তাঁর সরস রসিকতার পরিচয় দেয়, তেমনি ব্যক্তি চরিত্রের উপর আলোকপাত করে: "জন্ম সময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে আমার বৃষরাশিতে জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।" বিদ্যাসাগরের অন্যান্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের আস্বাদন এমনভাবে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের উষ্ণ সান্নিধ্যই তাঁর অসম্পূর্ণ 'আত্মচরিত'কে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল না। যোদ্ধার জীবনে সংগ্রামই একমাত্র সত্য, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আলোচনার স্থান

যুদ্ধক্ষেত্র নয়। ব্যক্তির চেয়ে সেখানে বৃহতের আহ্বান অনেক বড়ো। তাই দুটি পরিচ্ছেদের পরে তাঁর 'আত্মচরিত' আর অগ্রসর হয়নি। তবু বিদ্যাসাগর 'আত্মচরিত' লিখতে শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করার অবকাশ আর হয় নি। তাঁর শিল্প সাহিত্যের এত বড়ো ভাবুকতা কোনোদিন নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায় নি।—নিজের হৃদয়কে দেখার সুযোগও তাঁর হয়নি। তাই এক এক সময় মনে হয়, বিদ্যাসাগর যদি নিজের কথা বলার সুযোগ পেতেন, তা হলে সাহিত্যিক ও মানুষ বিদ্যাসাগরকে আরো বেশী করে পাওয়া যেতো। বাংলা সাহিত্যও এতে লাভবান হতো। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক জীবনে এর চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি আর নেই। এত বড়ো শিল্পী, কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁর শিল্প-সাধনা খর্ব করতে হয়েছে, জাতির কথা দেশের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলার আকাঙ্ক্ষাকেও সংবরণ করতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর দেশ ও জাতির জন্য তাঁর ব্যক্তিজীবনের সুখ সম্পদ বিসর্জন দিয়েছিলেন—তাঁর অন্তর্জীবনের মহিমাসমৃদ্ধ শিল্পসাধনাকে সেই একই যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডির সমুন্নত মহিমা। আত্মচরিতখানিকে সম্পূর্ণ করতে পারলে সে যুগের অনেক বিরল চিত্র ও তারচেয়েও মূল্যবান বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবন পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হতে পারতো। বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু সেই বঞ্চনাই বিদ্যাসাগর-চরিত্ররহস্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সে যুগ বাঙালীর আত্ম-সম্প্রসারণ ও আত্মোদ্ঘাটনের যুগ। রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী তাঁদের মূল্যবান আত্মচরিত লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মানসপদ্ধতি ও কর্মপদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। কর্মই তাঁর আত্মজীবনী। আত্মার ঐশ্বর্যের উপরে কর্মের বিশাল স্থাপত্যকীর্তি।

অসমাপ্ত আত্মচরিতের অপূর্ণতার বেদনা 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' এর দ্বারা খানিকটা পূরণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে মাত্র একবারের জন্য তাঁর হৃদয়গুহার পাষাণকপাট উন্মুক্ত হয়েছে। বেদনাক্ষুব্ধ মানুষটির নেপথ্য-লীলার যে বিষণ্নমহিম স্বরূপ এখানে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তার তুলনা নেই। বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনবৎসরের কন্যা প্রভাবতীর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মানবমূর্তির এমন

অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর আর কোনো রচনায় পাওয়া যায় না। প্রভাবতীর দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাটো ছবি স্মৃতিবেদনায় অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগরের মর্ত্যমমতার এই অশ্রুলিখনটি শুধু Milk of human kindness-ই নয়, তাঁর সমগ্র সত্তার সংহত রূপ। জনারণ্য থেকে বহুদূরে নিজের নির্জন মনের দুর্গম গুহায় এই নিঃসঙ্গ পুরুষসিংহের শেষ সঙ্গিনী হারানোর বেদনা এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে: "বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই। যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে আমাদের মতো, অবিরত দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র শোকমূলক রচনাটির মূল্য এইখানেই নিঃশেষিত নয় বিদ্যাসাগর-মানসের একটি নূতন দিক—শুধু নূতন দিক নয়, একটি জটিলতর দিক এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রবন্ধ রচনার ইতিহাস সম্পর্কে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য: "এই সময়ে নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।" এই মন্তব্যটি বিদ্যাসাগর চরিতের উপর নূতন আলোকপাত করবে। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন তিক্ততায় ভরে উঠেছিল। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে কর্মরূপ দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন, কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় নি। তিনি প্রতি পদক্ষেপে পেয়েছেন দুস্তর বাধা, প্রবল প্রতিরোধ। পারিবারিক জীবনেও নানা অশান্তি দেখা দিয়েছিল। জামাতার অকাল মৃত্যু, পুত্রের সঙ্গে মনান্তর, উপকৃত ব্যক্তির অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি তাঁর শেষ জীবনকে কণ্টকিত করে তুলেছিল। তাই কলকাতার তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে তিনি শেষ জীবনের অনেক সময় কার্মাটাঁড়ে সাঁওতালদের সাহচর্যে শান্তি লাভ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেখানেও নিন্দুকের রসনা বিষবর্ষণ করতে বিরত হয়নি। তিন বছরের বন্ধুকন্যাটিকে আশ্রয় করে তিনি এই সমস্ত

প্রসঙ্গ ভুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আশ্রয়ও যখন নিষ্ঠুর মৃত্যু কেড়ে নিল, তখন বিদ্যাসাগর সেই মর্মান্তিক শোককে বাণীমূর্তি দিয়েছেন।

এই সময়ে তিনি যে আত্মিকসঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন তার উল্লেখও এখানে আছে: "বৎসে! কিছুদিন হইল, আমি নানাকারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোনও অংশে কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম।" বিদ্যাসাগরের বেদনার্ত অন্তর্জীবনের এমন করুণ ছবি আর নেই। বিদ্যাসাগর আপন দুর্জয় শক্তিবলে জগৎবিধানের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, সকলের দুঃখের বোঝা একা বহন করতে চেয়েছেন। তার ফলে জগৎবিধানের কুপিত প্রতিক্রিয়া তাঁকে চরম আঘাত হেনেছিল। সেই আঘাত মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরকে সংশয়শিলার নিষ্ঠুরতটে নিক্ষেপ করেছিল। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' সেই সংশয়ক্লিষ্ট মানবপ্রেমিকের বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস!

৬

বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের দানের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।" পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যলেখকদের রীতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করলেই রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়।

করেছিলেন, তাই তাঁর যতিস্থাপন সম্পর্কে কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ মাত্র একটি মন্তব্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন : "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন"—বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলাগদ্য সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশে অক্ষম ছিল। তার কারণ বাংলাগদ্য তখন ছিল 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা'র মতো —কোনো নীতি-নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না—কতকগুলি শব্দ ও বাক্যকে যেমন-তেমন করে রাখা হতো। বিদ্যাসাগর যতিসম্পর্কে সচেতন হয়ে বাক্যাংশকে 'সুবিভক্ত' করেছেন—তার ফলে বাক্যের অর্থও পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থ ও শ্বাসকে বিশেষ নিয়মের অধীন করার জন্য গদ্যের মধ্যেও ধ্বনি-সুষমা ঝঙ্কৃত হয়েছে। বাক্যাংশগুলি 'সুবিভক্ত' হওয়ার জন্য সহজেই তারা 'সুবিন্যস্ত' হয়েছে। বিদ্যাসাগর শুধু বাক্যাংশগুলিকে বিরামচিহ্নের দ্বারা বিভক্তই করেন নি, অধিকন্তু তাদের সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। এই বিন্যাসের কৌশলে বিদ্যাসাগরের গদ্য শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের ভাষা সর্বপ্রকারের ভাবপ্রকাশের উপযোগী। পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা এই ভাষার দুটি অনন্যসাধারণ গুণ। অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর, সমাসবাহুল্য, অপরিচ্ছন্ন ও অযথা-জটিল গদ্যরীতি তিনি সর্বপ্রযত্নে পরিহার করেছেন। শব্দের অপব্যয় থেকে মুক্ত করে তিনি ভাষাকে 'সুপরিচ্ছন্ন' করেছেন। গদ্য প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, তাকে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত সব রকম কাজ করতে হয়। আতিশয্য-ভারাক্রান্ত হলে তার স্বচ্ছন্দচারণা ব্যাহত হয়। তাই গদ্যভাষার সংযত হতে হয়, আয়ত্ত করতে হয় লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণতা। ভাষাকে বিশেষণ-বাহুল্যে ও সমাসাড়ম্বরে মেদমন্থর করে তুললে তার 'সহজ-গতি ও কার্যকুশলতা' দুইই নষ্ট হয়। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি তাই বাহুল্য-বর্জিত ও 'সুসংযত'। 'শকুন্তলা'র প্রারম্ভ অংশটি লক্ষ্য করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে :

"অতি পূর্বকালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের

অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুতবেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।"

নিঃসন্দেহে আধুনিকগদ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটিই এখানে পাওয়া যায়। বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে বাক্যাংশগুলি 'সুবিভক্ত' ও যথাযোগ্য স্থানে 'সুবিন্যস্ত' হয়েছে। সমাসাড়ম্বর ও অযথা শব্দবাহুল্য মুক্ত হয়ে বাক্যগুলি 'সুপরিচ্ছন্ন' ও 'সুসংযত' হয়েছে। ভাষার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গোটা অনুচ্ছেদে একটি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ অনুভব করা যায়। টুকরো টুকরো বাক্যাংশকে ছেঁড়াকাপড়ের কাঁথার মতো জোড়াতাড়া না দিয়ে এক অখণ্ড শিল্পকৌশলে গেঁথে তোলা হয়েছে। নমনীয়তা ও প্রবহমানতার ফলে ভাষার গতিপথ হয়েছে সুমসৃণ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর আড়ষ্ট ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোনো রক্তের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

৭

বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির যেমন ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি নানা বিচিত্র রীতির পরীক্ষাও যে তিনি করেছেন তাও অস্বীকার করা যায় না। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণে কমা চিহ্ন খুব বেশী ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এ বিষয়ে তিনি অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। কিছু কিছু আভিধানিক শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়—যেমন ডিণ্ডিম, মলিম্লুচ, উৎকলিকাকুল প্রভৃতি শব্দ। পরবর্তী সংস্করণে এমন অনেক অংশ আছে, যাকে আধুনিককালের সাধুভাষা হিসেবেও চালিয়ে দেওয়া সম্ভব :

"অনন্তর রাজা, মন্ত্রপ্রয়োগপূর্বক, সেই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র, দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল ; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন,

আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তাঁহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, প্রস্থান করিল।"

(বেতাল-পঞ্চবিংশতি, উপসংহার)

অনেকের ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কৃতবহুল। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব শব্দ ও ইডিয়ামের ব্যবহারও তাঁর রচনায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি 'শকুন্তলা' গ্রন্থে একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখানকার গদ্যরীতি যেমন স্থললিত তেমনি সুমসৃণ। অপ্রচলিত সংস্কৃতশব্দ এখানে নেই বললেই চলে। 'শকুন্তলা'র ভাষার সরলতা বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রথম দিকের রচনায় পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি ক্রমশ সরল হয়ে এসেছে। শকুন্তলা'র গদ্যরীতিতে সরলতার সঙ্গে মিশেছে লালিত্য ও মাধুর্য। 'শকুন্তলা' আখ্যায়িকার সংলাপ অংশে সরলতার কথ্যভাষার রূপটি অলক্ষিত নয়, স্বাভাবিকত্বেও সংলাপ অংশ অতুলনীয়—আধুনিক বাংলা গদ্যের চলতিভাষার স্বাদ পাওয়া যায়:

"ধীবর কহিল, অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমায় মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙ্‌টি পাইলাম বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, আমি ধীবর জাতি, মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর বলিল, আজ সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আঙ্‌টি দেখিতে পাইলাম। তারপর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময় আপনি আমায় ধরিলেন, আর আমি কিছুই জানি না; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।"

[শকুন্তলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

'জিজ্ঞাসিতেছি' ছাড়া আর কোনো শব্দ এখানে শ্রুতিকটু মনে হয় না। সাধারণ লোকের সহজ কথোপকথনের ভঙ্গিটি এখানে সহজেই আয়ত্ত করা হয়েছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি ও নারীচরিত্রদের ভাষা অধিকতর সহজ ও

স্বাভাবিক হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শকুন্তলা ও গৌতমীর কথোপকথনের অংশটি উল্লেখ করা যায়:

"কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! শুনিলাম আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুন্তলার সর্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবী হয়ে থাক।"

[শকুন্তলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষা এখানে আলাদা। বর্ণনায় সাধুভাষা ও সংলাপে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে শরৎচন্দ্রও এই রীতিতে তাঁর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সংলাপরীতির মধ্যে মাতৃহৃদয়ের অন্তরঙ্গ স্বর ফুটে উঠেছে। 'শকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগরী রীতির চূড়ান্ত সিদ্ধি।

কিন্তু 'শকুন্তলা'র পরে বিদ্যাসাগরীয় গদ্য সহজরীতি পরিত্যাগ করে গুরুগম্ভীর রীতি অবলম্বন করেছে। মাঝখানে তিনি মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশ অনুবাদ করেছেন। হয়তো মহাভারতীয় গাম্ভীর্য তাঁর ভাষার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। 'শকুন্তলা'র ভাষা 'সীতার বনবাস'-এর ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে অনেকখানি। 'সীতার বনবাস'-এর গদ্যরীতি গুরুগম্ভীর। আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যেও নাটকীয়তা কম। কিন্তু 'সীতার বনবাস'-এর এক একটি স্মৃতিমন্থর দীর্ঘশ্বাস অপূর্ব চিত্র সৃষ্টি করেছে:

"লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সততসঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড়নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

[সীতার বনবাস, প্রথম পরিচ্ছেদ]

'সীতার বনবাস'-এর ভাষার লালিত্য ও মসৃণতার অভাব নেই, কিন্তু

রত্নালঙ্কারে ও মহার্ঘ ভূষণে এ ভাষার রাজকীয় গাম্ভীর্য, মন্থর পদক্ষেপে ধ্রুপদী আভিজাত্য। 'শকুন্তলা'র গদ্যরীতি যেন মেঘমুক্ত শরতাকাশের সূর্যকরোজ্জ্বল স্বচ্ছনীলিমা, 'সীতার বনবাসে'র গদ্যরীতি যেন বর্ষাকাশের অশ্রুগম্ভীর মেঘমালা। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র গদ্যরীতির যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তার আর একটি কারণও আছে। এই দুটি আখ্যায়িকার মধ্যে রসের পার্থক্য আছে। কালিদাস ও ভবভূতির কবিমানসের তুলনামূলক আলোচনা করলে এই দুটি আখ্যায়িকার রীতিগত পার্থক্যের কারণ দেখা যায়। 'শকুন্তলা' মাধুর্যরসের নাটক, 'উত্তর চরিত' করুণরসের। 'শকুন্তলা'য় তরুণী ঋষিকন্যা ও দুষ্মন্তের প্রেমলীলা ও সম্ভোগবিলাস দৈবাহত হয়ে কিভাবে মঙ্গলমিলনে পরিণত হয়েছে, তারই কাহিনী। 'উত্তর চরিত' স্মৃতিবেদনার কাব্য—স্মৃতিমথিত দীর্ঘশ্বাসই তার ফলশ্রুতি। তাই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতিও নূতন পথ অবলম্বন করেছে। 'শকুন্তলা'র পর তিনি পিছিয়ে যান নি, নূতন রীতির পরীক্ষা করেছেন মাত্র। 'সীতার বনবাস' রচনার পরে আবার তিনি গুরুগম্ভীর গদ্যরীতি বর্জন করে যে সহজ রীতি অবলম্বন করেছেন, তার প্রমাণ আছে ঃ

"এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে কিঙ্কর! আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি? সে বলিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটিতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আমি আজ যখন আহার করিতে যাই, বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কিনা, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল কি না? আজ্ঞে হাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।"

[ভ্রান্তিবিলাস, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

'শকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগর সাধুভাষাকে একটি চূড়ান্ত পরিণতি দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি এইখানেই থেমে থাকে নি। বিষয়ানুসারে তাঁর রচনারীতি পরিবর্তিত হয়েছে। বাদ-প্রতিবাদমূলক সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরিহাস-রসিকতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের তীক্ষ্ণ শর কথ্যরীতির ধনুতে সংযোজিত হয়েছে। এই সমস্ত রচনায় ভাষার দ্রুততাল ও লঘুধর্মিতা লক্ষণীয় ঃ

'যদিও যুগমাহাত্ম্যে, আদিপুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাদের না থাকে, কিছু

তো থাকিবে। তিনি একপদে সমস্ত আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহার বংশের তিলক হইয়া আকাশমণ্ডলের এক অংশেও হাত বাড়াইতে পারিব না? অবশ্য পারিব। আর ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি যাঁহাকে ধরিতে চাহিতেছি, তিনি আকাশের চাঁদ নহেন, নদীয়ার চাঁদ। নদীয়ার চাঁদকে ধরিতে যাওয়া, আমার মত বেহুদা বাহাদুরের পক্ষে, নিতান্ত অসমসাহসিকের কার্য বলিয়া বোধ হয় না।"

[ব্রজবিলাস]

বিধবাবিবাহ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধের ভাষা প্রধানত যুক্তির ভাষা। বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণাগ্র যুক্তিবাদ বিদ্যাসাগরের নৈয়ায়িক মনীষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'অতি অল্প হইল,' 'আবার অতি অল্প হইল' প্রবন্ধ দুটিতে বিদ্যাসাগরের গদ্য রাজপথ ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরেছে। ধূলিবালিসমাচ্ছন্ন কাঁকরে ভরা পথে যেন দ্রুতবেগে ছ্যাকড়া গাড়ী চলেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

"এই পৃথিবীতে, অনেকের বুদ্ধি আছে; কিন্তু খুড়র মতো খোশখৎ বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করে, খুড়র আপদ বালাই লইয়া, এই দণ্ডে মরিয়া যাই; খুড় আমার অজর, অমর হইয়া, চিরকাল থাকুন। কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক; আঁঠিতে যে গাছটা হয়েছে, সেটা বিষম টোকো ও পোকাখেকো।"

[আবার অতি অল্প হইল]

বিতর্কের ভাষায় বিদ্যাসাগর ভাবপ্রকাশের জন্য যে কোনো শব্দের ব্যবহার করেছেন, আরবী-ফারসী শব্দও বাদ পড়ে নি। কথ্যভাষার দ্রুততালের জন্য শ্লেষাত্মক বাক্যাংশগুলি যেন স্ফুলিঙ্গ দৃষ্টি করেছে। 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ'-এ আবার গদ্যরীতির আর একদিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ভাষা সরল ও সাবলীল, কিন্তু অশ্রুমন্থর, এক একটি দীর্ঘশ্বাসের দ্বারা বাক্যাংশ-গুলি যেন থেমে থেমে চলেছে। বাংলা গদ্যরীতির বিভিন্ন পর্যায় বিদ্যাসাগরের হাতে পরীক্ষিত হয়েছে। তার এক কোটিতে 'শকুন্তলা'র স্বচ্ছতা ও প্রসন্নতা, আর এক কোটিতে 'সীতার বনবাসে'র বিষণ্ণ-মহিমা,—এক কোটিতে বাদ-প্রতিবাদের গলিপথে চলতি কথার লোষ্ট্রবর্ষণ, আর এক কোটিতে 'প্রভাবতী-

সম্ভাষণ'-এর অশ্রুমন্থর স্বগত-ভাষণ! আধুনিক বাংলাগদ্যের বিচিত্র কলধ্বনি বিদ্যাসাগরী রীতির গতিপথে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

৮

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্পর্কে সমকালীন কোনো কোনো মনীষী সচেতন ছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরও অভাব ছিল না। বাংলাভাষাকে যাঁরা দ্বিতীয় সংস্কৃতভাষা করে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরী গদ্যকে নিতান্ত গ্রাম্য মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তিকে সুনজরে দেখেন নি। যাঁরা বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তিকে কোনো মূল্য দেন নি, তাঁদের অভিযোগ ছিল দুটি: প্রথমত, বিদ্যাসাগর ছাত্রদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন; দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ—কোনো মৌলিকতা নেই।

কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই অভিযোগের কোনোটিই সত্য নয়। বিদ্যাসাগর ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন সত্য, কিন্তু এই প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি বাংলাগদ্যের প্রাণধর্ম আবিষ্কার করেছিলেন। মধুসূদনের আগে নবযুগের সাহিত্যে কেউই বিশুদ্ধ শিল্পের জন্য সাহিত্যচর্চা করেন নি। বিদ্যাসাগরের আগে যাঁরা গদ্যচর্চা করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই প্রয়োজনের জন্যই লিখেছিলেন। কিন্তু একমাত্র বিদ্যাসাগরের রচনাতেই বাংলাগদ্যের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। সুতরাং বিদ্যাসাগরের রচনা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে শিল্পে পরিণত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থই অনুবাদমূলক। কিন্তু তার জন্যই তাঁর সাহিত্যিক ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না। অনুবাদকের দক্ষতার জন্য অনুবাদও সৃষ্টিকর্মে পরিণত হতে পারে। বিদ্যাসাগর তাঁর একাধিক গ্রন্থে সেই সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'-কে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় না। কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মীকির কাব্যের কাহিনীরসকে তিনি নিজের মতো করে পরিবেষণ করেছেন। শকুন্তলা আখ্যায়িকায় সখীদের কথোপকথন বাংলাদেশের পারিবারিক

জীবনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সীতার বনবাস কোনো বিশেষ একখানি কাব্য থেকে সংগৃহীত হয় নি। গ্রন্থনৈপুণ্য ও আখ্যায়িকারস সৃষ্টির অনেকখানি কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের। মূলকাহিনীকে তিনি বহুস্থলে বর্জনও করেছেন। 'বোধোদয়'ও ঠিক অনুবাদ নয়, সংকলন—এতে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সৃষ্টি অনেকখানি। 'ভ্রান্তিবিলাস'-কেও বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা বললে অত্যুক্তি হয় না। শেক্সপীয়রের গল্পাংশটিকে তিনি ভারতীয় সাজে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন—কোনো বিদেশী কাহিনী বলে মনেই হয় না। বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছিলেন বটে, কিন্তু আপন সৃষ্টিমহিমায় তাকে নূতন করে তুলেছেন। 'সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব,' 'বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত রচনা' 'আত্মচরিত' 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থের কথা বিরুদ্ধবাদীদের মনেই হয় নি। কিন্তু সমকালীন লেখকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর কৃতিত্ব উপলব্ধি করেছেন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায় :

"অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃতসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল রচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না।...তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে ভবভূতির 'উত্তরচরিত' ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়।"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, পৃ. ২৬]

হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলী

দেশ-কাল ও যুগের রুচি পরিবর্তনশীল। একটি বিশেষ ধরাবাঁধা সিদ্ধান্তকে পরবর্তী যুগ হয়তো সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়। সাহিত্যের ইতিহাসেও এ ধরনের রুচি পরিবর্তন প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এক যুগে যে সাহিত্য খ্যাতির চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করে, পরবর্তী যুগের সমালোচকেরা একবাক্যে তাকেই জঞ্জালস্তূপের সমধর্মী মনে করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আবার এর বিপরীত উদাহরণও আছে : গতযুগে যে সাহিত্য বহুজননিন্দিত ছিল, পরবর্তীযুগের সমালোচকেরা তাকে বরমাল্য দিয়েছেন। সাহিত্যিক খ্যাতির এই জোয়ার-ভাটা যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। যে বায়রনের কবিখ্যাতি ও অনন্যসাধারণ প্রভাব প্রায় অলৌকিক গল্প কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল, পরবর্তীকালে এক সময়ে তা স্মৃতি ও শ্রুতিতে পর্যবসিত হয়েছিল। য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিকায় সাহিত্যিকের খ্যাতির এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। বাংলা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও এই জাতীয় উদাহরণ অলক্ষ্যগোচর নয়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকৃতির কথা আলোচনা করলেও সাহিত্যিক খ্যাতির জোয়ার-ভাটার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। হেমচন্দ্র তাঁর জীবিতকালে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কবি হিসেবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এমন কি হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁকে বৃত্রসংহারের কবি হিসেবেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শশাঙ্কমোহন সেন পর্যন্ত সে যুগের মনীষী সমালোচকেরা একবাক্যে এই কাব্যের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। শুধু কি এই? সে যুগের অধিকাংশ সমালোচক 'বৃত্রসংহার' কাব্যের তুলনায় 'মেঘনাদবধ' কাব্যকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করেছিলেন। সে যুগের আর কোনো কাব্যের বোধ হয় এমন নির্জলা প্রশংসার সৌভাগ্য ঘটেনি।

কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রসরুচিরও গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। মধুসূদনের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নিঃসঙ্গ মাহাত্ম্য

আজ তর্কাতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের প্রতিভা যে মোটেই এক জাতীয় নয়, এ কথা আজ পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হয় না। হেমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন। কিন্তু সেই ভূমিকা থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, মধুসূদনের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল না। এর আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে তাঁর কাব্যাচরণে। মধুসূদন প্রাচীন কাব্যাদর্শ বর্জন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে নূতন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিলেন হেমচন্দ্রের পক্ষে তা উপলব্ধি করাও সম্ভব ছিল না। তাই তিনি অনেকগুলি ধাপ পিছিয়ে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলালের পন্থানুসরণ করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়, কিন্তু এই পরিচয় নিতান্তই বহিরাশ্রয়ী—তাঁর কাব্যাদর্শের উপর চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যাদর্শকে মধুসূদন যেখানে অনায়াসে বর্জন করেছিলেন, হেমচন্দ্র সেখানে মোটেই মোহমুক্ত হতে পারেন নি তাই 'চিন্তাতরঙ্গিণীর' ভূমিকায় তিনি বলেছেন : 'কবিতাকেশরী রায়গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃ লাভ করা অসাধ্য।'

হেমচন্দ্রকে 'বৃত্রসংহারের কবি' ও মধুসূদনের চেয়ে উচ্চ প্রতিভার অধিকারী নির্দেশ করার জন্যই যত কিছু বিচারবিভ্রান্তির সূত্রপাত। কিন্তু হেমচন্দ্রের কবিশক্তির যেখানে যথার্থ পরিচয় আছে, সমালোচকদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি। হেমচন্দ্র যেখানে ব্যর্থ, কৃত্রিম, সমালোচকরা সেখানেই তাঁকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। হেমচন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপ 'বৃত্রসংহার' কাব্যে প্রকাশিত হয়নি, এ যেন তাঁর কাব্যে প্রতিভা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অতিকায় ব্যর্থতা। এর সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক মানস লক্ষণের কোনো যোগ নেই। তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে হলে অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁর খণ্ড-কবিতাবলীর আলোচনার স্বল্পতা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে সে যুগে এই কবিতাগুলির ক্ষীণ কলেবর 'বৃত্রসংহারে'র চতুর্বিংশসর্গব্যাপী বিপুলায়তনের নীচে চাপা পড়েছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্থায়ী মূল্য সম্পর্কে অবহিত হতে হলে, তাঁর খণ্ড কবিতাবলীর মধ্যেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। খণ্ড 'কবিতাবলী'র প্রতিটি কবিতাই যে সমান রসোত্তীর্ণ হয়েছে এমন

কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না, কিন্তু এমন কিছু কবিতা আছে, যেখানে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার শক্তির উৎস আবিষ্কার করা যায়।

২

হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলীর সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আখ্যায়িকাকাব্য ও মহাকাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি খণ্ড কবিতাগুলি রচনা করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বীর রসাত্মক আখ্যায়িকাগুলির সঙ্গে খণ্ড কবিতা রচনার ধারা প্রায় সমান্তরাল ভাবেই চলেছে—এই ধারাটি কখনো কখনো ক্ষীণতর হলেও একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাঁর 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ কবিতাই ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিহারীলাল সম্পাদিত 'অবোধবন্ধু' পত্রিকাতেও তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন হেমচন্দ্র এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক হয়েছিলেন। এখানেও তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলী বিষয়ানুসারে মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; ক. দেশপ্রেমমূলক কবিতা, খ. অনুবাদ কবিতা, গ. বর্ণনামূলক কবিতা ঘ. প্রেম, প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতা, চ. ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতা।

হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলীর মধ্যে তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিই খ্যাতিলাভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশপ্রেমের একটি অস্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে দেশের কুকুর'ও তাঁর কাছে বরণীয় হয়েছিল। তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় যে দেশপ্রেম সম্পর্কে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি বড়ো জোর বলতে পেরেছিলেন :

এরূপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর॥

কিন্তু আবার ঐ কণ্ঠই ব্রিটিশ জয়গানে মুখরিত হয়েছে : 'মুক্ত মুখে বলে সবে ব্রিটিশের জয়।' ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচ্য পাশ্চাত্য সংঘর্ষ যুগের কবি। এই সংঘর্ষ

থেকে যে দুএকটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাতে কোনো বৃহৎ সৃষ্টির উত্তাপ ছিল না, শুধু ছিল অনিশ্চিৎযুগের কতকগুলি পরস্পরবিরোধী মনোভঙ্গি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বীরযুগ অবলম্বন করে আখ্যায়িকাপ্রধান কাব্য লিখেছেন। তাঁর কাব্যে দেশপ্রেমের সুরটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে প্রথম জাতীয় জীবনের পরাধীনতার জ্বালা বহ্নিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। দেশাত্মবোধের মধ্যে যে মহিমা আছে তাও রঙ্গলালের লেখনীতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

হেমচন্দ্রের প্রথম দুটি কাব্য—'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) ও 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলালের কাব্যরীতিতে রচিত হয়েছিল। 'বীরবাহু কাব্য' রঙ্গলালের আখ্যায়িকা কাব্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বীরবাহুর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতায় দেশপ্রেমের আবেগ উচ্চারিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের প্রাথমিক রূপটি বীরবাহু কাব্যেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু 'কবিতাবলী'তে দেশপ্রেমের যে খণ্ড কবিতাগুলি সঙ্কলিত হয়েছে, তার মধ্যেই দেশপ্রেমের পূর্ণতর অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা সেযুগে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর গুরু মাধবাচার্যের কণ্ঠে কবি যে গান শুনিয়েছেন তার দীপ্তি ও দাহ প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। উৎসাহ ও উদ্দীপনার যে আগ্নেয় মন্ত্র কবিতাটির মর্মমূল থেকে ঝঙ্কৃত হয়েছে, রঙ্গলালের কাব্যে তার অণুমাত্রও নেই। হেমচন্দ্রের শিঙাধ্বনি দেশাত্মবোধের নবীন বাণীমন্ত্রে পরিমার্জিত :

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

বলাবাহুল্য 'ভারত সঙ্গীত' বাংলা সাহিত্যের দেশপ্রেম-মূলক কাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

দুর্ভাগ্যের বিষয় কবি তাঁর পরবর্তীকালের কবিতাগুলিতে এই কবিতার সমুন্নতি রক্ষা করতে পারেন নি। 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা লিখেই তিনি

রাজরোষে পড়েছিলেন। কবিতাবলীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে তাই এই কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয় নি।[১] তাই হেমচন্দ্রের পরবর্তী কবিতাগুলিতে করুণ আক্ষেপ ও হতাশার সুরই প্রবল হয়ে উঠেছে। তবু 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় কবির যে আত্মগ্লানি ও অবরুদ্ধ বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

হায়রে কপাল ওদেরি মতন,
আমরাও কেন করিতে গমন,
না পারি সতেজ—বলিতে আপন
যে দেশে জনম যে দেশে বাস।

কবিতাটির শেষে রাজরোষের ইঙ্গিতও আছে :

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার
বাজিত গরজি—উথলি আবার
উঠিত ভারত ব্যথিত-প্রাণ।

'ভারত সঙ্গীত' কবিতার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই বোধ হয় 'ভারতভিক্ষা' কবিতাটি রচিত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলস যখন কলকাতায় আসেন, তখন হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করে পুরস্কৃত হন। বলাবাহুল্য কবিতাটির পিছনে কোনো গভীর প্রেরণা বা আন্তরিকতা ছিল না। রাজার কাছে প্রজার দীন আবেদন ছাড়া কবিতাটিতে আর কিছুই নেই। ভারতমাতার কণ্ঠে 'আমি বৎস তোর জননীর দাসী, দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী'—যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি অতিনাটকীয়। কবিতাটি হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার কলঙ্কস্বরূপ। এর পরে হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের কবিতাগুলি নীচু সুরের, হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি জড়িত।

১ হেমচন্দ্রের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'হেমচন্দ্র' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন 'হেমবাবুর পরম স্নেহভাজন বন্ধু উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি শুনিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্ট এই কবিতা প্রকাশের জন্য হেমচন্দ্রকে ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং প্রথম সংস্করণের বিক্রয়াবশিষ্ট গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন।'

পরমুখপ্রত্যাশী জাতির হতাশা ও আক্ষেপই তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। ১২৮২ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কবি যে 'ভারতে কালের ভেরী' কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে 'বৃটিশ কেশরীনাদ'-ই তাঁর আত্মপ্রসাদ লাভের একমাত্র কারণ হয়েছিল। তবে এ কথা যথার্থ যে কবির শেষ দিকের কবিতায় যে আশাভঙ্গ ও বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে, তার অনেকখানিই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভাগ্য থেকেই উত্থিত, তা ছাড়া হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতায় আন্তরিকতার অভাব নেই।

৩

হেমচন্দ্র অনেকগুলি বর্ণনামূলক কবিতা লিখেছিলেন। বর্ণনামূলক কবিতার অধিকাংশই কাশীর মাহাত্ম্য অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। 'গঙ্গার মূর্তি,' 'কাশীর দৃশ্য,' 'মণিকর্ণিকা,' 'বিশ্বেশ্বরের আরতি,' 'গঙ্গার উৎপত্তি,' 'অন্নদার শিবপূজা' প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর অনেকগুলি কবিতাই হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতিরসে উজ্জীবিত। হেমচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে 'The innerman is a grave moralist, a metaphysician who rediscovered the Pauranic Hindu legends under the urge of foreign ideals'[২] গঙ্গা দেখে কবির মনে হিন্দুর চিরন্তন মুক্তির বাসনা জেগেছে, পতিত দেশের বেদনাময় স্মৃতিটিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঃ

উদ্ধার উদ্ধার ওগো জীব দিয়া বঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি হে পাবনী গঙ্গে ?

'মণিকর্ণিকা' একটি নাতিদীর্ঘ আখ্যায়িকা কবিতা। কাশীর মণিকর্ণিকা কুণ্ড সম্পর্কে নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে। তারই একটি কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত হয়েছে। গদ্যাত্মক নীরস গল্পবিবৃতি নিতান্ত বিশেষত্ব বর্জিত। 'কাশী-দৃশ্য' কবিতায় কাশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিহৃদয়ের ভক্তিরস

২ Western influence on 19th Century Bengali Poetry: H. M. Dasgupta, Page 53.

উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' কবিতায় ছন্দের অভিনবত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বিন্ধ্যগিরি' কবিতায় বিন্ধ্যপর্বতের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে কবির স্বভাবসিদ্ধ দেশপ্রেমের সুর মিশেছে। বিন্ধ্যগিরি এখানে নিদ্রিত ভারতের প্রতীক :

উড়েছে নব নিশান,
উঠিছে আলো-তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল অজগর-কায়া কর উত্তোলন !

'গঙ্গার উৎপত্তি,' 'অন্নদার শিবপূজা' কবিতায় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকেই স্মরণ করা হয়েছে। কবির মৌলিকত্ব ও অন্তর্জীবনের সুর এখানে অনুপস্থিত। বর্ণনামূলক কবিতার মধ্যে 'দুর্গোৎসব' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে কোনো গভীর ভাব নেই বটে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে একটি সহজ ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গি আছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বাংলার পূজা-পার্বণ, রঙ্গ ও উৎসবের যে চিত্র পাওয়া যায় তার কিছু কিছু পরবর্তী কালের কবিদের কাব্যেও ছায়াপাত করেছে। প্রাচীন ত্রিপদী ছন্দেই কবি বাংলার এই শ্রেষ্ঠ উৎসবটিকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র তাঁর কবিতায় প্রাচীন কাব্যের আঙ্গিককে এতো বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন যে, কবিতাটিকে একশো বছর আগের কবিতা বলে চালিয়ে দিলেও কোনো অসুবিধা হতো না। হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে যতই শিক্ষিত হোন না কেন, ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের কাব্যের আনুগত্য তাঁর কাব্য থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি। এমন কি বাংলা মঙ্গলকাব্যের বস্তুনির্ভর গদ্যাত্মক বর্ণনার সঙ্গেও এই জাতীয় কবিতার আত্মিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

হেমচন্দ্রের বর্ণনামূলক কবিতাগুলি বিশেষত্ববর্জিত। শিল্পপ্রেরণা বা সৌন্দর্যানুভূতি থেকে কবিতাগুলি উদ্ভূত হয় নি, নিছক বস্তুনির্ভর বর্ণনার মধ্যে কবিচিত্তের কোনো বিচিত্র উদ্বোধন ঘটেনি। গীতিকাব্যের অন্তর্মুখী আবেদন ও ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন এই শ্রেণীর কবিতায় চকিতেও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না কতকগুলি প্রথাবদ্ধ বর্ণনা ও উপমা ছাড়া কবিতার মধ্যে আর কিছুই নেই মঙ্গলকাব্যগুলির বর্ণনায় অনেক ক্ষেত্রে যে প্রথাবদ্ধতা আছে, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। কারণ সাহিত্যে কবির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের ভাষা তখনো

তেমন ভাবে আয়ত্ত হয় নি। তা ছাড়া বিশেষ কবির রচনার চেয়ে বিশেষ গোষ্ঠীর রচনা হিসেবেই কাব্যগুলিকে বিচার করতে হবে। কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে এ যুক্তি অচল। তিনি যে যুগে কাব্য রচনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ-রূপেই আত্মোদ্ঘাটনের যুগ। এমন কি 'মেঘনাদবধ' কাব্যেও ব্যক্তি মধুসূদনের হৃদয়াবেগের উত্তাপ অনুভব করা যায়। কিন্তু হেমচন্দ্রের বর্ণনামূলক কবিতাগুলি নিছক বস্তুনির্ভর বর্ণনাই। মাটির ঢেলাতে যেমন সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয় না, তেমনি বহির্মুখী বস্তুনির্ভর পদ্যের মধ্যে কবির মনের ছায়া অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র।

হেমচন্দ্র কয়েকটি কবিতায় ইংরেজী কবিতার অনুবাদ অথবা অনুসরণ করেছেন। 'ইন্দ্রের সুধাপান' (ড্রাইডেনের Alexander's Feast), 'জীবন-সঙ্গীত' (লংফেলোর Psalm of life), 'মদন পারিজাত' (পোপ-এর Elosia to Abelard), 'চাতকপক্ষীর প্রতি' (শেলির Skylark), 'নববর্ষ' (টেনিসনের New year) প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 'মদন পারিজাত' কবিতায় পোপের কবিতা ভাষান্তরিত করা হয়েছে বটে কিন্তু কনভেণ্ট-বন্দিনী ইলাইজা সংসারবিরাগী আবেলার্ডের কাছে যে পত্রকাব্য পাঠিয়েছে তাতে প্রেমোন্মাদিনী নারীর হৃদয়াবেগের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সার্থক অনুবাদ সাহিত্যের পক্ষে ভাষান্তর ব্যাপারটিই যথেষ্ট নয়, মূলের ভাষাটিকে যথাসম্ভব নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করা উচিত। পোপের 'Elosia to Abelarc' কবিতাটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ কবিতাটির করুণ-সুন্দর বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'অ্যাণ্টিথিসিস'-বহুল প্রকাশরীতি বেমানান হয়েছে। তবু কবিতাটির এমন অনেক অংশ আছে যার আন্তরিকতা মর্মস্পর্শ করে :

> Ah hopeless, lasting flames ! like those that lurn
> To light the dead, and warmeth' unfruitful urn.

এই জাতীয় কাব্যাংশ হেমচন্দ্রের কবিতাটিতে একেবারেই অনুপস্থিত। এই সুদীর্ঘ একাত্মক ভাষণটি (Monologue) বিশেষত্ববিহীন প্রাচীন পয়ার ছন্দে রচিত হওয়ার জন্য কবিতাটির উত্তাপ ও হৃদয়াবেগ আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র অনায়াসেই 'বীরাঙ্গনাকাব্যে'র কাব্যরীতি গ্রহণ করতে

পারতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাচীন কাব্যসংস্কার নিয়ে কোনোদিনই হেমচন্দ্র মধুসূদনের কবিধর্ম ও কাব্যরীতির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে পোপ-এর নিষিদ্ধ প্রেমের কবিতাটিকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে সে যুগে হেমচন্দ্র সাহসিকতা ও মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাহিনীর নায়িকা বলেছেন ঃ

হাতে সূতা বেধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়,
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনই পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধলোক চাহে পরিণয়।

লংফেলোর 'সাম অব লাইফ' কবিতার অনুবাদ করে হেমচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূত হয়ে কবিতাটি জনপ্রিয় হয়েছিল। অনুবাদ কবিতা হিসেবে 'জীবন সঙ্গীত' অসার্থক নয়। লংফেলোর কবিতায় নীতির সুর আছে, হেমচন্দ্রেরও নীতিমূলক কবিতা রচনার একটি প্রবণতা ছিল। তাই মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ভাবেই তিনিও অনুবাদ করতে পেরেছেন। হেমচন্দ্র শেলীর সুবিখ্যাত কবিতা 'স্কাইলার্ক' এর অনুবাদ করেছেন। এই কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে হেমচন্দ্রের কবিধর্মের সীমা ও স্বরূপ অসহায় ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শেলীর 'লিরিসিজমে'র সূক্ষ্মতা, কবিকল্পনার মৌলিকতা ও আকাশ-পিপাসার দিব্য আকৃতি হেমচন্দ্রের কবিতায় জীবন্ত হয়ে দেখা দেয় নি। তিনি কবিতাটিকে ভাষান্তরিত করেছেন মাত্র। হেমচন্দ্রের পক্ষে লংফেলোর নীতিমূলক কবিতা অনুবাদ করা সম্ভব, কারণ সে কবিতায় নিছক নীতিবিবৃতি, কবির হৃদয় সেখানে অনুপস্থিত। বোধ হয় এই দিকটি স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ এক সময় লঘুসুরে বলেছিলেন ঃ "কিছু না হোক লঙফেলোদের হবো আমি সমান তো", কিন্তু শেলীর কবিতা অন্য জিনিস। হেমচন্দ্রের বস্তুনির্ভর বহির্মুখী মন শেলীর কবিতা অনুবাদের মোটেই অনুকূল নয়।

৪

হেমচন্দ্র চড়া সুরের কবি। বীররস ও দেশপ্রেমের কবি হিসেবে সে যুগে তিনি জনবল্লভ হয়েছিলেন। তাঁর খণ্ড 'কবিতাবলী'র মধ্যেও চড়া সুরের

কবিতাগুলি সে যুগের বীররস রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু হেমচন্দ্রের কিছু প্রেম, প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতা আছে (যদিও তাঁর সমগ্র রচনার তুলনায় এই জাতীয় কবিতার সংখ্যা বেশী নয়), যাদের মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভার সত্যিকারের কিছু কিছু পরিচয় মিলবে।

'যমুনাতটে,' 'পদ্ম,' 'অশোকতরু,' 'লজ্জাবতীলতা,' 'কুহুস্বর' প্রভৃতি কবিতায় নিসর্গ বর্ণনায় হেমচন্দ্র আধুনিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। সাধারণ পটভূমিকা হিসেবে ও নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন হতো। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম প্রকৃতিকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কবিতা রচনা করেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের নিসর্গ কবিতা কতকগুলি বর্ণনা মাত্র, এর মধ্যে যেমন কল্পনার বিস্তার নেই, তেমনি নেই ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দন। হেমচন্দ্রের কয়েকটি কবিতায় প্রকৃতি কবিহৃদয়ের আনন্দ বেদনার নিবিড় স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে! 'যমুনাতটে' হেমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যমুনাতট, তরুশাখায় জোনাকীর দীপ্তি, নির্জন নিশীথে ঝিল্লীর ধ্বনি কবির মনে যে বেদনাময় অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, কবিতাটি তার বাঙ্ময় রূপায়ন। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের যে অদৃশ্য সম্বন্ধ-বন্ধন আছে, কবির কাছে তা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে :

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরি?

হেমচন্দ্রের কবিচিত্ত এখানে বহির্মুখী ও বস্তুনির্ভর নয়। নির্জন নিশীথে কবি তাঁর মনকে খুঁজে পেয়েছেন। 'বৃন্তভাঙা' মনের বেদনা দিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রির মাধুর্যকে উপলব্ধি করেছেন :

রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

'লজ্জাবতী লতা' কবিতাটিতে লজ্জাবতী লতার মৃদু সলজ্জ ও সুকুমার রূপটিকে ফোটাতে গিয়ে কবি মানব-হৃদয়ের ব্যঞ্জনার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কবিতাটিকে প্রকৃতির কবিতা মনেই হয় না, মৃদুভাষী ও আত্মপ্রকাশবিমুখ মানুষের সলজ্জ প্রকৃতির কথাই কবি বলেছেন ঃ

স্বভাব মৃদুল ধীর প্রকৃতিটি সুগম্ভীর
বিরলে মধুরভাষী মানস-রঞ্জন,
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁয়ো না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস রঞ্জন।

'অশোকতরু' কবিতাতেও কবির ব্যক্তিগত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। অশোকতরু এখানে গৌণ, কবি হৃদয়ের বেদনাই মুখ্য ঃ

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আমি ভাসি অশ্রুনীরে,

* * *

এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু তারে দয়া করে তুষিও পরাণে।

'পদ্মফুল' কবিতায় কবি 'ওড্' জাতীয় কবিতার টেক্‌নিক নিয়েছেন। ফুলকে সম্বোধন করে ফুলের সৌন্দর্য ও মাধুর্য নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একে নিছক বস্তুনির্ভর বর্ণনা বলা যায় না। পদ্মফুলের রূপমাধুর্য ও বর্ণ বৈচিত্র্য ঘিরে কবিচিত্তের বিচিত্র ভাবানুভূতি স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্র যে আত্মলীন (subjective) সৌন্দর্যকে অস্বীকার করেন নি, সে কথা তাঁর একটি উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

সত্য কিরে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিংবা সে আমারি মন
প্রমোদে হয় মগন,

ভাবে আপনার প্রভা তোতে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম !

হেমচন্দ্রের প্রেম-কবিতার সংখ্যা বেশী নয়। 'কামিনী কুসুম,' 'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী', 'প্রিয়তমার প্রতি', 'হতাশের আক্ষেপ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতাকে প্রেম-কবিতার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। উনিশ শতকের বাংলাকাব্যে যে গার্হস্থ্যরস ও নারীবন্দনার সুর বিহারীলাল-সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবির কাব্যে ঝঙ্কৃত হয়েছিল, হেমচন্দ্রের 'কামিনী কুসুম' কবিতাটি সেই ধারারই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মাঝে মাঝে কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিচিত্ত স্পন্দিত হয়ে উঠেছে :

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী !
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভালবাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী।

সৌন্দর্যমুগ্ধ মনের সহজ প্রকাশে কবিতাংশটি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল।

'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী' কবিতায় হেমচন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখস্বপ্ন নিয়ে কবি সংসার-জীবনে প্রবেশ করেন, কিন্তু সে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। হেমচন্দ্র সহজ ভাষায় অকৃত্রিম ভঙ্গিতে ও স্বল্পাক্ষরে সেই প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন :

কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধনের আশা
সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।

'আশার আরসি' ভেঙে যাওয়ার পরও সন্তান-বাৎসল্যই এই মায়াবন্ধনকে বাঁচিয়ে রাখে।

৩ 'হেমচন্দ্র' (প্রথম খণ্ড) : মন্মথনাথ ঘোষ, পৃ ১১০

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে দাম্পত্যপ্রেমের কবিতার অভাব নেই। বাৎসল্যরসের কবিতাও দাম্পত্যপ্রেমের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্যরসের কবিতার দুটি মূলকেন্দ্র—দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্য-রস। আবার শেষোক্ত দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু একটি ধাপের। দাম্পত্যপ্রেমের মধ্যে যখন বুকভাঙা হতাশা সঞ্চারিত হয়েছে, তখন ক্ষুদ্র শিশুই সমস্যার মীমাংসা করেছে ঃ

"তবুও উদাসী নাথ কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন"
ব'লে তুলে আনি সুখে রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া নিগড়ে বন্ধন।

'শিশুর হাসি' কবিতাটিও হেমচন্দ্রের একটি উল্লেখযোগ্য বাৎসল্যরসের কবিতা।

'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির প্রেমানুভূতির নিগূঢ় সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকৃতি এখানে প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তির দর্পণ স্বরূপ। 'হতাশের আক্ষেপ' হেমচন্দ্রের খ্যাততম প্রেম কবিতা। সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় কবিতাটির বহু প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।[৪] কবিতাটিতে প্রেমিক হৃদয়ের বেদনা একটি অচরিতার্থ প্রেমের স্মৃতি অবলম্বন করে তীব্র হয়ে উঠেছে—'সুধাংশু উদয়' তাকে তীব্রতর করেছে মাত্র। পূর্বস্মৃতির বিষণ্ণ রোমন্থনে আশাভঙ্গের মর্মযাতনায় কবিতাটি হৃদয়গ্রাহী।

হেমচন্দ্রের শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখময়। অভাব, দারিদ্র্য ও অন্ধত্ব তাঁর শেষজীবনকে বিষাদময় করে তুলেছিল। কয়েকটি কবিতায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আশাভঙ্গ ও মনোবেদনার সুর প্রকাশিত হয়েছে। মাঝে মাঝে জীবন-

---

৪ কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ 'প্রেমের কবিতাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয় কবিগণের 'অশিক্ষিতপটুতা' ও সিদ্ধি সর্বজনসম্মত। হেমচন্দ্রের নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় বালক ও বধূগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রোদয় দেখিলেই 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' অনেকে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।...তাহা প্রাণের গুপ্ততন্ত্রীর তার স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া ফেলে।'—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ পৃ ২০৪-৫

সমালোচনা ও জীবনসম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা কবিতাগুলিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। 'জীবনমরীচিকা'য় বিভ্রান্ত পথিক হেমচন্দ্র বলেছেন : 'জীবনে এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।' এই কবিতায় ইংরেজ কবি গ্রে-র সুবিখ্যাত 'এলিজি' কবিতার ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রে-র মতো হেমচন্দ্রও বলেছেন : 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।' 'সংসার' কবিতায় কবি প্রথমে সাংসারিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি সংসার-সম্পর্কিত দার্শনিক উপলব্ধির মাধ্যমে সান্ত্বনালাভ করার চেষ্টা করেছেন—'তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের আকার'। 'চিন্তা' কবিতাতেও জীবন-সমালোচনার পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তবে কবিতাটির বক্তব্য প্রবন্ধের মাধ্যমে আরও পরিস্ফুট হতে পারত।

হেমচন্দ্রের কবিতাবলীকে লিরিক না বলে খণ্ডকবিতা বলাই সঙ্গত। তবে প্রেম ও প্রকৃতির কবিতায় কখনো কখনো তিনি অন্তর্মুখী হয়েছেন। কোনো কোনো কবিতায় ব্যক্তিগত সুর বস্তুনির্ভর বর্ণনার নীচে চাপা পড়েছে। বস্তুভাবকে যেখানে তিনি যে পরিমাণ অতিক্রম করতে পেরেছেন, সেখানে তিনি সেই পরিমাণে সার্থক।

৫

সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে হেমচন্দ্র কয়েকটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে হেমচন্দ্রের যথার্থ কবিশক্তির পরিচয় আছে। হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের যে কয়েকটি চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে, তা অত্যন্ত মূল্যবান। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে তিনি সমালোচনাত্মক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-কৌতুক পরিবেশন করেছেন। 'আজব সহর' কলকাতার জীবনধারা তখন নানা আন্দোলনে ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র হেমচন্দ্রের কবিতায় অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। মহাকাব্য ও আখ্যায়িকাকাব্য রচয়িতা হেমচন্দ্র যে সমাজ-সমালোচনার ক্ষেত্রে কতখানি

নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, এই কবিতাগুলি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। হেমচন্দ্র এখানে 'অন্তরীক্ষ কবি' নন, তিনি সমকালীন সমাজ-জীবনেরই কুশলী ভাষ্যকার।

হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক কবিতার মধ্যে 'বাজিমাৎ' সে যুগে গভীর আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুআরি পর্যন্ত ইংলণ্ডের তৎকালীন যুবরাজ (পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড) কলকাতায় অবস্থান করেন। যুবরাজ সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। হাইকোর্টের সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় উক্ত ৩রা জানুআরিতে যুবরাজকে তাঁর ভবানীপুরের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। যুবরাজ মুখোপাধ্যায় পরিবারের মহিলাদের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। এই ঘটনা হিন্দু সমাজের মধ্যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে। বার-লাইব্রেরীর বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে উত্তেজিত হয়ে হেমচন্দ্র কবিতাটি রচনা করেন। হেমচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের কাছে কবিতাটি নিয়ে যান। অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন এই বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা চলছিল। শিশিরকুমার 'বাজিমাৎ' কবিতাটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করেন (২০ জানুআরি, ১৮৭৬)। [৫]

'বাজিমাৎ' কবিতার প্রথমেই মুখুর্যের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ বাষত হয়েছে। হেমচন্দ্রের কাব্যভঙ্গিটি এখানে যেমন সহজ, তেমনি অবলীলাকৃত ঃ

---

৫ ঐ তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শিশিরকুমার যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

"We are sorry we cannot publish the letters that we have received regarding the Bhowanipur affair. They are so many that we cannot find place for them, neither do we choose to carry the matter further. We have been obliged to make room for a lengthy burlesque on the subject by the intercession of friends whom we cannot disoblige and because the piece is from the pen of one of the best poets of Bengal.'

—মন্মথনাথ ঘোষ রচিত 'হেমচন্দ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়!
পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥

সমকালীন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি 'মুখুর্যের ব্যাটা'কে যে বক্রোক্তি করেছেন, তা যেমন সার্থক তেমনি উপভোগ্য :

কোথায় কৈশবী দল ? বিদ্যাসাগর কোথা ?
মুখুর্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠি ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুর্যের ব্যাটা বলিহারি যাই।
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই॥

মেয়ে মহলের যে সুদীর্ঘ চিত্র আছে, তা এই কবিতাটিকে জমিয়ে তুলেছে। এই অংশটিকে মঙ্গলকাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা'র আধুনিক সংস্করণ বলা যায়। কবিতাটির মধ্যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের নিপুণ সমন্বয় ঘটেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমপাদে লর্ড রিপনের মন্ত্রণা-পরিষদের আইন-সদস্য স্যার সি. পি. ইলবার্ট যে বিল উপস্থাপিত করেন তাকে অবলম্বন করে ইঙ্গ ভারতীয় সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। দেশী বিচারকেরা যাতে য়ুরোপীয়দের বিচার করতে পারেন, এ বিলের মধ্যে তারই সুপারিশ ছিল। বলাবাহুল্য য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এই বিল ও লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। য়ুরোপীয়েরা আত্মরক্ষার জন্য একটি সমিতিও গঠন করেন। এই বিলের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তীব্রতর করে তুলেছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'ন্যাশন্যাল কন্‌ভেন্‌শ্যান' (১৮৮৩) আহ্বান এরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

হেমচন্দ্রের 'নেভার্‌-নেভার্‌' ব্যঙ্গ কবিতায় প্রতিক্রিয়াশীল য়ুরোপীয়দের আচার-আচরণ নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'বিলাতি-বৃষ' সেদিন যেমন অশোভনভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছিল, হেমচন্দ্র তার যোগ্য প্রত্যুত্তরই দিয়েছিলেন :

গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্
ডাক্ ছাড়ে ব্রান্‌শন কেশুয়িক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার !

'ভারতভিক্ষা' কবিতায় হেমচন্দ্র বাধ্য হয়ে নিজের মনোভাব গোপন করেছিলেন, কিন্তু 'নেভার—নেভার' কবিতায় তিনি মদোদ্ধত ইংরেজ চরিতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে বাদ রাখেন নি ঃ

শত্রু যদি করে গোল্, ধরিব বৃষভবোল্
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেউড়।

ঐ বছরেই স্যার রিচার্ড টেম্পল যখন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করতে চান, তখন 'মিউনিসিপ্যাল বিল' নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন।[৬] আজব-সহর কলকাতায় মিউনিসিপ্যাল বিলকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র হুজুগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তারই কৌতুককর ছবি পাওয়া যায় 'সাবাস হুজুগ আজব সহরে' কবিতায়। পয়লা সেপ্টেম্বর মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট জারির দিনটিকে হেমচন্দ্র তাঁর এই কবিতায় স্মরণীয় করে রেখেছেন ঃ

ছেলাম টেমপল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে, ভেটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাকৃট বলি, সহর জুড়ে ভারি আড়ম্বর।
একৃট জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর ॥
বলিহারি স্ববেদারি স্বসভ্য কেতায়।
ভেল্কিবাজি ইংরাজের হদ্দ মজা হায়।

---

৬ 'When Sir Richard Temple wanted to introduce an elective system in the Calcutta Municipality, the powerful justices (municipal commissioners were called justices in imitation of the English justices of peace) strongly opposed the measure. Sir Richard desired that the people should express their opinion in favour of election. Sir Richard Temple galvanised public opinion in support of the elective system.'

—History of Political Thought. Dr. B. B. Majumder. Page 358

কবিতাটিতে ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে। কবি যেন দূর থেকে ভোটরঙ্গ আস্বাদ করছেন। ভোটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের বিচিত্র আচার-আচরণ হাস্যরসের উদ্রেক করে ঃ

পীরবক্স, রামগোবিন্দ, নব্য ভোটর যত।
"ফ্রান্চায়িসের" ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত।
সারারাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে ॥
হদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে ॥

'বাঙালীর মেয়ে' কৌতুকরসের কবিতা। অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই কবিতা সম্পর্কে অবিচার করেছেন। তাঁর মতে 'বাঙ্গালীর মেয়ের পিঠে কশাঘাত করা —কবির কলঙ্ক।' কিন্তু কবিতাটির মধ্যে বাঙালীর মেয়েকে বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত করার কোনো প্রবণতা নেই, বরং কৌতুকরসই এখানে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে—তাই এখানে কোনো জ্বালা নেই ঃ

নমস্কার তার পায়ে—পাড়ায় বেড়ানী
পেটটি ভরা কঁজড়ো কথা পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ি চলে রাত্রিদিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হাস্যরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি অবলম্বন করে 'বাঙ্গালীর ছেলে' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন। বাঙালীর মেয়েদের পক্ষ থেকে এই কবিতার উত্তর দিয়েছিলেন সে যুগের একজন মহিলা কবি মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়।[৭] হেমচন্দ্রের 'দেশলাইয়ের স্তব' কবিতাটিও উপভোগ্য। তুচ্ছ বিষয়ের উপরে মহৎ ভাব আরোপ করে তিনি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন— 'সাব্লাইম'কে 'রিডিকিউল' করে তুলেছেন।

---

৭ মন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের ২৫৫-২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬

হেমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক কবিতার উৎস সমাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের ফলে যেমন রোমান্স ও সমুন্নত কবিকল্পনার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি যুক্তিবাদ ও সমালোচনাত্মক দৃষ্টিও এই যুগের সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট দিক। সাময়িক পত্রের আবির্ভাবের ফলে সমকালীন দেশ-কালের সমালোচনায় অনেক শক্তিশালী লেখক আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাতের ফলে যেমন একদিকে রোমান্সের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়ে বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তেমনি সমাজ-জীবনের অসঙ্গতি ও নানামুখী উৎকেন্দ্রিকতা নক্সা-প্রহসন ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেছিল। হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে সেকালের সমাজজীবনের যে কৌতুককর অসঙ্গতির চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার মূল্য অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সমালোচনামূলক কৌতুক-কবিতার প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতার সঙ্গে গুপ্তকবির মানসিকতার একটি নিকট সম্পর্ক আছে। গুপ্ত কবি নীলকর, মিশনারী, বিধবা বিবাহ ইংরেজদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের যুদ্ধ, তৎকালীন সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতার রুচি মার্জিত, আঙ্গিকও উন্নত। গুপ্তকবির শব্দালঙ্কার প্রয়োগের বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময় তাঁর হাস্যরসকে কষ্টকল্পিত ও পীড়াদায়ক করে তুলেছে। হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় গুপ্তকবির 'ম্যানারিজম্' নেই। দ্বিতীয়ত, গুপ্তকবির কবিতায় ব্যক্তিগত আক্রমণের তীব্রতা অনেক সময় উৎকট ও অশোভন হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় ব্যক্তিগত আক্রমণের ঝাঁঝ নেই। এমন কি 'বাজিমাৎ' কবিতাতেও ব্যঙ্গের চেয়ে রঙ্গের দিকটিই বড়ো হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, গুপ্তকবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি আপাত-বিরোধী ভাব ছিল। তিনি ছদ্ম মিশনারীদের ব্যঙ্গ করেছেন, মাহেশের স্নানযাত্রায় বাবুদের কদর্য বিলাস কাহিনী শুনিয়েছেন, তেমনি আবার বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে রুচিহীন শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি। হেমচন্দ্র সমাজের প্রগতিশীলতাকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও

চন্দ্রমুখী বসু যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ উপাধি পান, তখন এই দুজন মহিলা গ্রাজুয়েটকে হেমচন্দ্র কবিতা লিখে সম্বর্ধিত করেন। এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও ব্যঙ্গকবি হেমচন্দ্র গুপ্তকবির সাক্ষাৎ শিষ্য। গুপ্তকবি যেমন আজব-সহর কলকাতার রাস্তা-ঘাট, জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে রঙ্গে, ব্যঙ্গে, কৌতুক-কটাক্ষে ভাষ্য করেছেন হেমচন্দ্রও মূলত সেই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তাই 'টেম্পল চাচা'র মিউনিসিপ্যাল বিল প্রবর্তনের দিনে কৌতূহলী নরনারীর যখন বিচিত্র আচার-আচরণ দেখছেন তখন কবি 'রসিকরাজ' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্মরণ না করে পারেন নি :

কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিক রাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ রঙ্গ ব্যঙ্গের বাজার॥

বলাবাহুল্য, এ অংশটি গুপ্তকবিরই একজন অনুগত শিষ্যের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হেমচন্দ্রের খণ্ড-কবিতাবলী আলোচনা করলে তাঁর কবিমানসের স্বরূপ ধর্মও উপলব্ধি করা যায়। হেমচন্দ্র তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের কাছে মধুসূদনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বলেছিলেন : 'হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনও রোদন করিব না।' সে যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যরথীরা 'মেঘনাদবধ' কাব্য অপেক্ষা 'বৃত্রসংহার' কাব্যকে অনেক উচ্চস্থান দিতেন। সমকালীন সাহিত্যিকদের এই অনুচিত ঢক্কানিনাদের ফলেই হেমচন্দ্র সম্পর্কে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল, তা মোটেই তাঁর কবিপ্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করে না। মধুসূদন য়ুরোপীয় সাহিত্যের রস বাংলা সাহিত্যে যে ভাবে সঞ্চারিত করেছিলেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। রোমান্টিক কবিকল্পনার সঙ্গে ক্লাসিক সাধনার সমন্বয় তাঁর কবিমানসে স্বতন্ত্র ভাবলোক সৃষ্টি করেছিল। সে যুগে তাঁর অনুরাগীর অভাব ছিল না। হেমচন্দ্র তাঁদেরই একজন, কিন্তু তিনি মধুসূদনের কাব্যসাধনাকে পূর্ণতর মহিমার দিকে এগিয়ে দিতে আসেন নি, বরং তিনি গুপ্তকবি ও রঙ্গলালের দিকে পিছিয়ে গিয়েছেন।

হেমচন্দ্র তাঁর প্রথম বয়সে রঙ্গলালের দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রকৃতপক্ষে এ প্রভাব কোনোদিনই ভালভাবে কাটেনি। খণ্ড 'কবিতাবলী'তে গুপ্তকবি ও রঙ্গলাল অনেক সময়ই দেখা দিয়েছেন। তাঁর বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলি সুলিখিত, কিন্তু এগুলিও গুপ্তকবির ছড়া-কাটা জার্ণালিজমেরই সগোত্র। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (কার্তিক ১২৯০) বর্ষ সমালোচনা করতে গিয়ে হেমচন্দ্র কৌতুক করে লিখেছিলেন :

হায় কি হলো—ভূদেব গেলো ছেড়ে গুরুগিরি।
হায় কি হলো—হেম্-নবীনের নাহিকো জারিজুরি।

সেদিনের কৌতুক আজ নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছে। তার কারণ হেমচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভাকে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করে সম্পূর্ণ ভিন্নপথেই পরিচালিত করা হয়েছে। মধুসূদনকে টেনে না আনলে যেন হেমচন্দ্রকে আলোচনা করাই যায় না—এই দুর্বোধ্য সংস্কার দূর না করলে হেমচন্দ্রের প্রকৃত বিচার হতে পারে না। 'বৃত্রসংহার'-এর হেমচন্দ্র ব্যর্থ, অথচ কিছু কিছু খণ্ড-কবিতা রচনায় তিনি যথার্থ কবিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। হেমচন্দ্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি মধুসূদনের মত শনিগ্রহের রোমান্টিক্ দুঃস্বপ্ন দেখেন না, সৌন্দর্যের বিষপুষ্প আহরণের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন না, 'বন্দিনী নারী'কে মুক্ত করার দুরূহ সাধনা করেন না, কপোতাক্ষকে সমুদ্রকল্লোলের ধ্রুপদী গাম্ভীর্যে ভীষণ-রমণীয় করে তোলেন না। তিনি যুগান্তকারী নন, অতীত যুগেরই বাণীবাহক—রঙ্গলালশিষ্য ও গুপ্তকবির ধারার সর্বশেষ কবি। এখানেই তাঁর কবিপ্রতিভার নির্ধারিত সীমা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ'

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনে যে তরঙ্গমুখর ভাববৈচিত্র্য দুকূলপ্লাবিত করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী সারস্বত সাধনা তাকেই বাণীমূর্তি দিয়েছিল। জীবনের নানাদিকে এই যুগের কীর্তিমান মনীষীরা পদক্ষেপ করেছেন। কিন্তু যুগজীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে রূপ দিয়েছেন, সে যুগের আর কোনো সাহিত্যসাধকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলেছেন : "The greatest man of the Nineteenth Century." রমেশচন্দ্রের এই সুস্পষ্ট ও প্রত্যয়নিষ্ঠ মন্তব্য শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসপাঠে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দেশকালের পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি, বিবিধ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভাবপ্রবাহ বিশ্লেষণের যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছে— তারও সম্যক্ বিচার হওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু এই বিচারের প্রধান অন্তরায় হলো 'ঔপন্যাসিক বঙ্কিম' সম্পর্কে পাঠক সাধারণের মজ্জাগত সংস্কার। সাধারণ পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক পরিচয় জানতেই অভ্যস্ত। উপন্যাস যে বঙ্কিমসাহিত্যের অর্ধাংশ মাত্র (পরিধির দিক থেকেও), একথা আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদি শুধু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই হতেন, তা হলেও রমেশচন্দ্র তাঁকে 'উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মানুষ' বলতেন না। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মনীষাদীপ্ত চিন্তাশীল মন ছিল। জাতীয় জীবনের প্রতিটি তরঙ্গ তাতে প্রতিবিম্বিত হতো। উচ্চতর কল্পনার সঙ্গে মননশীলতা সমন্বিত হয়েছিল।

কবিকল্পনার সঙ্গে নৈয়ায়িক মনীষার এই দুর্লভ সমন্বয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সারস্বত সাধনাকে এমন একটি লোকোত্তর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা উপন্যাসের তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, য়ুরোপীয় গদ্যরোমান্সের রসধারাকে বিচিত্র কৌশলে পরিবেষণ করেছিলেন। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, গল্পরস পরিবেষণ—যে কোনো বিষয়েই তিনি অসাধারণ কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তিনি মধ্যবয়সে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই

উপন্যাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুর সাতবছর আগেই (১৮৮৭) তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাছ থেকে আকস্মিকভাবে বিদায় নিলেন কেন? প্রথম কথা, উপন্যাসের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপার আকস্মিক নয়। 'আনন্দমঠ' থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, গল্পের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে বক্তব্য। তাই তাঁর শেষ জীবনের উপন্যাসপ্রসঙ্গে নানা আপত্তি উঠেছে।

কিন্তু শেষদিকে তিনি নিরাবরণ নিরাভরণ ভাবেই তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। তার অনিবার্য মাধ্যম হয়েছে প্রবন্ধ। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'—এই তিনটি গ্রন্থে অবশ্য প্রাবন্ধিকের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। পরিষৎ-সংস্করণ বঙ্কিমরচনাবলীর সম্পাদকদ্বয় বলেছেন: "বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে পৃষ্ঠাপূরণের এবং বিবিধবিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গিতে লেখনীধারণ করিতে হইয়াছে— 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বরগুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হাল্কা রচনা সে অর্থে লঘু নহে।...'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে পারেন নাই, 'লোকরহস্যে' ও 'কমলাকান্তের' বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন।"

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে গুরুদায়িত্ব পড়ে— বিচিত্র রচনার দ্বারা পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণ করতে হয়। এই পর্ব থেকেই প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'বিজ্ঞানরহস্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ধর্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' প্রভৃতি রচনায় প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে। কিন্তু উপন্যাস যত বড়ো মাধ্যমই হোক না কেন, স্বদেশ, স্বজাতি

স্বসমাজ ও দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর এত কথা বলার ছিল যে, তিনি প্রবন্ধের কলম ধরেছিলেন। তাই একদিন ঔপন্যাসিক খ্যাতির প্রলোভন ছেড়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই তাঁকে প্রবন্ধরচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। দেশ ও জাতির জন্য এতবড়ো আত্মত্যাগ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর নেই। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা দেশমাতৃকার জন্য 'জীবনসর্বস্ব' দিতে চেয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনাধিক শিল্পীসত্তাকে দেশের জন্য বলি দিয়েছিলেন—কথারসরসিকতাকে বর্জন করে বক্তব্য প্রধান গদ্যের আপাত-নীরস মাধ্যম বেছে নিয়েছিলেন। এই নিষ্ঠুর ও বিস্ময়কর সত্য 'বিবিধ প্রবন্ধ' পাঠকের বার বার মনে হবে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' আলোচনা করতে গেলে তাই মোহিতলালের মন্তব্যটি মনে পড়ে :

"বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে—স্বদেশ ও স্ব-সমাজ, এবং পরোক্ষভাবে—মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্বমাত্র, যে-ধর্ম শুষ্ক তর্কমাত্র, এবং যে-কাব্য আর্টমাত্র,, বঙ্কিম তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছিল। যে-ধর্ম মানুষের সত্যকার প্রকৃতি বা চরিত্রগত স্বধর্ম, যাহা জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হইতে চায়—যে-ধর্ম জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, পূর্ণ মনুষ্যত্ব-সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। আবার, যে-দেশ, যে-জাতি ও যে-কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন— সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে উদ্ধার করাও তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

২

'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথমভাগ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। পূর্ব-প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬) এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯) একত্রিত করে 'বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। অধিকাংশ প্রবন্ধই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল, অল্প কিছু প্রবন্ধ 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রবন্ধাবলীকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) সাহিত্য-শিল্প, (খ) ইতিহাস ও অর্থনীতি, (গ) দর্শন ও ধর্ম, (ঘ) সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণী দৃষ্টি যে দিকে পড়েছে সেই দিকই আলোকিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে না হলেও কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রকেই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের আদিপুরুষ বলা যায়। তিনিই যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনা পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের পথনির্দেশ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সূক্ষ্ম রসবোধ, তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের নৈপুণ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে রসোজ্জ্বল করে তুলেছে। 'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘতম সমালোচনা। 'উত্তরচরিত' সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গভীরতায় ও মননশীলতা কোনো প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে অতিক্রম করতে পারে নি। 'উত্তরচরিত'-এর এক একটি অঙ্ক নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি সাধারণ ভাবেও ভবভূতির কবিমানস নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। ভবভূতির আখ্যায়িকা-বিন্যাসের অভিনবত্ব প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের অনুরূপ প্রচেষ্টার কথা সমালোচকের মনে হয়েছে। বাল্মীকির লোকোত্তর প্রতিভাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, তাই ভবভূতি কাহিনী-বিন্যাসে নূতন পথ ধরেছেন—এই হলো বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি শেক্সপীয়রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন:

"যেমন ভবভূতি এই 'উত্তরচরিত-এর উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি শেক্সপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব-কবিগণ হইতে ভিন্নপথে গমন করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, যে-সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্ব-শক্তিতে সমকক্ষ নহেন। এইজন্য ইচ্ছাপূর্বকই পূর্ব-লেখকদিগের অনুবর্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান-

ভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই 'ত্রৈলস ও ক্রেসিদা' নাটক প্রণয়নকালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।"

চিত্রদর্শন, দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক, তৃতীয়াঙ্ক ও তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক, ছায়াসীতা, ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভক প্রভৃতি অংশকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি রসাস্বাদন করেছেন। প্রয়োজনমতো উদাহরণ ও উদ্ধৃতি সহকারে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। অবশ্য ভবভূতির দোষ ত্রুটিও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে এড়িয়ে যায় নি। তাঁর প্রথম আপত্তি এই যে, ভবভূতির রামচরিত্র অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির। তিনি এ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করতেও পশ্চাৎপদ হন নিঃ "তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকা-সুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্ছিত হইলেন।...অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে 'উত্তরচরিত' নাটকের কালগত অনৈক্যও পীড়া দিয়েছে। প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে যে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান, তাতে নাটকীয় ঐক্যনীতি ব্যাহত হয়েছে। বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই 'উত্তরচরিত'-এর কালগত অনৈক্য তাঁর রসচেতনাকে পীড়িত করেছে। শেক্সপীয়রের 'উইন্‌টারস টেল' নাটকের কালগত অনৈক্যের কথা তাঁর মনে হয়েছে। তৃতীয়ত, নাটকের তৃতীয়াঙ্কের কাব্যগুণ সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করলেও, এই অঙ্ককে নাটকের পক্ষে অনিবার্য মনে করেন নি। চতুর্থত, ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ রচনার জন্য 'অর্থবোধ' ও 'রসগ্রহণ' সম্পর্কিত ব্যাঘাতের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লেখ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই দুর্বলতার কথা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তিনি এই অংশের কবিত্বগুণের প্রশংসা করেছেন।

'উত্তরচরিত'-এর শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক গভীর কথা বলেছেন—প্রবন্ধটির মধ্যে এই অংশই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত'-এর অঙ্কগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সমালোচনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথাও তিনি সশ্রদ্ধভাবেই স্বীকার করেছেন ঃ "একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্য-মূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না।···সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্বাংশের পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সৃষ্টিক্ষমতা ও স্বভাবানুকারিতার সমন্বয় না ঘটলে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম হয় না। এই দুইয়ের কোনো একটিমাত্র গুণ থাকলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয় না। কল্পনা ও পর্যবেক্ষণদক্ষতা এই দুয়েরই প্রয়োজন আছে। দীনবন্ধুর প্রতিভার স্বভাবানুকারিতা প্রচুর পরিমাণেই ছিল, কিন্তু তদনুযায়ী কল্পনাশক্তি ছিল না। এইখানেই দীনবন্ধু প্রতিভার নির্ধারিত সীমা। আবার শুধু কল্পনাশক্তির প্রাধান্য থাকলেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয় না—যেমন আরব্য উপন্যাস। এখানে আকাশবিহারী কল্পনার ইন্দ্রজাল আছে সত্য, কিন্তু মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বাস্তবজীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিতান্তই ক্ষীণ। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দুটি মৌলিক লক্ষণের কথাই বলেছেন। তিনি এখানে কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যে মন্তব্য করেছেন, তা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অভ্রান্ত। কাব্যের উদ্দেশ্য কি হবে এই নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে বাদানুবাদের অন্ত নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাদানুবাদমুখর ক্ষেত্রে যে আলোকপাত করেছেন, তা বিশেষভাবে স্মর্তব্য ঃ

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁরা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।"

কালিদাস ও ভবভূতির কবিমানসের পার্থক্যকেও বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছন্ন

ভাষায় স্বচ্ছ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরবর্তীকালে যাঁরাই কালিদাস ও ভবভূতির কবি প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তাঁরাই বঙ্কিমচন্দ্রের পন্থানুসরণ করেছেন। এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' অবলম্বন করে কাব্যতত্ত্বের উৎসমূলে প্রবেশ করেছেন।

৩

ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সংস্পর্শের ফলে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংস্পর্শের ফলে যে কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেল, সমালোচনা সাহিত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যসমালোচনা ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যেরই আত্মিক সন্তান। পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির মার্জিততর ও পূর্ণাঙ্গ মূর্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় যে পাশ্চাত্যরীতি ব্যবহার করেছেন, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না, তিনি তুলনামুলক বিচারপদ্ধতিও (Comparative Criticism) সুষ্ঠুভাবে অবলম্বন করেছেন।

'শকুন্তলা ও মিরন্দা' ও 'শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা'— প্রবন্ধ দুটিতে তিনি কালিদাসের অমর নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রের দুটি খ্যাতনামা নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে শেক্সপীয়র সম্পর্কে যে অভিনব কৌতূহল জেগেছিল, তা কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, অনুবাদে নানাভাবে রূপায়িত হয়েছিল। বাংলা সমালোচনাসাহিত্যও বাদ পড়ে নি। বঙ্কিমপ্রদর্শিত এই পথ সে যুগের খ্যাতনামা সমালোচকেরা অনুসরণ করেছিলেন। 'শকুন্তলা ও মিরন্দা' প্রবন্ধে এই দুটি চরিত্রের পরিবেশগত ও চারিত্রিক পার্থক্যকে বঙ্কিম সামান্য কয়েকটি বিদগ্ধ মন্তব্যের দ্বারা সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। শকুন্তলা ও মিরাণ্ডার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণের পার্থক্যকেও দু একটি সূক্ষ্মরেখায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন: "দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা।… এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—

মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাহিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করেনা; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই তুলনাটি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত, তেমনি মনস্তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধটির শেষে লজ্জাশীলা শকুন্তলা যে সভাতলে দুষ্মন্তকে কেন তিরস্কার করেছেন তিনি তার একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন: "যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বীকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র।"

'শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধেও এই দুটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দেস্‌দিমোনার অভিমানশূন্যতা, ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতার সঙ্গে শকুন্তলা চরিত্রের কোনো তুলনা হয় না। কিন্তু এই দুটি চরিত্র যে ঠিক একজাতীয় নয় এ কথাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। প্রবন্ধটির শেষ দিকে তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নাটকের যে মৌলিক পার্থক্য দেখিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয়-দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে।" পাশ্চাত্য নাটক ও ভারতীয় দৃশ্যকাব্য—এই দুয়ের পার্থক্য দু একটি সাধারণ মন্তব্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাধান হলো—"শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীব প্রায় গঠন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধদ্বয় পরবর্তীকালের অনেক সমালোচকেরই পথনির্দেশ করেছে। 'শকুন্তলা' ও 'টেম্পেস্টের' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথও অনেকখানি বঙ্কিমপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য তাঁর অতুলনীয় কল্পনাবৃত্তির দ্বারা তিনি শকুন্তলাকে নূতন করেই সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুবিশ্লেষণের দিকেই প্রধানত দৃষ্টি দিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা নূতন ভাববস্তুতে পরিণত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের শেষে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন: "পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী,

অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।"—শকুন্তলা নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন আবিষ্কার করেছেন, তার একটু ইঙ্গিত যে বঙ্কিমের এই স্থমিতাক্ষর মন্তব্য থেকে পান নি, এ কথা জোর করে বলা যায় না।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের একাংশ বিদ্যাপতি ও জয়দেবের তুলনামূলক আলোচনা, কিন্তু প্রাসঙ্গিক আলোচনাই প্রবন্ধটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। গীতিকাব্যের সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মিল কোথায় লেখক তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি গীতিকবিদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: "একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য-প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য-হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন।" আধুনিক বাঙালী গীতিকাব্য লেখকদের তিনি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তিনি জয়দেবকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও বিদ্যাপতিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কবি হিসেবে নির্দেশ করেছেন। জয়দেবের কাব্যে ইন্দ্রিয় বিলাসের প্রাধান্য, তাই মানবহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবের ছবি সেখানে অনুপস্থিত, কিন্তু বিদ্যাপতির কাব্যে মানবহৃদয়ের রহস্যময় ভাব-বৈচিত্র্য রূপায়িত হয়েছে। 'চণ্ডীদাসের কবিত্ব' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনুসরণ করেছেন। বিশিষ্ট কয়েকটি উপমার সাহায্যে বঙ্কিম তাঁর বক্তব্যকে রূপবান করে তুলেছেন: "জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারি-বিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী।…জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।" বিশ্লেষণীশক্তির সঙ্গে রসবোধ ও কল্পনাপ্রবণতা বঙ্কিমের সমালোচনাকে উচ্চতর রসসাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। আধুনিক কালের গীতিকবিদের সঙ্গে অতীতকালের কবিদের তুলনার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধেরও উপসংহারে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কিত যে মন্তব্যটি করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য:

"কাব্যে অন্তঃ প্রকৃতি ও বহিঃ প্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃ প্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর

ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে।...ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে।...ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth."

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা যে কাব্যের বহিরঙ্গ বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি যে কাব্যবিচারে নিগূঢ় মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন, উদ্ধৃত অংশটি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'দ্রৌপদী' সম্পর্কিত দুটি প্রস্তাবের মধ্যেও একটু নূতনত্ব আছে। মহাভারতের কেন্দ্রীয় নারীচরিত্র দ্রৌপদী। কিন্তু এত বিশিষ্ট চরিত্রের তেমন কোনো সমালোচনা হয়নি। প্রথম প্রস্তাবে তিনি দ্রৌপদী চরিত্রের তেজস্বিতা এবং ধর্ম ও গর্বের সামঞ্জস্যের কথা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রায় দশ বছর পরে রচিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি দ্রৌপদী চরিত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। প্রসঙ্গটি নানাদিক থেকেই আলোচনা করা যায়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের দিক থেকেই বিষয়টি আলোচনা করেছেন : "এইরূপ 'নির্লেপ' বা 'অনাসঙ্গ' পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনা মধ্যবর্তী করিয়াছেন।" প্রথম প্রস্তাবটি সাহিত্যিক, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি তাত্ত্বিক আলোচনা। প্রথম প্রস্তাবে তিনি মহাভারতের বীরনারী রৌদ্ররূপিণী দ্রৌপদীকে নিজের মানসভুমিতে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন।

৪

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের বিভিন্ন ফর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য—সাহিত্যের এই তিনটি বিভাগের কথাই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। খুব সংক্ষেপে তিনি গীতিকাব্যের

সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন : "অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাস' শব্দটির দ্বারা তিনি কবিতার আত্মলীন ভাবুকতার কথাই উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকুই গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী।' লিরিক কবিতায় আভাষ-ইঙ্গিতের দ্বারা যেটুকু বলা যায়—স্পষ্ট করে সবটুকু বলা এখানে সম্ভব নয়। প্রবন্ধটি থেকে বোঝা যায় যে বঙ্কিমের গীতিকাব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই ছিল। কিন্তু এই ধারণা নিয়েও তিনি হেম-নবীনের কবিতার আস্বাদন করেছেন কেমন করে, এইটিই আশ্চর্যের বিষয়!

'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে লেখক 'কুমারসম্ভব'ও 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কাব্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান কতখানি, প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি সেই বিচার করেছেন। অতিপ্রাকৃতকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে না পারলে তাকে সাহিত্যপদবাচ্য করা যায় না। প্রাচীন কবিরা অতিমানুষ সৃষ্টি করতেন, কিন্তু তাঁরা অতিমানুষকে 'মনুষ্যচরিত্রানুকৃত' করে বর্ণনা করেছেন। শেক্সপীয়রও অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃতসত্যের মতো রূপ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন : "কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই ; এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।"

'কুমারসম্ভব ও 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর তুলনামূলক আলোচনার একটি অংশ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র কুমারসম্ভবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'পার্থিব পর্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয় সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে ; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।" বঙ্কিমচন্দ্রের

মদনভস্মের ব্যাখ্যাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বিস্তৃত রসরূপ লাভ করেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তকে রবীন্দ্রনাথও অতিক্রম করতে পারেন নি। বঙ্কিমের ব্যাখ্যাটিই রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজালে ও কবিকল্পনার ঐশ্বর্যে পল্লবিত ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের রস সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করেন নি। তিনি ভাষা ও স্টাইল সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি পড়লেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সম্পর্কে কি অভিমত ছিল, তা উপলব্ধি করা যায়। 'সবুজপত্রের' যুগে সাধুভাষা ও চলতি ভাষা নিয়ে বাদানুবাদ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই বাদানুবাদের প্রায় ছত্রিশ বছর আগে (১২৮৫) বঙ্কিমচন্দ্র সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘকাল পরে ভাষা সম্পর্কিত বাদানুবাদের সময় প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন। 'সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা' বাংলা ভাষাকে নিতান্ত নীরস ও দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। সেই অবস্থায় 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলাভাষার মধ্যে কতখানি নবজীবন সৃষ্টি করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার আলোচনা করেছেন। সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-এ আলালী ভাষাকে আক্রমণ করেন। তাঁর মতে, এ গ্রন্থ পিতাপুত্রে একসঙ্গে বসে পড়া যায় না, তা ছাড়া 'আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে।' বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মন্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ তদ্ভব শব্দের সমপরিমাণেই ব্যবহৃত হচ্ছে, বঙ্কিমের মতে তাদের ভাষা থেকে বহিষ্কার করে কোনো লাভ নেই—যেমন, 'মস্তক' ও 'মাথা'—দুই-ই প্রচলিত আছে, সেক্ষেত্রে 'মস্তক' শব্দটি বাদ দিয়ে কোনো লাভ নেই। 'সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ শূন্য' শব্দ সম্পর্কেও গোঁড়া সংস্কৃতবাদীদের বিরূপ মন্তব্যকে তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তবে সংস্কৃত ভাষার রত্নভাণ্ডার থেকে 'অভাব পূরণের জন্য ধার করাকে তিনি অন্যায় মনে করেন না। তাঁর মতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার ঐশ্বর্যময়, দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত শব্দ বাংলায় 'ভাল মিশে', তৃতীয়ত, সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহ করলে অনেকের পক্ষে ইংরেজি ও আরবির চেয়ে বেশী বোধগম্য হবে। বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য যে কোনো

প্রকার শব্দের ব্যবহারই তিনি অনুমোদন করেছেন। বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য : "অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।" বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে এর চেয়ে মূল্যবান নির্দেশ আর কিছু হতে পারে না।

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' সঙ্গীত বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি প্রধানত 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্যতম লেখক জগদীশনাথ রায়ের। সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশনাথের রচনার সঙ্গে নিজের বক্তব্য যোগ করে দেন। 'সঙ্গীত' প্রবন্ধটি মূল রচনার ভগ্নাংশ হলেও রসাস্বাদনে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। বর্তমান কালে সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সেযুগে পত্র-পত্রিকায় সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি সঙ্গীত সম্পর্কে কোনো টেকনিক্যাল আলোচনা নয়, সাধারণ আলোচনাই। সে যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের সঙ্গীত সম্পর্কে বিরূপ ধারণাই ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতকে উচ্চাঙ্গ কাল্চারের অঙ্গ হিসেবেই দেখেছেন। কুলকামিনীদের সঙ্গীত শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন : "যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন।"

'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' ও 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন'— প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আদর্শ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য প্রবন্ধটিতে নিবেদিত হয়েছে একদিকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের

বিরূপতা অন্যদিকে ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যদের নাসিকাকুঞ্চন—এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে বাংলাভাষার শোচনীয় দুর্দশা হয়েছিল। উপযুক্ত গ্রন্থেরও অভাব ছিল। সেই অভাব দূর করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। স্বদেশ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ যে তাঁর কত তীব্র ছিল, তা তাঁর একটি উক্তি থেকে জানা যায়ঃ "গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটী রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' সূত্রাকারে লিখিত হয়েছে—ঠিক সাহিত্য সমালাচনার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু এই দ্বাদশসূত্র বাঙালী লেখকদের কাছে বেদবাক্য হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিত। সাহিত্যসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা কত বড়ো ছিল, সাহিত্য সেবকদের ব্রতকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার একটি মহিমান্বিত স্বাক্ষর সূত্রগুলির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু এই সূত্রগুলির মধ্যে তাঁর সাহিত্যিক প্রত্যয়ও ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কলাকৈবল্য ও বিশুদ্ধ রসচর্চার জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, দেশ ও জাতির কল্যাণেই যে তার সাহিত্যবোধ পরিচালিত হয়েছে, তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয় সূত্রে তিনি বলেছেনঃ "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" চতুর্থ সূত্রে তিনি বলেছেনঃ "সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা মহা পাপ।" সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এই সমস্ত কল্যাণবাণী বঙ্কিমের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে এক অভ্রভেদী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বাঙালীর ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক প্রচেষ্টার কাহিনী একই সূত্রে গ্রথিত। সিপাহীবিদ্রোহ-পরবর্তীকালে গুপ্ত কবির কাব্যে স্বদেশপ্রেমের প্রথম কাকলি শোনা গিয়েছিল। পরবর্তীকালেও রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কাব্যে স্বদেশপ্রেমের নবীন উন্মাদনা উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালীর দেশপ্রেম যথেষ্ট ইতিহাস-সচেতন হয়ে ওঠে নি। টডের রাজস্থানকাহিনী, ইংরেজী স্বদেশপ্রেমের কবিতা ও ঐতিহাসিক উপন্যাস, গ্রীস রোম ও য়ুরোপীয় অন্যান্যদেশের মৃত্যুভয়হীন স্বদেশপ্রেমের কাহিনী শিক্ষিত বাঙালীর জীবন-সমুদ্রে এক নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু প্রধানত দূরকালকে অবলম্বন করে সুলভ রোমান্স সৃষ্টির উপাদান হিসেবেই বঙ্গদর্শন-পূর্ববর্তীকালে ইতিহাসকে অবলম্বন করা হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে একটী নূতন দিক চোখে পড়ে। সুলভ কল্পচারণাকে অতিক্রম করে ক্রমে তিনি এমন একটি কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন, যেখানে দেশপ্রেম ও ইতিহাস-গবেষণার যুগ্মবেণী রচিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দের বঙ্কিমচরিত বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: "The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and a nation builder."

বঙ্কিম-জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়েছে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে। এর তিনবছর আগে (১৮৬৯) বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিক কথিত বঙ্গবিজয়ের কল্পিত ও বিকৃত কাহিনীকে বঙ্কিম ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্য এখানে ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, কাহিনীগত দুর্বলতাও সুপ্রকট। কিন্তু ঐতিহাসিক ভ্রান্তিকে অপসারিত করে নূতন ইতিহাস-ব্যাখ্যার সূচনা 'মৃণালিনী' থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এখান থেকেই ইতিহাস-গবেষক বঙ্কিমের যাত্রা শুরু।

বাংলার ইতিহাস চর্চার দ্বারা বাঙালীর স্বাজাত্যবোধকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি

বৈজ্ঞানিক স্থিতিস্থাপকতা দিতে চেয়েছিলেন—ঐতিহাসিক ভ্রান্তি ও অপপ্রচারের কুয়াশা থেকে ইতিহাসকে সত্যের নির্মল আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলাই ছিল যুগস্থর্য বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ উদ্দেশ্য। মনীষী বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন: "'বঙ্গদর্শন'ই সর্বপ্রথমে, ইংরেজ বাঙ্গালার যে ইতিহাস গড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটি সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাঙ্গালার চরিত্র সাধনার যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয় বিস্তর আছে—এই কথাটা প্রচার করে। এইরূপে বাঙ্গালার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে 'বঙ্গদর্শন'ই সর্বপ্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে।" (বঙ্গবাণী: বাংলার নবযুগের কথা) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কয়েকটি মূলনীতি ছিল—বাংলার ও বাঙালীর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসকে বঙ্কিম গবেষণা-নির্ভর সংস্কারের আলোকে ও সত্যের ধ্রুবজ্যোতিতে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই দুরূহ কাজে বঙ্কিমের উদ্যম ছিল অক্লান্ত, প্রীতিবোধ ছিল অসাধারণ। ইতিহাস-গবেষণার এই চিহ্নহীন পথে তিনি নিজে নেমেছিলেন, এবং একদল তরুণতর গবেষক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: "এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে ও অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধগুলিকে এমন কিছু অসাধারণ মনে করেন নি—তাই তিনি নিজেকে ইতিহাস-গবেষণার কুলি-মজুর এর বেশী ভাবতে পারেন নি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই জাতীয় রচনাগুলির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ,' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক,' 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি,' 'বাঙ্গালা শাসনের কল' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক আলোকিত করে তুলেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনার মধ্যেই তিনি নিবদ্ধ ছিলেন না, ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিও তাঁর কম কৌতূহল ছিল না—

'ভারত কলঙ্ক,' 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি,' 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি,' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানের যে প্রমাণ দিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধটিকে বঙ্কিমের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধমালার ভূমিকা বলা যায়। প্রবন্ধের প্রথমেই বাংলার ইতিহাস নেই, সেইজন্য যে আক্ষেপ করেছেন, তার আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী: "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীন্‌লণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র।" বাংলাদেশের ইতিহাসকে উদ্ধার করা সম্ভব কিনা, এবং সম্ভব হলে কি ভাবে কার্যে পরিণত করা যায়—এ চিন্তাও তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। অতীত বাংলার গৌরব কাহিনীকে তিনি শুনিয়েছেন। সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয় কাহিনীকে তিনি অবিশ্বাস্য গল্প মনে করেছেন। বাংলায় মোগল শাসনের যে অর্থনৈতিক পটভূমিকা তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার বিবর্ণমূর্তি মোগল-ঐশ্বর্য-মোহগ্রস্ত মনকে রূঢ় আঘাত করে।

"যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতেই বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ।...যেদিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লী বা আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল

রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহাদের অগ্রগণ্য? তক্ততাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধন তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা, ফতেপুরসিক্রি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহাজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে?"

ইতিহাসবিস্মৃত জাতিকে বঙ্কিম এইভাবেই কশাঘাত করেছেন—এতেও যদি চৈতন্য হয়!

বাঙালীর দুর্বলতা ও ভীরুতার যে কলঙ্ক আছে, তাও বঙ্কিমচন্দ্র উদাহরণ ও যুক্তির দ্বারা অপনোদন করার চেষ্টা করেছেন। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মেগাস্থিনিস্, উইলসন্ সাহেব প্রমুখের ঐতিহাসিক বিবরণী থেকে বাঙালীর বাহুবলের বহু উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। মুসলমানেরা স্পেন থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অধিকার করাই যে সবচেয়ে দুরূহ হয়েছিল, এ কথা তিনি 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির অন্তরালে যেমন এক প্রবল আদর্শবাদ ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ তরঙ্গিত হয়েছে, তেমনি অনুরাগ-মুগ্ধকণ্ঠে এই যুগন্ধর পুরুষ বাঙালীর কাছে পাঠিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান:

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে?

"তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?"

'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে রংপুর ও কামরূপের লুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধটিকেও

গবেষণামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ বলা যায়। সাতটি প্রবন্ধে তিনি এই পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। তিনি বর্তমান বাঙালীর মধ্যে চারটি ভাগ দেখেছেন: আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্যানার্য হিন্দু, বাঙালী মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাবে ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হয় নি, সুতরাং তাঁকে নূতন ক্ষেত্রে নূতন পথ খনন করতে হয়েছিল। তাই আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনেকগুলিই বাতিল হতে পারে, কিন্তু পথিকৃৎ হিসেবে তিনি যে হৃদয়াবেগ ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত ইতিহাস কতকগুলি সন-তারিখ ও তথ্যপঞ্জীর সমাহার মাত্র নয়। একটি প্রাণবান জাতির সর্বতোমুখী আত্মপ্রকাশের কাহিনীকেই তিনি ইতিহাস বলেছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন: "By history he did not mean the dry accounts of Kings and Governors and of their intrigues, amours and Wars....By history he means social, religious, cultural and economic history of the Bengali people."

[History of Political Thought, pp432-33]

৬

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা শুধু অতীত ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাঙ্গালা শাসনের কল' প্রবন্ধে তিনি স্যর উইলিয়ম গ্রে ও স্যর্ জন কাম্বেল—এই দুজন লেঃ গভর্ণরের শাসনবিধির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা যে শুধু যান্ত্রিক-পদ্ধতিতেই চলতে পারে না, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করেছেন। একটি নদীতীরের বাঁধভাঙার ব্যাপার নিয়ে আমলাতন্ত্রের কৌতুককর প্রহসনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা যেমন বাস্তবনিষ্ঠ, তেমনি উপভোগ্য। আমলাতন্ত্রের 'লালফিতা' তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র অভ্রান্ত দৃষ্টিতেই পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'রামধন পোদ' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গল্পচ্ছলে যে কথা বলেছেন, তার উপযোগিতা বর্তমানকালেও উপলব্ধি করা যায়। প্রজাবাহুল্য যে দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ একথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন। 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধে তিনি বাল্যবিবাহের কুফলের কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি জনসংখ্যাধিক্যের অর্থনৈতিক পরিণামের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেনঃ "যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পূরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহু সন্তান প্রসবিনী বলিয়া তাঁহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোনদেশেই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ।" বঙ্কিমচন্দ্র ম্যালথাসের মতবাদের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ "আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, 'এ রকম কঠিন হৃদয় মাল্‌থসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?' "

অনেকে পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্যের কথা উল্লেখ করেন। রামধন পোদ নামক একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে উপদেশ দেওয়া যেমন সহজ, কার্যে পরিণত করা তেমনি কঠিন। যেখানে শাকান্ন জোটাই দুষ্কর, সেখানে ঘি, দুধ, ময়দা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের তালিকা বাড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রধানত প্রজাবৃদ্ধির কথাই উল্লেখ করেছেন। দেশের মধ্যে কুসংস্কার এমন প্রবল যে, বিবাহকে একটি অবশ্যকরণীয় প্রথা হিসেবে মেনে নিয়েছে। সংস্কারের শিকড় এমন বদ্ধমূল যে, শত যুক্তি বুদ্ধি সত্ত্বেও তাদের এই তথাকথিত কর্তব্যপথ থেকে বিরত করা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতকে সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেনঃ "ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে; মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য— শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্বব্যাপী, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে বাপ মা ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে

বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই তুস্তর সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে?'

'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের 'বহুবিচার রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচারের দ্বিতীয় পুস্তিকা'র প্রতিবাদ হিসেবে লিখিত হয়েছিল। বহুবিবাহ রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগর অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণের অবতারণা করেছিলেন। বঙ্কিমের মতেও বহুবিবাহ কুপ্রথা, কিন্তু দেশে ক্রমশ বহুবিবাহ কমে এসেছে—সুশিক্ষার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই কুপ্রথা লুপ্ত হবে। সুতরাং মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে কোনো লাভ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডনকুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে।" সুতরাং বঙ্কিমের মতে বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে কিছুই লাভ নেই। বহুবিবাহপ্রথা স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হবে, এর জন্য আইনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পক্ষেও একটি কথা বলার আছে। শাস্ত্র সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অনেক সময়েই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে। তাই জনমতের সমর্থন পাওয়ার জন্যই তাঁর শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে হয়েছে।

'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মেয়েদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির শেষে তিনটি কাল্পনিক পত্র সংযোগ করে তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। বঙ্কিম এখানে দুদলেরই ভালোমন্দ আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর পক্ষপাতিত্ব যে প্রাচীনার দিকেই তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহ সম্পর্কেও তিনি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন: "আবার দিনকতক ধুম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক-বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে।"

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত রচনা। চারটি

পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই প্রবন্ধ বঙ্কিম প্রতিভার একটি দিককে ধ্রুব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। 'সাম্য' ব্যতীত সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কিত এমন সুদীর্ঘ ও বিশ্লেষণী প্রবন্ধ আর তিনি লেখেন নি। নানাদিক থেকে এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দেশের বঞ্চিত কৃষকদের জীবনের বিবিধ সমস্যা যে তাঁকে কতখানি বিচলিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণীশক্তি ও হৃদয়বত্তা—এই দুয়ের বাঞ্ছিত মিলনে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে (দেশের শ্রীবৃদ্ধি) বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই যে, আপাত-দৃষ্টিতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে মনে হলেও কৃষক ও চাষীরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। বাইরের দিকে অনেক বৈষয়িক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। বঙ্কিম প্রশ্ন করেছেন: "এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?…বল দেখি চশমা-নাকে বাবু। ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমর কৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে?" বঙ্কিমের মতে কৃষিলক্ষ্মী সুপ্রসন্না; কিন্তু রাজা ভূস্বামী, বণিক মহাজন, প্রভৃতি সকলেই সেই প্রসন্নতার সুফল ভোগ করেছেন—কেবল কৃষকরাই বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ লোকই এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত। তাই বঙ্কিম বলেছেন: "এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয়গান করিব না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (জমিদার) বঙ্কিমচন্দ্র প্রজাদের উপর জমিদারের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। পরাণ মণ্ডল নামে একজন কল্পিত কৃষককে দাঁড় করিয়ে তিনি এই অত্যাচারের একটি পূর্ণচিত্র অঙ্কন করেছেন। আদর্শবাদী বঙ্কিমের লেখনী সুস্পষ্টভাবেই সমস্ত কিছু উদঘাটিত করেছে। তাঁর

একটি মন্তব্য লক্ষণীয়ঃ "যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।" ইণ্ডিয়ান অবজারভার থেকে তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে আরও জোরালো করে তুলেছেন। তাঁর প্রতিটি বক্তব্যের পিছনে প্রচুর পরিমাণে তথ্য-প্রমাণ আছে। অবশ্য এর জন্য তিনি জমিদার সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন নি—কারণ এমন অনেক সহৃদয় সংস্কৃতিবান জমিদারও আছেন যাঁরা দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেক কিছু করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (প্রাকৃতিক নিয়ম) সর্বাপেক্ষা সুলিখিত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যাটির নিগূঢ় মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে যেমন কৃষকদের দুরবস্থার জন্য জমিদারদের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে; এই পরিচ্ছেদে তেমনি কৃষকদের দুর্ভাগ্যের জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম কতদূর দায়ী তা আলোচনা করা হয়েছে। বক্‌ল্, লেকি প্রমুখ য়ুরোপীয় মনীষীদের চিন্তাধারার তিনি পুনর্বিচার করেছেন। সামাজিক ধনসঞ্চয়ের কারণ নির্দেশ করে 'মজুরীর বেতন' এবং 'মুনাফা'র সৃষ্টি কি ভাবে হয়েছে উদাহরণ দিয়ে তা বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমজীবীদের যে অনিষ্টের কারণ তা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর দুটি পন্থা নির্দেশ করেছেনঃ কিছুলোকের দেশান্তর গমন ও বিবাহ প্রবৃত্তি দমন। কিন্তু এই দুটি উপায়ের বহু প্রতিবন্ধকতার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বেতনের স্বল্পতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, শিক্ষার অভাব, বুদ্ধিজীবীদের অত্যাচার শ্রমজীবীদের অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছে। অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে শ্রমজীবীদের দুর্দশা কিভাবে ক্রমবর্ধিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে (আইন) রাজবিধি কৃষকদের কতদূর স্বার্থহানি করেছে বঙ্কিমচন্দ্র তার আলোচনা করেছেন। জমিদার প্রজাকে পীড়ন করেন সত্য, কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদেরও তাতে অনেকখানি হাত আছে। প্রাচীন গ্রীস, ইংলণ্ড, ফরাসী, মুসলমান, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি জাতির প্রজাপীড়নের উল্লেখ করেছেন। জমিদারী প্রথা কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। মুসলমান আমলেই জমিদারী প্রথার

সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরগণায় করসংগ্রাহক নিযুক্ত করলেন। বঙ্কিম বলেছেন: "তাঁহারা এক প্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইলেন। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমিদারীর সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজা-পীড়নের সৃষ্টি।"

লর্ড কর্ণ্ওয়ালিসের ভ্রমাত্মক বিধি ব্যবস্থাকে বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন যে জমিদারদের জমিদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নেই জন্যই তারা জমিদারীর যত্ন নিচ্ছেন না। তাই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। বঙ্কিম বলেছেন: "কর্ণ্ওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারদিগকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত 'চিরস্থায়ী'।" প্রবন্ধটির শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কার্যকারণ সূত্রগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যে জিনিসে হাত দিয়েছেন, তাই সোনা হয়ে উঠেছে। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, সদাজাগ্রত বিচারশক্তি, বহু ব্যাপক অধ্যয়ন যে কোনো জটিল সমস্যারই গ্রন্থিমোচন করেছে। জড়তার বল্মীকস্তূপে আচ্ছন্ন, মোহগ্রস্ত ও ঘুমন্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি কশাঘাতে জাগিয়ে দিয়েছেন। অনেক মিথ্যা-মোহের মরীচিকা জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি সেই ব্রতভ্রষ্ট জাতিকে মোহমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছে।

৭

বিবিধ প্রবন্ধের দুখণ্ডেই ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। 'জ্ঞান' 'সাংখ্যদর্শন,' 'চিত্তশুদ্ধি,' 'কাম,' 'মনুষ্যত্ব কি?', 'ধর্ম ও সাহিত্য', 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রভৃতি প্রবন্ধে দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধর্মতত্ত্ব,' 'কৃষ্ণচরিত্র' ও

'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'—এই তিনটি গ্রন্থ দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি বেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত না হলেও, তাঁর দার্শনিক বিচার, সিদ্ধান্ত ও প্রত্যয়ের অনেকগুলি মূলসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তার মূল অনুসন্ধান করতে হলে, তাঁর একটি উক্তি স্মরণ করা কর্তব্য। 'অনুশীলন' গ্রন্থের একস্থানে তিনি বলেছিলেন ঃ

"অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়াছি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক গঠনই ছিল আলাদা। অতি তরুণ বয়স থেকেই জীবন সম্পর্কে তাঁর যে প্রশ্ন জেগেছিল, সেখানেই তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসার ভিত্তি। এই বিচিত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে তৃষ্ণার্ত বঙ্কিম নানাভাবে এর মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রবন্ধে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা মত ও নানা পথের আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোনোটাই তাঁর মনঃপূত হয়নি। পরবর্তীকালের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে যে অনুশীলন ধর্মের কথা বলেছেন, তার বীজ এইখানেই পাওয়া যায় ঃ

"যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক মার্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের

উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।" শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে অনুশীলন করাকেই বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্ব বলেছেন।

'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে চিত্তশুদ্ধিকে বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্তিসমূহের 'সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল' বলেছেন। চিত্তশুদ্ধির কয়েকটি লক্ষণও তিনি নির্দেশ করেছেন। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়াসক্তির চেয়েও বড়ো শত্রু আত্মাদর ও স্বার্থপরতা। ঈশ্বরভক্তিকে চিত্তশুদ্ধির সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি সহকারে চিত্তশুদ্ধির স্বরূপকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'জ্ঞান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দর্শনের একটি মূলসূত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোঁৎ, কাণ্ট, মিল্, হার্বাট স্পেন্সার প্রমুখ য়ুরোপীয় দার্শনিকদের মতামতগুলিও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনকে মেলাতে গিয়ে তিনি ভারতীয় দর্শনের মৌলিকতা ও বিশালত্বের কথা চিন্তা করেছেন: "আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন সেই ফিরিয়া ফিরিয়া, সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।" বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের পজিটিভিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত। তিনি সমাজশিক্ষক হিসেবে কোঁতের স্থান দান্তে—শেক্সপীয়ার—গ্যালেলিও—নিউটন প্রমুখ মনীষীর পাশেই নির্দেশ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও তিনি প্রথমে কোঁতের মতবাদ সমর্থন করে লিখেছিলেন: "অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল।" কিন্তু পরবর্তী কালে 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রবন্ধটি প্রকাশ করার সময় তিনি পাদটীকায় লিখেছিলেন: "এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।" কোঁত প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া আর কোনো প্রমাণ স্বীকার করতেন না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' স্পষ্টই বলেছেন: "সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা

ভগবদ্‌গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।" বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে কোঁতের প্রভাব থেকে যে অনেকখানি মুক্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেন্থামের হিতবাদ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রাজা, সমাজ ও প্রণয়ী এই তিনের অত্যাচারের মধ্যে প্রথম দুটির বিরুদ্ধে অনেকেই অস্ত্র ধারণ করেছেন। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই—কারণ সেখানে বিরোধী হওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে না। কেউ কেউ মনে করেন প্রেমের দ্বারাই একমাত্র ভালবাসার অত্যাচার দমন করা সম্ভব। কিন্তু স্বার্থপর স্নেহ ছাড়া এ ব্যাপার সম্ভব হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র রাম নির্বাসনের ব্যাপারে দশরথ ও কৈকেয়ীর দায়িত্ব কতখানি ছিল আলোচনা করেছেন। তিনি দশরথকেই এ বিষয়ে বেশী দায়ী করেছেন, "যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্যরক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে?…আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার একপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন।…কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের উপর হিতবাদের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু কমলাকান্তের দপ্তরে ইউটিলিটিকে 'উদর-দর্শন' বলে ব্যঙ্গও করেছেন। শেষ উপন্যাস 'সীতারামে' 'গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি"—বলে আক্ষেপও করেছেন।

'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি'—রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক দুরূহ বিষয় গল্পচ্ছলে আলোচনা করেছেন। তিনি এখানে দেবতাবাদের রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তখনকারদিনের শিক্ষিতসমাজে এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ম্যাক্সমূলার বলেছেন যে দেবতা প্রাকৃতিক শক্তিরই রূপক। গৌরদাস বাবাজির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "ইন্দ্র বায়ু বরুণ নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড়-বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতে

দেবতা অশরীরী। কিন্তু মূর্তির পুজো করি কেন এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত—"উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না।" 'কাম' প্রবন্ধে তিনি মহাভারতোক্ত কামের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে ইন্দ্রিয়বশ্যতা বা Sensuality ও কাম এক বস্তু নয়। কারণ কামের মধ্যে শুধু পঞ্চইন্দ্রিয়ের কথাই নেই, মন ও হৃদয়ের প্রসঙ্গও আছে।

পাঁচ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটি দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সাংখ্যদর্শনের মতো দুরূহ বিষয়কে নিয়ে বঙ্কিমের পূর্বে আর কেউ বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন নি। প্রাচ্যদর্শনের এই বিশেষ শাখাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কত সহজে বাংলাভাষায় রূপ দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে' যে কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ আছে, তা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর উপলব্ধি-জাত সোনার ফসল।

৮

বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ হলো নিতান্তই ইতিহাসের কথা। প্রকৃত পক্ষে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই প্রবন্ধকে উচ্চতর সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন। বক্তব্যকে জানানো সাহিত্যিক প্রবন্ধের একটি দিক মাত্র; কিন্তু সেই বক্তব্যকে রসে মণ্ডিত করতে না পারলে শিল্প হয়ে উঠতে পারে না। প্রাবন্ধিকের পক্ষে ভারসাম্য রক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আছে। যেমন তেমন ভাবে বক্তব্য উপস্থাপিত করার মধ্যে সাহিত্যিক গুণ অনুপস্থিত। তেমনি আবার বক্তব্যকে ঢেকে দিয়ে ভাষার ফুলঝুরি বর্ষণ করাও প্রবন্ধকারের পক্ষে মারাত্মক ত্রুটি। স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা. যুক্তিনিষ্ঠা যেমন প্রবন্ধের পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি তাকে প্রকাশ করার শিল্প-সম্মত মাধ্যমটিও প্রয়োজন। এই দুয়ের সামঞ্জস্য না ঘটলে ভালো প্রবন্ধের জন্ম হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রবন্ধকারের দুর্লভ গুণের সমন্বয় হয়েছিল। তিনি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে কাব্য করতে বসেন নি, ভাষা ও ভঙ্গির শাখা-প্রশাখা, ফুল-পল্লব দিয়ে বক্তব্যকে ঢেকে দেন নি। বক্তব্যকে সুন্দর করতে গিয়ে যতটুকু অলঙ্কারের প্রয়োজন তার বেশী অলঙ্কার

দিয়ে তাঁর ভাষাকে তিনি সাজান নি—কিন্তু এই জন্য তাঁর ভাষার মাধুর্যের তারতম্য ঘটে নি।

বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধকারদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, অনেক শক্তিশালী লেখকও এই ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে পাণ্ডিত্য, বিশ্লেষণদক্ষতা ও যুক্তিনিষ্ঠার অভাব নেই, কিন্তু তিনি তাঁর মনীষাদীপ্ত বক্তব্যগুলিকে রসে মণ্ডিত করতে পারেন নি। তাই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি। আবার এর উল্টো পিঠও আছে। সে যুগে মনস্বী প্রবন্ধকার হিসেবে কালীপ্রসন্ন ঘোষের খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাস-ফেনিল ভাষা, অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ ও প্রকাশভঙ্গির কাব্যাতিরেক প্রবন্ধগুলিকে দুর্বল করে ফেলেছে। কাব্যোচ্ছ্বাসের প্রবাহে তাঁর বক্তব্যের চিহ্ন পর্যন্ত এক এক সময় মুছে গিয়েছে—কতকগুলি ধ্বনি ও মনোহর শব্দবিন্যাস ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ভঙ্গি অনেক সময় ম্যানারিজমে পরিণত হয়। প্রমথ চৌধুরীর মতো একজন কৃতকর্মা গদ্যশিল্পীও এই দোষের জন্য মাঝে মাঝে ভারসাম্য হারিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণতা অনেক সময় তাঁর বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা নষ্ট করে দিয়েছে। তাই বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলির সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো ভারসাম্যতা। সম্ভবত এগুণটি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই।

বঙ্কিম-পূর্ববর্তী যুগের গদ্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগের বাংলা গদ্যের বিচিত্র ধারাগুলি তাঁর প্রতিভার স্পর্শে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। পূর্ববর্তী গদ্যলেখকদের অধিকাংশ রচনাই উদ্দেশ্যমূলক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠী, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রমুখ গদ্যলেখকদের অধিকাংশ রচনা সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করেও তারা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই লিখেছেন। তাঁর বিচিত্র জিজ্ঞাসা নানা বিষয় আশ্রয় করে রূপলাভ করেছিল—'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণ করার জন্যও তাঁকে নানা ধরনের লেখা লিখতে হয়েছিল, কখনো কখনো আবার দেশ-জাতির নানা সমস্যাকে তুলে ধরে জাতিকে মোহমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই বিচিত্র

প্রচেষ্টা ও নানা উদ্দেশ্যের পিছনে ছিল সাহিত্যিক বঙ্কিমেরই সারস্বত সাধনা। তাই তাঁর রচনার মধ্যে যে কোনো উদ্দেশ্যই থাক না কেন, তা সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

বিবিধ প্রবন্ধের রচনাগুলিতে বঙ্কিমের বহুমুখী পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা আছে, কিন্তু পাণ্ডিত্য এখানে রসিকতার বিরোধী হয়ে ওঠে নি। পাণ্ডিত্য ফলানোর উগ্র প্রচেষ্টা যথার্থ পণ্ডিত ও রসিকের পরিপন্থী। শুধু সাহিত্যই নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব যেখানে যা কিছু পেয়েছেন, তা তিনি জীর্ণ করে ফেলেছেন। যখন লিখতে বসেছেন, তখন দেখা গেল পঠিত বিদ্যা অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে—পরের বিদ্যা নিজের হয়ে উঠেছে। তাঁর ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই গবেষণামুখী পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি ও পাদটীকা থেকেই তাঁর অনুসন্ধান তৎপর গবেষণামুখী মনের গভীরতা অনুমান করা যায়। ভাষাগোষ্ঠীর আলোচনা করতে গিয়ে জার্মান লেখক অগাস্ট শ্লেচর, ম্যাক্সমূলর প্রমুখ পণ্ডিতের মতামত আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া এলফিন্স্টোনের ইতিহাস, ড মূরের Sanskrit Text, এশিয়াটিক সোসাইটির বিবিধ জার্নাল, সেন্সাস রিপোর্ট, হাণ্টারের Statistical Accounts of Bengal, ডল্টসের Ethnology, সংস্কৃত শাস্ত্র-পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি তিনি মন্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে একমাত্র ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই জাতীয় গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর আলোচনাগুলি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্ব থেকে জাতিতত্ত্ব পর্যন্ত সর্ববিষয় আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রমাণপঞ্জী ও বিচিত্র বিদ্যা এখানে বোঝা হয়ে ওঠেনি। সহজ, প্রাঞ্জল ও সরস প্রকাশকুশলতায় প্রবন্ধটির সাহিত্যিক গুণ স্বপ্রকাশ। ডঃ মূরের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

"ডাক্তার মূর্ বিবেচনা করেন ঐ হিমালয়োত্তর প্রদেশেই ভারতীয় আর্যদিগের মধ্যে উত্তর কুরু খ্যাত ছিল। একদল য়ুরোপের একপ্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক নাম ধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর

নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন।”

ডাক্তার মূরের মতবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র সরস করে তুলেছেন। কারণ তথ্যপঞ্জীকে বঙ্কিমের হৃদয়াবেগ ও বিমুগ্ধ কল্পনা সজীব করে তুলেছে। বাংলার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে—দেশ ও জাতির প্রতি প্রেম ও উত্তুঙ্গ আদর্শবাদ সূর্যকরোজ্জ্বল তরঙ্গশীর্ষের মতো স্বর্ণদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে: “আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবন চরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোডরমল্লের আমলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।” সজীব প্রাণের স্পর্শ ও কল্পনাদীপ্ত হৃদয়াবেগের বহ্নিশিখাই বঙ্কিমচন্দ্রের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলিকে সৃষ্টিধর্মে মণ্ডিত করেছে।

কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধই যে গুরুগম্ভীর মেজাজের এ কথা বলা যায় না। এখানেও ‘লোকরহস্য’ ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর বঙ্কিমকে বিস্মৃত হলে চলবে না। অত্যন্ত জটিল বিষয়কে তিনি দৈনন্দিন জীবনের বৈঠকী আলাপের মতো সরস করে তুলতেও জানতেন। ‘সঙ্গীত’ প্রবন্ধে রাগ-রাগিণীকে বঙ্কিমচন্দ্র গল্পচ্ছলে ও অপেক্ষাকৃত লঘু মেজাজে চমৎকার ভাবে রূপ দিয়েছেন: “সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড সাকার হস্তপদাদি বিশিষ্ট, বেশীর ভাগ চতুর্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নহিলে গতিবিধি হয় কি প্রকারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহেন। মনুষ্যেরা কাম ক্রোধাদি পরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।”

হাস্যরস ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। দু একটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হবে:

(ক) "তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পড়িলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।" [বাঙ্গলা ভাষা]

(খ) "একটি রোমশূন্য গৃহমার্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উঁচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।" [রামধন পোদ]

(গ) "বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোত্তম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটি সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেন না নথ নাড়া দিবার দিনকাল গেল।" [বহু বিবাহ]

(ঘ) "তাই ত! সর্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে বাবাজি একরাশি ছাগলমাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন।"

[গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি]

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও বিচার্য। ভাষা ও স্টাইলের দিক থেকে ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের সম্পর্ক কি? ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের গদ্য স্টাইলের পার্থক্য আছে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের ভাষায় অলঙ্কার, উপমা, রূপকল্পের কবিসুলভ ব্যবহার লক্ষণীয়। বর্ণে বর্ণনায়, অলঙ্কারে উচ্ছ্বাসে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের গদ্য যেন রাজনন্দিনী—কণ্ঠমালায়-কঙ্কণে-নূপুরে তার অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ! প্রবন্ধকার বঙ্কিমের ভাষা যতদূর সম্ভব অলঙ্কার মুক্ত; এখানে তিনি কথাবিস্তারের পথ বর্জন করে বাক্ পরিমিতিকে আশ্রয় করেছেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের গদ্যরীতি সংযত, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন—সব রকমের আতিশয্য তিনি যতদূর সম্ভব বর্জন করেছেন। বাহুল্যবর্জিত হওয়ার ফলে ভাষা অব্যর্থলক্ষ্য শরের মতে ঋজু ও শরফলকের মতে লক্ষ্যভেদী।

বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা ও প্রবন্ধের ভাষা স্বতন্ত্র। হয়তো এর কারণও আছে। প্রবন্ধের ভাষা বিশ্লেষণ ও যুক্তির ভাষা, তার পক্ষে যতদূর সম্ভব বাহুল্যবর্জিত হওয়াই উচিত। এ যেন পদাতিক সৈন্য—গতির দ্রুততাল, মোড় ফেরার অতর্কিত কৌশল, আকস্মিক আক্রমণ ও সুকৌশল আত্মরক্ষা সব কিছুই একই সঙ্গে আয়ত্ত করতে হয়। বঙ্কিমের ভাষায় যাঁরা আতিশয্য লক্ষ্য করে থাকেন, তাঁরা প্রধানত তাঁর উপন্যাস পাঠক। ভাষাকে কতখানি সহজ ও তীক্ষ্ণ করা যায়, প্রবন্ধে তিনি তা দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের যেমন নিজস্ব পদ্ধতি আছে, তেমনি তার বিশিষ্ট প্রকাশরীতিও আছে। যে বঙ্কিম উপন্যাসে ভাষার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই আবার তাকে গৈরিক বসন ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়েছেন। এখানে ভাষার আর এক রূপ। বাংলা প্রবন্ধের শুদ্ধ সংযত ক্লাসিক্যাল রীতি, বঙ্কিমের হাতেই পূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আর একজন প্রবন্ধকার এই গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তিনি হলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে তৎকালীন দেশ-কালের কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিমের যুগ জাতিগঠনের যুগ, দেশ ও জাতিকে তৈরী করার দুরূহ ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রবন্ধে যে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তা একটি দেশ ও জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, চলার পথের নির্দেশ দিয়েছে। বঙ্কিম-পরবর্তী কোনো প্রবন্ধকারের মধ্যেই সে বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব নয়। শিল্পের দিক থেকে বাংলা গদ্য বঙ্কিমপরবর্তী যুগে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমের বলিষ্ঠ চিন্তা ও অভ্রান্ত বিশ্লেষণ নৈপুণ্য কদাচিৎই দেখা যায়। দর্শন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধাবলী বিশ্লেষণে, পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় গদ্যনিবন্ধ রচনা করেছেন, তাতে বস্তুর চেয়ে ভাব বড়ো, বক্তব্যের চেয়ে শিল্প গরীয়সী। তাই বঙ্কিম-প্রদর্শিত প্রবন্ধরীতি আজ প্রায় ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের রীতির যেদিন যথার্থ সমন্বয় ঘটবে সেই দিনই আসবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধির লগ্ন, তার আগে নয়।

কথাশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ একক ও নিঃসঙ্গ। গত শতাব্দীর শেষ দশক ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কাল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেদিনের মতো আজও তিনি নিঃসঙ্গ। যে পথে এই বিচিত্রকীর্তি লেখক পদক্ষেপ করেছেন, আসলে সেটা কোনো পথই ছিল না; সৃষ্টির আনন্দ ও জাগ্রত কৌতূহল নিয়ে তিনি নিজেই এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালেও এই বিচিত্র পথে বিশেষ কেউ পদক্ষেপ করেন নি। দুএকজন সচেতন ভাবে পথে পা বাড়ালেও, বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই ত্রৈলোক্যনাথ কোনো দল, গোষ্ঠী বা ধারার সৃষ্টি করতে পারেন নি। অবশ্য এর মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে, এত বড়ো শক্তিশালী লেখক হয়েও দীর্ঘকাল তিনি বিস্মৃতপ্রায় ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে ত্রৈলোক্যনাথের মতো একজন মহৎ সাহিত্যিকের সাময়িক অবলুপ্তির কারণ হলো, সেই সময় শরৎচন্দ্রের মতো অসাধারণ জনপ্রিয় কথাশিল্পীর আবির্ভাব। নিঃসন্দেহে কারণটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুতর, তবু এই কারণটিই ত্রৈলোক্যনাথের অবলুপ্তির যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। তাঁর বারো আনা গল্পই ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা নিয়ে লেখা—তা ছাড়া এখানে উদ্ভট কল্পনা ও আজগুবি রসের ছড়াছড়ি। তাই পরমবিজ্ঞ পাঠক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নগদ মূল্যের প্রত্যাশা বিশেষ কিছু ছিল না। 'কঙ্কাবতী' সে যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সত্য, কিন্তু রূপকথামূলক নিছক শিশুপাঠ্য গ্রন্থের বেশী মর্যাদা পায়নি। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক ভাগ্যই এমন যে, তাঁর ঐ আজগুবি রসের যথার্থ স্বরূপ চোখে আঙুল দিয়েও কেউ দেখিয়ে দেন নি। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন বাংলা দেশে এমন কোনো লেখক ছিলেন না, যিনি ভুলেও অন্তত একবারের জন্য সে

পথে পা বাড়িয়েছেন। শরৎচন্দ্র পল্লীজীবনের পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন। পাঠকসাধারণ তাঁর লেখার মধ্যে নিজেদের জীবনেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছে। ফলে ত্রৈলোক্যনাথ নেহাৎ অবাস্তব আজগুবি গল্পের লেখক হিসেবে শ্রুতি ও স্মৃতির অন্তরালে চলে গেছেন। বাস্তব-রসিক পাঠক সেদিন ত্রৈলোক্যনাথকে এইভাবেই বিদায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার অনন্যতা সে যুগে আর কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'কঙ্কাবতী' প্রকাশের পরেই তিনি 'সাধনা' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৯৯) যে সমালোচনা লিখেছিলেন, তার মধ্যেই ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভার মূল সূত্রটি আলোচনা করেছেন। 'পরম পাকা' তত্ত্বপিপাসু পাঠকদের সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন ঃ

"চার্ল্‌স ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কি? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কি, লক্ষ্য কি? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙো মুল্লুক-নিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহ-বার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠক সম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে।...আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতি কোটি সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্য চাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের এই সপ্রশংস বিদগ্ধ মন্তব্য সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথের এই বিশিষ্ট

প্রতিভা পাঠক সাধারণের অনুমোদন লাভ করে নি, শিশুপাঠ্য রূপকথা ও ভূতুড়ে গল্প হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছে! এমন কি ডমরুধরের মতো অসাধারণ চরিত্রটিকেও বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টতা আছে, যাকে সাময়িকতার ধূলিজাল আচ্ছন্ন করতে পারে না। তাই সংখ্যায় বেশী না হলেও, পরবর্তীকালের দুএকজন শক্তিশালী লেখক আবার সেই পরিত্যক্ত পথটি ধরার চেষ্টা করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের বিষয়বস্তু ও বিশিষ্ট রচনারীতির সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। অসুবিধা হলো এই যে তিনি গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। কালের দিক থেকে তিনি বঙ্কিম যুগেরই কথাশিল্পী—রমেশচন্দ্রের চেয়ে তিনি এক বছরের বড়ো। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অথবা এই যুগের অন্য কোনো কথাশিল্পীর সঙ্গে তাঁর রচনারীতি ও সাহিত্যিক মেজাজের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইতিহাসের বহুবর্ণরঞ্জিত পটভূমিকা, দূরকালের রোমান্স যেমন তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি, তেমনি বিষবৃক্ষ-স্বর্ণলতা-সংসার প্রভৃতি সে যুগের সামাজিক উপন্যাসের প্রভাবও তাঁকে স্বধর্মচ্যুত করতে পারেনি। ফলে বঙ্কিম-প্রবর্তিত বাংলা উপন্যাসের মূল ধারা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। রবীন্দ্রনাথ ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ। তাঁর প্রথমগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' যখন প্রকাশিত হয় (১৮৯২), তখন সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মনোধর্মের দিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথ এতই স্বতন্ত্র যে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবও তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। ফলে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি একটি পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো; কদাচিৎ কোনো সাহিত্যিক-কলম্বসের পদচিহ্ন তার নির্জন তটরেখায় আবিষ্কার করা যায়।

কিন্তু এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও রচনারীতির স্বাতন্ত্র্যই আবার তাকে কালজয়ীও করেছে। দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ বা দ্বিতীয় স্বর্ণলতা লেখার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি, ঐতিহাসিক রোমান্সের কুহকিনীও তাঁকে পথ ভুলায় নি। তাই তিনি বেঁচে আছেন। সে যুগের বহু লেখক যখন জাদুঘরের সামগ্রী হয়েছেন, তখনো ত্রৈলোক্যনাথের অফুরন্ত গল্পরস সজীব ও

অন্তরঙ্গ হয়ে আধুনিক পাঠককেও পরিতৃপ্ত করেছে। বাংলা সাহিত্যের ঐ নির্জন দ্বীপটির মধ্যে অসাধারণ ও বিচিত্র কথারস আছে। স্বপ্ন-খেয়াল-কল্পনা-কৌতুক নানা রঙে ও রেখায় তাকে চিরন্তন কালের দিকে প্রসারিত করেছে। রূপকথা-রূপক-খোশগল্প, আজগুবি কাহিনীর বিচিত্র আল্‌পনা ভাবীকালের মনের আঙিনাতেও ছবি এঁকেছে। একটির পর একটি করে অত্যন্ত লঘুলীলায় তিনি গল্পের গ্রন্থি উন্মোচন করে চলেছেন—রিক্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই—যেন দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ী, গল্পলোভী দুঃশাসনেরা শেষে ক্লান্ত হয়ে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের এমনি আদিম সজীবতা!

২

সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের যোগাযোগ কতখানি, এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক ও মতানৈক্যের অবকাশ আছে। অন্যক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, ত্রৈলোক্যনাথের মনোজীবন ও সাহিত্য সাধনার মূল উপাদান যে তাঁর জীবন থেকেই উৎসারিত হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ত্রৈলোক্যনাথের নায়ক নায়িকারা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে জানে না। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তিন ভুবনেই তাদের অব্যাহত গতি, দৈবদুর্বিপাক তো আছেই—যেখানে তা নেই সেখানেও তাঁর নায়ক নায়িকারা থেমে থাকতে জানে না। হয় স্বপ্ন, না হয় সূক্ষ্মদেহ, না হয় ভৌতিক কলাকৌশল তাদের চির-চঞ্চল করে রেখেছে। দুঃসাহসিক অভিযান, উদ্দাম কল্পনাশক্তি ও যাযাবর মনের অবাধ খেয়াল ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর জীবনসূত্র থেকেই পেয়েছেন। তাই ত্রৈলোক্যনাথের মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গেলে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই ঘটনাগুলি সূত্রাকারে তাঁর সাহিত্যিক জীবনও।

১৩১১ সালে বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গ ভাষার লেখক' গ্রন্থে ত্রৈলোক্যনাথের যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র জীবনের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে তাঁর

সাহিত্য জীবনের উপাদান হিসাবেও অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। অর্থাভাবই ত্রৈলোক্যনাথের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হয়—আর এক অন্তরায় ছিল ম্যালেরিয়া জ্বর। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানভূম-পুরুলিয়ায় একজন আত্মীয়ের বাড়ী যাত্রা করেন। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে যাওয়ার পর পয়সা ফুরিয়ে গেল। নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি মানভূমে এলেন। সেখানে শেষবারের মতো ইস্কুলে ভর্তি হলেন। ছোটনাগপুরের কমিশনারের আদেশে রাঁচীর মেলা দেখার জন্য যাত্রা করলেন। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বলেছেন :

"২।৪ দিনের মধ্যে বালকদের আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম ; সকলকে অসমসাহসিক কাজে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, মার কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে নির্জন গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম।"

ছোটবেলা থেকেই যে তিনি কেমন দুঃসাহসিক ও ডানপিটে ছিলেন, এই সামান্য একটি ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাঁচি থেকে পালিয়ে যারা নাগপুর অঞ্চলের বন্য প্রদেশে হাতি ধরতে যায়, তাদের সঙ্গে জুটেছিলেন। কিন্তু এই দুঃসাহসিক ও অস্থির জীবনের মধ্যে একটি লাভ হলো। একজন মৌলভীর কাছে তিনি ফার্সি শিখলেন। এরপরে শুরু হলো অস্থায়ী চাকরীর পর্যায়। ইছাপুর-যশোহর-কোটচাঁদপুরের অস্থায়ী চাকরীর পালা চললো। আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টাতেও চাকরীর বিশেষ সুবিধা হলো না। অনাহারে রামপুরহাট থেকে পদব্রজে শিউড়ী আসার বিবরণ দিতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন :

"অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে শুভকার্য হইয়াছে—ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয়

দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমার মিষ্ট লাগিল।"

দিদিমার অসুখ সংবাদ শুনে বর্ধমান থেকে ত্রৈলোক্যনাথ আর একবার বাড়ীর দিকে চললেন। তিনি বলেছেন :

"সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পহুঁছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি ত কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথ চলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুল পাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন,—আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন সাজাদপুর গ্রামে স্কুলমাষ্টারির কাজ পেলেন। এখানে জলবেষ্টিত মাটির ঢিপিতে তিনজন অশীতিপর বৃদ্ধার কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। পদ্মার ঝড়ে তাঁর একবার জীবন সংশয় হয়েছিল—এ কাহিনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। গ্রাম্য চণ্ডালদের কৃপায় সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন। এই অভিজ্ঞতা তিনি একাধিক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পেই এই ঝড়ের বিবরণ (চতুর্থ অধ্যায় : তুমুল ঝড়) বিস্তৃততরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আত্মীয় হরকালীবাবু ছিলেন কটকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। চিড়া, নুন, লঙ্কা খেয়ে মহানদী সাঁতার দিয়ে তিনি কটকে পৌছেছিলেন। এই সময় থেকেই তাঁর ভাগ্যোদয়ের সূচনা। তিনি এখানে পুলিশের সাব্-ইন্সপেক্টারের কাজ পেলেন ও ওড়িয়া ভাষা শিখে 'উৎকল শুভকরী' পত্রিকার সম্পাদক হলেন।

উড়িষ্যায় থাকার সময়েই হাণ্টার সাহেবের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

হান্টার ও বক্‌—এই দুজন সদাশয় ইংরেজের কৃপায় ত্রৈলোক্যনাথ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র জীবনকাহিনীর সঙ্গে আরও দুএকটি প্রসঙ্গ মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়া ইস্কুলের যখন দ্বিতীয় শিক্ষক (১৮৬৬—১৮৬৭) তখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাঁর বেতন তখন ১৮৲ টাকা। ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন ঃ

"অস্থিচর্মসার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় নরনারী—বালক-বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেখানেই মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়ার দুর্গন্ধে পথ চলা ভার হইল! বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম।…এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের দুঃখ-মোচনে চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারত ভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে. এইরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব।"

উত্তরকালে তিনি যখন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখনো তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন নি। ১৮৭৭—৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে গাজোরের চাষ করে সে বছর নরনারীরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। রাজস্ব বিভাগে তিনি যখন কাজ করতেন, তখন ভারতীয় শিল্পদ্রব্য যাতে বিদেশে বিক্রয় হয়, তার চেষ্টা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের জীবনকাহিনী থেকে দুটি বিষয় জানা যায় ঃ তাঁর দুঃখকষ্টপূর্ণ বিচিত্র ও দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত, তাঁর সমবেদনাবৃত্তি ও আদর্শবাদ। চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও অদম্য মনোবল তাঁকে রক্ষাকবচের মতো ঘিরে রেখেছিল। একদিকে গভীর সমবেদনা ও মনুষ্যত্ববোধ, অপরদিকে দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক জীবনের উপকরণ। তিনি তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা করেন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেই তিনি লেখনী ধারণ করেন। রচনার মধ্যে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনাদর্শের নানা কাহিনীই রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর রচনার সঙ্গে জীবনীকে মিলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথ ও তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব একই শিল্পীর রচনা।

৩

ত্রৈলোক্যনাথের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা যদি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র মূলধন হতো, তা হলে তাঁর রচিত সাহিত্য কি রূপ ধারণ করত তা বলা যায় না! তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মনুষ্যত্ববোধ, স্বজাতিপ্রীতি ও গভীর সহানুভূতি ছাড়া তাঁর এই বিশেষ ধরণের সাহিত্য-প্রকৃতি গড়ে উঠতে পারত না। তাঁর উদ্দাম কল্পনা ও খেয়াল-বিলাস যে তাঁকে কতকগুলি আজগুবি গল্পের কথক হিসেবেই চিহ্নিত করেনি, তার প্রধান কারণ হলো এ সবের পিছনে তাঁর জীবনের একটি বিশেষ 'ফিলজফি' ছিল। তাই তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে রূপকথা ও আজগুবি গল্পকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর খোশগল্পগুলির পিছনে যে সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মন ও কৌতুকরসোজ্জ্বল জীবন-সমালোচনা আছে, তাই তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ও স্থায়ী আসন দিয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনা। সে যুগে ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী'র লেখক হিসেবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা, এ বিষয়ে মতানৈক্যের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তাকে উপলব্ধি করতে গেলে এই অভিনব উপকথাটি অপরিহার্য। 'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক রচনা।—শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের অভিনবত্ব, এমন কি দোষ-ত্রুটিগুলিও এই রচনাটি থেকে যেমনভাবে উপলব্ধি করা যায়, তেমন তাঁর অন্য কোনো রচনায় যায় না।

'কঙ্কাবতী' কোন্ শ্রেণীর কাহিনী? এই কাহিনীর প্রথম ভাগ (সমগ্র উপন্যাসের এক তৃতীয়াংশ) কুসুমঘাটী গ্রামের পটভূমিকায় রচিত একটি সামাজিক আখ্যায়িকা। দ্বিতীয় ভাগ রোগাক্রান্ত কঙ্কাবতীর বিচিত্র স্বপ্ন-কাহিনী। প্রথম ভাগকে উপন্যাস বললে অন্যায় হবে না। সে যুগের সামাজিক জীবনের একটি রসোজ্জ্বল চিত্রও সেখানে পাওয়া যায়। অর্থপিশাচ তনু রায়, কুটচক্রী বৃদ্ধ জমিদার জনার্দন চৌধুরী ও তাঁর সভাপণ্ডিত গোবর্ধন শিরোমণি, হিন্দুধর্মসংরক্ষক মদ্যপ ষাঁড়েশ্বর, সহৃদয় সুপণ্ডিত নিরঞ্জন কবিরত্ন, পরোপকারী রামহরি প্রভৃতি চরিত্র তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের অপরিহার্য অঙ্গরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। জনার্দন চৌধুরীর পত্নীবিয়োগের পর কঙ্কাবতীকে বিবাহের আকাঙ্ক্ষার সূত্র ধরেই কুসুমঘাটীর সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে—কলকাতা-প্রত্যাগত খেতুও এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়েছে। খেতুকে বরফ খাওয়ার অপবাদ দিয়ে একঘরে করে গ্রাম্য সমাজ সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছে। সামাজিক জীবনের যে ছবি এখানে আঁকা হয়েছে তার অনাড়ম্বর ও সহজভঙ্গি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয় ভাগে কাহিনী সম্পূর্ণ অন্যপথে চলেছে। এই ভাগের আখ্যায়িকার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই। এই বিচিত্র আখ্যায়িকা রোগশয্যা-শায়িনী কঙ্কাবতীর স্বপ্নকাহিনী। বিচিত্র স্বপ্নকাহিনীটিকে উপকথার আজগুবি উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই জগতের মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ, বাঘ, ব্যাঙ, মশা মানুষের মতোই কথা বলতে পারে, মানুষের মতোই তাদের অনুভূতি। চাঁদের মূল শিকড়, আকাশের দুর্দান্ত সিপাই, নক্ষত্রদের বৌ প্রভৃতি কল্পনার মধ্যে লেখকের উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভূত-প্রেতের আর একটি উদ্ভট জগতও আছে—নাকেশ্বরী, নাকেশ্বরীর মাসি, নাকেশ্বরীর প্রেমিকপ্রবর ঘ্যাঁঘো ভুত প্রভৃতি একঠেঙো মুল্লুকের অধিবাসী ও অধিবাসিনীবৃন্দ এই স্বপ্নকাহিনীকে জমিয়ে তুলেছে। এই জগতের মধ্যে মানব-মানবীর চরিত্রও একেবারে অনুপস্থিত নয়। বৃদ্ধ দর্জী ও তরুণ দর্জী, তিনহাত দীর্ঘ খর্বুর মহারাজ ও তার সাত হাত দীর্ঘ কলহপরায়ণা স্ত্রী, খেতু ও কঙ্কাবতী, এই উদ্ভট উপকথা জগতের

মানব অধিবাসী। কিন্তু এখানকার মানব অধিবাসীরাও ঠিক যেন মর্ত্যবাসী নয়—তারাও লঘু ও বায়বীয়, এ বিষয়ে তারা ভূতপেত্নীদেরই সমগোত্রীয়।

আবার এর বিপরীতটিও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ইতর প্রাণী ও ভূত-প্রেত মানবীয় অনুভূতিসম্পন্ন। এখানে মানুষের জগতের মতো মাছের জগতেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভোটাভোটি হয়, মশা জগতের মধ্যেও সপত্নী-কলহ উগ্রমূর্তি ধারণ করে, ভূতের জগতেও প্রতিবেশী ভূতেরা বিবাহে ভাঙচি দেয়, ভূতেরও ঘুষ-ঘুষে জ্বর ও কাশির সঙ্গে আলকাতরার ছিট থাকে, সাহেবী পোশাক পরে ব্যাঙ্‌ও অহঙ্কারে ফুলে ওঠে। মোট কথা মানুষের জগতে যে-যে ঘটনা ঘটে ও যে-যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, এই অলৌকিক স্বপ্ন জগতের মনুষ্যেতর সমাজেও ঠিক সেই সেই ঘটনাই ঘটে! ইতর প্রাণী ও ভৌতিক জগতের সঙ্গে মনুষ্য-জগতের যে ব্যবধান স্বীকৃত হয়ে এসেছে, তা উৎকটরূপে লঙ্ঘিত হয়েছে। আজগুবি জগৎ ও মনুষ্য-জগতের সীমারেখা পর্যন্তও এখান থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এখানকার লঘু ও বায়বীয় জগতে কারো পা-ই যেন মাটিতে পড়ে না—তাই তাদের গতি বাতাসের মতোই দ্রুত। কাহিনীর উপসংহারে স্বপ্নের তরণী ভিড়েছে বাস্তবের বন্দরে। খেতু-কঙ্কাবতীর মধুর মিলনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'কঙ্কাবতী' কাহিনীর বিন্যাসে এত বিচিত্র উপাদান আছে যে, তাকে সাহিত্যের বিশেষ কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কঙ্কাবতী নামটি বাংলাদেশে অপরিচিত নয়, উপকথা ও জনশ্রুতির দীর্ঘপথ ধরে এই নামটি ও তার নানা কাহিনী আজো বেঁচে আছে। ত্রৈলোক্যনাথও তাঁর কাহিনীর প্রারম্ভেই সেই উপকথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: "কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলা কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।" কিন্তু কাহিনীর প্রথম ভাগ উপকথা নয়, সামাজিক উপন্যাস। দ্বিতীয় ভাগ উপকথা-মিশ্র আজগুবি কাহিনী। কঙ্কাবতীর জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভট স্বপ্নকাহিনী এর একমাত্র যোগসূত্র—মাছের দেশ থেকে ফিরে এসে ব্যাঘ্ররূপী খেতুর সঙ্গে বিবাহ পর্যন্ত কুসুমঘাটীর সঙ্গে ক্ষীণ যোগসূত্র। কিন্তু সে জগতেও বাস্তবের কঠিন মাটি নেই—স্বপ্নচালিত বায়বীয় জগৎ। সুতরাং এ অবস্থায় অবিমিশ্র

উপন্যাস বা উপকথা—কোনো নামেই গ্রন্থটিকে অভিহিত করা যায় না। 'উপকথার উপন্যাস' নামটি কতকটা চলনসই। অন্য নামের অভাবে এ নামটি দিলে খুব অসঙ্গত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী' গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত অ্যালিসের রূপকথাটির কথা উল্লেখ করেছেন : "এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে 'অ্যালিস ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এইরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।" অ্যালিস-কাহিনীর সঙ্গে কঙ্কাবতী-কাহিনীর যে পার্থক্যের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, তাতে শেষোক্ত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। 'অ্যালিসের' সঙ্গে 'কঙ্কাবতী'র মিল খানিকটা বহিরঙ্গের, কিন্তু দুটি গ্রহের স্বরূপধর্ম এতোই বিভিন্ন যে তুলনা না করাই বোধ হয় সঙ্গত। অ্যালিসের কাহিনী অবিমিশ্র রূপকথা। 'কঙ্কাবতী'তে বাস্তব ও অবাস্তবের যে নিকট সংঘর্ষ আছে, ইংরেজী রূপকথাটিতে তা থাকা সম্ভব নয়। অ্যালিস ও কঙ্কাবতী দুজনেই স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু অ্যালিসের স্বপ্ন অসংলগ্ন, অপরপক্ষে কঙ্কাবতীর স্বপ্নে গল্পাংশটির ধারাবাহিক সূত্র আছে। তা ছাড়া 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগ রীতিমতো বাস্তব। অ্যালিসের স্বপ্নকাহিনীকে শিশুরা দীর্ঘকালব্যাপী পরমাগ্রহের সঙ্গে আস্বাদন করেছে। কিন্তু 'কঙ্কাবতী' কোনোদিনই শিশু-পাঠ্য গ্রন্থের মর্যাদা পায় নি। কারণ এই গ্রন্থে শিশুপাঠ্য উপাদান থাকলেও বয়স্কপাঠ্য উপাদান আছে তার চেয়েও বেশী। কঙ্কাবতী-কাহিনীর একটি অংশে বাস্তবের যে কঠিন বেষ্টনী আছে, অ্যালিস কাহিনীতে তা অনুপস্থিত।

৪

রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী'র বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ করেছেন : "উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের

উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরী কঙ্কাবতীকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন, এদিকে অসুখে কঙ্কাবতী যায় যায়। অন্যদিকে খেতুর বরফ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কুসুমঘাটীর সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পাঠকচিত্ত যখন রুদ্ধশ্বাসে কাহিনীর পরিণাম দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তখনি এক অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশের জন্য আকস্মিকভাবে তৈরী হতে হয়। মনকে এত দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাস্তব উপন্যাস ও অবাস্তব উপকথা—এ দুই জগতের মধ্যে ব্যবধান কি এতই দুস্তর? কোথাও কি এই দুই আপাত বিরোধী জগৎ এক হয়ে ওঠেনি? 'কঙ্কাবতী'র বহিরঙ্গ যাই হোক না কেন, আসলে একটি প্রচ্ছন্ন সামাজিক ব্যঙ্গই নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপন্যাস অংশে সামাজিক ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট—কোনো আবরণের প্রয়োজন হয়নি। জনার্দন চৌধুরী, গোবর্ধন শিরোমণি, তনু রায়, ষাঁড়েশ্বর প্রভৃতি চরিত্র ব্যঙ্গের তুলিতেই আঁকা হয়েছে। তনু রায় ত্রিসন্ধ্যা করেন, দেবদ্বিজকে ভক্তি করেন, কিন্তু তাঁর অর্থলোলুপতা এত বেশী যে নিজের মেয়ে বিক্রয় করে টাকা রোজগার করতে কোনো দ্বিধা নেই। এ সম্পর্কে তনু রায় নিজের সুবিধা অনুযায়ী চমৎকার দর্শন তৈরী করেছেন:

"তনু রায়ের জামাতা দুটির বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলে মানুষ বরকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা একশত কি দুইশত টাকায় কাজ সারিতে চায়। তাই, একটু বয়স্কপাত্র দেখিয়া কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়াছিলেন একজনের বয়স হইয়াছিল সত্তর, আর একজনের পঁচাত্তর।"

বলাবাহুল্য, তনু রায়ের সুবিধাবাদী শাস্ত্রতত্ত্বকে লেখক শ্লেষাত্মক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। কলকাতায় ষাঁড়েশ্বরের জীবনযাত্রা, গদাধর ঘোষের

জবানবন্দী, বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরী ও নরপিশাচ গোবর্ধন শিরোমণির কাহিনী রঙ্গ-ব্যঙ্গের অগ্নিরেখায় আঁকা হয়েছে। হিন্দু সমাজের যাঁরা পুরোধা হিসেবে গর্ব অনুভব করেন, বাইরে ত্রিসন্ধ্যা পালন করেন, হিন্দুসংরক্ষণী সভার অধিনায়কত্ব করেন তাঁরা যে আসলে কতবড়ো কাপুরুষ ও হীনচিত্ত, 'কঙ্কাবতী' প্রথম ভাগে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গ শিল্পী আঘাত করে ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেন। ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ-শ্লেষের কশাঘাতে ও রঙ্গকৌতুকের অব্যর্থ শরক্ষেপে সেই ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

ব্যঙ্গ-শিল্পীর আর এক অব্যর্থ হাতিয়ার হলো রূপক। পৃথিবীর খ্যাতনামা শিল্পীরা রূপকের মখমলের আবরণে ব্যঙ্গের শাণিত ছুরি আবৃত করেন। বিকৃত মস্তিষ্ক শীর্ণকায় প্রৌঢ় ডনকুইক্সোট্ ও খর্বাকৃতি পৃথুলোদের সাঁকো পাঞ্জাকে নিয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গশিল্পী নাইটদের রোমাণ্টিক শিভাল্রিকে ব্যঙ্গ করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-মহাকাব্যটি রূপকের সুচতুর কৌশলে রচিত হয়েছে। সুইফ্টের গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত কিম্বা আনাতোল ফ্রাঁসের 'পেঙ্গুয়িন আয়ল্যাণ্ড' জাতীয় ক্লাসিকেও রূপকের আবরণে ব্যঙ্গরস পরিবেষণ করা হয়েছে। কঙ্কাবতীর উপকথাটিও মনুষ্য জগতের রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ-পশু-মশা-ভূত প্রভৃতির রূপকে মানুষের চরিত্রই নানারূপে দেখা দিয়াছে। স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং-র পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী স্কল বলেছেন ঃ

"আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাখিয়াছি, 'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজি-নাম রাখিয়াছি, কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম 'খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানি,' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলেই মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাও না? যে যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, 'লংম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া, শতসহস্রবার ঠকিয়া দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রুজ পিংক্রুজ

দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতি সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদপুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যই করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানির নাম দিয়াছি—'স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং'।"

ভূত-কোম্পানির ইংরেজি নামকরণের জবাবদিহির মধ্যে সে যুগের দেশী লোকের মনোভাবই কৌতুকদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাহেবদের মুখে ঝাল খাওয়াই ছিল তখনকার বাঙালী জীবনের মূলনীতি। সাহেবদের সামান্য কথাও বেদবাক্য হিসেবে গৃহীত হতো—দেশী লোকের কথা কেউ বিশ্বাস করত না। তাই বাঙালী কোনো কোম্পানি বা দোকান খুললেও তার ইংরেজী নাম দিতেন। স্কল ও স্কেলিটন যে আসলে সে যুগের শিক্ষিত ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। এইভাবেই ত্রৈলোক্যনাথ রূপকের আবরণে সমকালীন সমাজের অসঙ্গত আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ করেছেন।

ঘ্যাঘোঁ ভূতের সঙ্গে যখন নাকেশ্বরী ভূতনীর বিয়ের কথা হয়, তখন প্রতিবেশী ভূতদের ভাঙ্‌চি দেওয়ার কাহিনীটি অত্যন্ত কৌতুককর। কিন্তু বিশুদ্ধ কৌতুকের অন্তরালে একটি তীক্ষ্ণ সামাজিক বিদ্রূপও আছে। ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের এইরকম হীন আচরণ মনুষ্য-সমাজের প্রাত্যহিক ব্যাপারের অন্তর্গত। ত্রৈলোক্যনাথ প্রেতলোকের কাহিনী অবতারণা করে চমৎকারভাবে মনুষ্য-প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিয়েছেন। নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখার জন্য একজন ভূতকে ঘ্যাঘোঁর কাছে পাঠালেন। ঘ্যাঘোও তাকে অত্যন্ত সমাদর করে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আগন্তুক ভূত পাশের বিলে স্নান করতে গেলেন। প্রতিবেশী ভূতরাও তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে সেখানে গেলেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন ঃ

"তাঁহাদের মধ্যে একজন; আগন্তুক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়ের নিবাস?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমার নিবাস এক-ঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে, বৌ-ভুলুনি নামক আঁব গাছে। ঘ্যাঘোর প্রতিবেশী

ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখানে কি মনে করিয়া আগমন হইয়াছে?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘ্যাঁঘোঁকে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবেশী ভূতগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়, তবে কি বৈদ্য?' আগন্তুক ভূত বলিলেন,—'কেন? বৈদ্য কেন হইব? ঘ্যাঁঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না কি?' প্রতিবেশী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—'না না! এমন কিছুই নয়! তবে একটু একটু খুক্ খুক্ করিয়া কাশি আছে, তাহার সহিত অল্প অল্প আল্‌কাতরার ছিট্ থাকে, আর বৈকালবেলা যৎসামান্য ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়! তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে-খাইতে ভাল হইয়া যাইবে।' এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ভূতের তো চক্ষু-স্থির!…নাকেশ্বরীর মাসীকে সকল কথা বলিলেন। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল।"

ব্যাঙ্‌সাহেবও ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র। বাঙালীর চরিত্রের পরানুকরণস্পৃহা সেকালের যুগসত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। একবার এক হাতী ব্যাঙ্‌কে ডিঙিয়ে 'থ্যাবড়া-নাকী' বলে গালাগালি দিয়েছিল। ব্যাঙ্ অপমানিত হয়ে পরদিন থেকেই সাহেবী পোশাক-পরিচ্ছদ পরে মিস্টার গমিশে রূপান্তরিত হলো। ব্যাঙ্‌সাহেবের যুক্তির মধ্যে সামাজিক ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ স্বর অনুপস্থিত নয়ঃ

"শুনিলে তো এখন? হাতির একবার আস্পর্দ্ধার কথা। তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেইজন্য এই সাহেবের পোশাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়ীতে অন্যলোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে, আর বলিবে, 'ও গাড়ীতে সাহেব রহিয়াছে!"

মশাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং খর্বুরের বিচিত্র দাম্পত্য কলহ কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে। আসল কথা, 'কঙ্কাবতী' আপাত-দৃষ্টিতে আজগুবি কাহিনী হলেও এর মধ্যে একটি তীক্ষ্ণ সামাজিক ব্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের চিরসহচর রূপক। তাই বাস্তব ও অবাস্তব

জগতের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক না কেন, ব্যঙ্গশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের রঙ্গ-ব্যঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রবাহিত। এই প্রবাহই কুসুমঘাটী ও একঠেঙো মুল্লুকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

৫

কল্পনার উদ্দামতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ত্রৈলোক্যনাথের কাহিনীকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। 'কঙ্কাবতী' আখ্যায়িকায় কথাশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই পরীক্ষিত হয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, রূপক-রূপকথা, আজগুবি কাহিনী ও উদ্ভট চরিত্রগুলি মিলে এখানে একপ্রকার নূতন রস সৃষ্টি করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের পরবর্তী গল্প ও উপন্যাসগুলি ঐ একই উৎস-মুখ থেকে উৎসারিত হয়েছে।

'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১), 'ময়না কোথায়!' (১৯০৪) ও 'পাপের পরিণাম' (১৯০৮)—এই তিনটি গ্রন্থকে উপন্যাস বলা যায়। উপন্যাস তিনখানিতে গল্পরসের প্রাচুর্য ও প্লটরচনার সুকৌশল লক্ষণীয়। ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস অন্তর্মুখী নয়, মনস্তত্ত্ব ও অন্তর্জীবন চিত্রণ এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু প্লটরচনার মনোহারিত্ব ও গল্পরসের উদ্দামগতি উপন্যাস তিনটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। উনিশশতকীয় বাংলা উপন্যাসে বহিরাশ্রয়ী ঘটনা ও বর্ণময় প্লট প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। ত্রৈলোক্যনাথও কথাশিল্পী হিসেবে এই যুগেরই প্রতিনিধি। তাই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে বাইরের ঘটনার দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে। ঘটনার ঘোর-প্যাঁচ, রোমাঞ্চকর পরিবেশ ও শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সে যুগের অন্যান্য লেখকদের মতো ত্রৈলোক্যনাথও একই পথ ধরেছেন। 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাসের কাহিনী বিচিত্র। কাশীর আখ্যায়িকা রহস্যাবৃত—হীরালাল ও কুসীর জীবনযাত্রা পাঠকচিত্তের কৌতূহলকে তীব্র করে তোলে। হীরালালের অজ্ঞাতবাসের বিবরণে যে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি ও রোমাঞ্চকর ঘটনার পরে নায়ক নায়িকার মিলন হলো।

'ফোকলা দিগম্বর' কোনো বড়ো সৃষ্টি নয়। ফোকলা দিগম্বর নামটির সঙ্গে উপন্যাসের তেমন যোগসূত্র নেই। কাহিনীর শেষদিকে দিগম্বর দিগম্বরীর আখ্যায়িকা যুক্ত হয়ে হাস্যরসের অনাবিল উৎসকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অবশ্য কাহিনীর এই অংশ না থাকলে গল্পের পরিণাম নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত হতো। ব্যর্থমনোরথ দিগম্বর, সম্মার্জনী হস্তে দিগম্বরী ও তাঁদের অনুচর অনুচরীরা যে কৌতুককর শোভাযাত্রার সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ণনা ত্রৈলোক্য-নাথেরই উপযুক্ত :

"এক্কা যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম যে তাঁহারা সেই বরযাত্রীদল। সেই দলের আগে আগে বিরসবদনে সভয় মনে দিগম্বর বাবু চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, বেশ আলু-থালু হইয়াছে, আঁকা-বাঁকা পা ফেলিতে ফেলিতে হেলিতে-দুলিতে হ্যালাপাগলার মত তিনি চলিয়াছেন। তাঁহার ঠিক পশ্চাতে একধারে বিন্দী ও অন্যধারে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী। বিন্দীর হাতে একটি ছাতি, দিগম্বরীর হাতে একগাছি ঝাঁটা। ঝাঁটাগাছটি তিনি বোধ হয় সঙ্গে করে আনেন নাই, রসময় বাবুর বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। লোকে ঠিক যেমন মহিষকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, বিন্দী ও তিনি সেইরূপ দিগম্বর বাবুকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন।··· বরযাত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ উলু দিতেছিলেন, কেহ কেহ পোঁ পোঁ করিয়া মুখে শঙ্খ বাজাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা ইংরাজী ধরণের 'হিপ্ হিপ্ হুরে! হিপ্ হিপ্ হুরে!' জয়ধ্বনি করিতেছিলেন।"

তবু 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাস পরিকল্পনায় তেমন কোনো মৌলিকতা নেই। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-র পরে বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা লাভের বিড়ম্বনা-কাহিনীকে নিয়ে সে যুগে অনেকেই নাটক-নক্শা লিখেছিলেন। সুতরাং ত্রৈলোক্যনাথের বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা এমন কিছু নূতন নয়। অবশ্য তাঁর লেখার নিজস্ব রীতি যে অভিনব আস্বাদন সঞ্চারিত করেছে, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

যতবড়ো ব্যঙ্গশিল্পীই হোন না কেন, ব্যঙ্গের পিছনে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। মোলিয়ের, সুইফ্ট, ভল্টেয়ার, শ' প্রমুখ বিশ্রুতকীর্তি ব্যঙ্গরসিকরাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই লেখনী ধারণ করেছিলেন। জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে

অসঙ্গতি ও আতিশয্যকে তাঁরা ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্য উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে উচ্চতর শিল্পে পরিণত হয়। মোলিয়ের তৎকালীন সমাজের ভণ্ডামি ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের কালকে অতিক্রম করে তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ সর্বদেশ ও সর্বকালের মর্মমূলে প্রবেশ করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ও মাসিক 'জন্মভূমি' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুসমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল। 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল : "সংবাদপত্রে লোকের অর্ধশিক্ষা হয়, মাসিকপত্রে সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। হিন্দুর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এই কামনা অন্তরে রাখিয়া, আমরা মাসিকপত্র প্রকাশার্থ প্রথম কল্পনা করি,..." বলাবাহুল্য সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য পত্র পত্রিকার লেখকদেরও প্রভাবিত করেছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ 'বঙ্গবাসী'-গোষ্ঠীর ব্যঙ্গ-লেখকেরা অল্পবিস্তর এই ভাবাদর্শের দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। একমাত্র 'ময়না কোথায়!' উপন্যাস ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথের অন্য কোনো রচনায় উদ্দেশ্যের তীব্রতা শিল্পধর্মকে ব্যাহত করতে পারেনি।

'ময়না কোথায়!' (১৯০৪) উপন্যাসটি ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে উপেক্ষিত রচনা। দুখণ্ডে বিভক্ত বসুমতী-সংস্করণের ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলী থেকে উপন্যাসটি বাদ পড়েছে। পরবর্তীকালে যাঁরা ত্রৈলোক্যনাথের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, উপন্যাসটির প্রতি তাঁদের দৃষ্টিও পড়েনি। 'ময়না কোথায়!' নিঃসন্দেহে ত্রৈলোক্যনাথের দুর্বলতম রচনা। নিপুণ ব্যঙ্গশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ এখানে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করতে পারেননি। এই রস যে কতখানি ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই ভারসাম্যের অভাব হলে যে শক্তিশালী শিল্পীও কতদূর পথভ্রষ্ট হতে পারেন, 'ময়না কোথায়!' উপন্যাসটি তারই একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি উদ্দেশ্যসর্বস্ব ও নীতিপ্রধান। প্রচারধর্মিতার খরতাপে রঙ্গ-ব্যঙ্গের রস শুকিয়ে গিয়েছে। প্রচার ও ব্যঙ্গ—এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেননি। চরিত্রগুলি কলের পুতুল, সংলাপ কতকগুলি

প্রচারধর্মী দীর্ঘ নীতিমূলক বক্তৃতা! যাদব মুস্তফি ও নরোত্তম মাশ্চটক্ —একজন ষোল আনা ভালো, একজন ষোল আনা মন্দ; অর্থাৎ একজন সাদা পুতুল আর একজন কালো পুতুল। যাদবের চরিত্রে কলঙ্কের লেশমাত্র নেই, নরোত্তমের চরিত্রে শুধুই কলঙ্ক। ফলে দুটি চরিত্রই রক্তমাংসবর্জিত। অন্যান্য চরিত্রও হয় যাদবের ছাঁচে, না হয় নরোত্তমের ছাঁচে রচিত।

উপন্যাসটি যত এগিয়েছে ততই উদ্দেশ্য উগ্র হয়ে উঠেছে। শেষের ছটি অধ্যায় (ষোড়শ থেকে একবিংশ) পাঠকচিত্তকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করেছে। মৃত্যুশয্যাশায়িনী প্রভাবতীর স্বপ্নকাহিনী-বর্ণনা উপন্যাসের একটি বিরাট অংশ অনাবশ্যকভাবে জুড়ে আছে। নৌকাডুবির সময় 'বিদ্যুৎবরণী দেবকন্যা'র আকস্মিক আবির্ভাব অবাস্তব ও অসঙ্গত। একবিংশ অধ্যায়ে পাপের পরিণাম দেখানোর জন্যই লেখক নানারকম কসরৎ করেছেন, কিন্তু এতে দুর্বলতাই স্পষ্টতর হয়েছে। উপন্যাসটির ফ্রেম কঠিন বাস্তবের—দুইবন্ধুর বিপরীত জীবনাচরণের কাহিনী। বিদ্যুৎবরণী কন্যার আবির্ভাব ও মুমূর্ষু পাপীর ঘরে প্রেত-পিশাচের নৃত্যের জন্য কাহিনীটি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। পাপের জয় ও পুণ্যের পরাজয় দেখাতে গিয়ে লেখককে বাইরে থেকে এইসমস্ত অবাস্তব ও অপ্রাসঙ্গিক উপাদান আনতে হয়েছে। 'ময়না কোথায়!' নামের সঙ্গে উপন্যাসের কোন গূঢ় সম্পর্ক নেই। একটি অধ্যায়ের একটি অপ্রধান প্রসঙ্গকে নরোত্তমের বিকারগ্রস্ত মনের প্রলাপের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে সস্তা চমক সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, 'কঙ্কাবতী'তেও তো উদ্ভট ও অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি? 'কঙ্কাবতী' ও 'ময়না কোথায়!' একজাতীয় রচনা নয়। একটি বালিকার স্বপ্নকাহিনী অবলম্বন করে 'কঙ্কাবতী' কাহিনীর দ্বিতীয় অংশটি রচিত হয়েছে—এই স্বপ্নকাহিনীটি রূপকথার ছাঁচে তৈরী হয়েছে। তাই এই জগতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তাদের উদ্ভট বলে মনে হলেও ঠিক অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। এই জগতের মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রঙ্গ-কৌতুক যতটুকু আছে তাতে প্রচারধর্মিতা উগ্র হয়ে শিল্পকে দুর্বল করতে পারেনি। কৌতুক ও করুণার রৌদ্র-ছায়ায় 'কঙ্কাবতী' কাহিনীটি অপরূপ হয়ে উঠেছে—উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, গল্পরসকে কোথায়ও তা অতিক্রম করেনি। অপর

পক্ষে 'ময়না কোথায়!' উপন্যাসে শুষ্ক নীতিকথার কঠিন মাটিতে স্বপ্নের ফুল ফুটতে পারেনি, রূপকের আবরণে প্রচারের উগ্রতাকে মণ্ডিত করাও সম্ভব হয়নি। তিনি এখানে নিজের পথ ছেড়ে সম্ভবত 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রচারধর্মী উপন্যাসগুলির পথ অনুসরণ করেছেন।

'পাপের পরিণাম' (১৯০৮) গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্যও নীতি প্রচার। স্ত্রীর পরামর্শে ভাইকে সম্পত্তি থেকে ফাঁকি দেওয়ার পরিণাম যে কত বিষময় তাই এ গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে। রায় মহাশয়ের পক্ষাঘাতরোগে ও রায়গৃহিণীর ক্ষয়কাশে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে। অপর পক্ষে, ছোট ভাই সৎপথে থেকে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছে। চরিত্রভ্রষ্টতার জন্য ধাঁদা ভূত 'কালো বাবা' ও সোনা-বৌয়ের পরিণতি হয়েছে আরও মারাত্মক। কিন্তু প্রচারধর্মিতা উপন্যাসটির সরসতাকে নষ্ট করতে পারেনি। এই দীর্ঘ উপন্যাসটির প্লট রহস্য-জটিল ও চিত্তাকর্ষক। আকস্মিকতা ও অতিনাটকীয়তা কাহিনীটিকে রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসের ত্রুটিবিচ্যুতি এখানে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। তবু গল্পরসের সাবলীলতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ জাগিয়ে রাখে। স্রোত-চঞ্চল নদীতে যেমন আবর্জনা জমতে পারে না, তেমনি কাহিনীটির উদ্দাম প্রবাহে নীতির বোঝা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গিয়েছে।

৬

ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিভা উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। ছোটগল্পকে তাঁর প্রতিভার যথার্থ বাহন বলা যায়। 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মুক্তা-মালা' (১৯০২), 'মজার গল্প' (১৯০৬) ও 'ডমরু-চরিত' (১৯২৩)—গ্রন্থচতুষ্টয় আসলে গল্প-সঙ্কলন। মোপাসাঁ, চেকভ বা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়ে ছোটগল্প সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে, ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পে তার কোনো লক্ষণই মিলবে না। মোপাসাঁর গল্পের খরদীপ্ত নির্মম 'আয়রনি', 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের' নাটকীয় চাতুর্য, অতর্কিত ও আকস্মিক পরিসমাপ্তির চকিত দীপ্তি ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে অনুপস্থিত।

চেকভের গল্পের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও স্বল্পসংক্ষিপ্ত মুহূর্তের অতলান্ত গভীরতাও ত্রৈলোক্যনাথের কোনো গল্পে নেই। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি তুলনায় অনেকখানি ঢিলেঢালা—ছোটগল্পের কেন্দ্রসংহতি ও বাক্‌সংযম এখানে নেই বললেই চলে। আসল কথা, আধুনিক ছোটগল্পের 'টেক্‌নিক' ও স্বরূপধর্ম এখানে পাওয়া যাবে না।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পরচনার কলাকৌশল তাঁর নিজস্ব। বাংলা সাহিত্যে এই কলাকৌশলের দোসর আগেও ছিল না এখনো নেই। গল্পরস পরিবেষণে ও প্লটসাজানোর কৌশলে তাঁর সমকক্ষ গল্পকার বাংলাসাহিত্যে আর নেই। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি এই যুগের লেখক হয়েও গল্প বলার আদিম রীতিটি অনায়াসে আয়ত্ত করেছিলেন। একালের গল্প যখন ভূমিষ্ঠ হয় নি, তখনো গল্প শোনার আদিম পিপাসা ও গল্প বলার নেশা ছিল। তখন ছাপাখানার সৃষ্টিও হয়নি। ঠাকুরমার মুখে শোনা সম্ভব-অসম্ভব কাহিনীর কথারস চিরন্তন শিশুচিত্তকে অধিকার করত। চণ্ডীমণ্ডপের আসর যখন তামাক বা গাঁজার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠত, তখন গ্রামের নিষ্কর্মা আড্ডাবাজেরা গল্পের পর গল্পের জাল বুনে চলতেন। এ গল্পের প্রবাহ অন্তহীন। ত্রৈলোক্যনাথ মনোধর্মের দিক থেকে এই সমস্ত গল্পরসিক বাঙালী কথকদেরই উত্তরসূরী। 'ঠাকুরমার ঝুলি' জাতীয় গ্রন্থের বহুকাল প্রচলিত মৌখিক গল্পগুলিকেই একটু মার্জিত করা হয়েছে মাত্র।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির সঙ্গে গল্পবিবৃতির আদিম রীতির একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। তিনি আধুনিক যুগের গল্পকারদের মতো 'Direct Method' ব্যবহার করেননি। এই পদ্ধতিতে গল্পলেখকেরই কণ্ঠস্বর শোনা যায়। গল্পলেখক এখানে সর্বজ্ঞ। একটি চরিত্রের জবানিতে গল্প বলার রীতিও প্রচলিত আছে—কথক এখানে গল্পটির অন্যতম চরিত্র। কিন্তু গল্পলেখার আর একটি পদ্ধতিও আছে। এখানেও উত্তমপুরুষেই গল্প বলা হয়। কিন্তু গল্পের সঙ্গে এই 'আমি'র সংযোগ নিবিড় নয়—তিনি এর অন্যতম চরিত্র হতে পারেন অথবা নাও হতে পারেন। মূল গল্পের একটি কাঠামো থাকে—সেই কাঠামোতে গল্পের সূচনা ও উপসংহার থাকে। এই কাঠামোটি হলো মখমলের আস্তরণে ঢাকা একটি সুদৃশ্য পেটিকা, এর মধ্যে যে গল্প-মালা থাকে

তা যেন একটি অতিদীর্ঘ তরলিত মুক্তাহার। মুক্তাফলগুলি এক একটি ছোটগল্প। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবার সবগুলি গল্প মিলে একটি অখণ্ড গল্প-মালিকারও সৃষ্টি করেছে। গল্পগুলি যতই ভিন্ন প্রকৃতির হোক না কেন, একটি বিশিষ্ট ভাবসূত্রে গ্রথিত। তার উপর মূল কাঠামোটি একটি আধারের কাজ করে।

গল্প রচনার এই রীতিটি সবচেয়ে প্রাচীন। 'আরব্য উপন্যাস', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি প্রাচীন যুগের বিখ্যাত গল্পসঙ্কলনগুলি এই পদ্ধতিতেই রচিত হয়েছে। একটি মূল আখ্যায়িকার কাঠামোর মধ্যে অজস্র গল্প-মালার সৃষ্টি করা হয়েছে। 'আরব্য উপন্যাস' এই রীতির খ্যাততম কথা-সঙ্কলন। প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই সুবৃহৎ গল্পসঙ্কলনটির মূল কথয়িত্রী মন্ত্রীকন্যা শাহেরজাদী। মূল কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত, গল্প-মালার শেষে একটি উপসংহারও আছে। কিন্তু মূল কাহিনীর এই ফ্রেমটির মধ্যে সুকৌশলে সংযোজিত হয়েছে অজস্র গল্প-মালার চলচ্ছবি। শাহেরজাদী গল্প বলে চলেছেন, কিন্তু সে তো গল্প নয়, বহুসূত্রে গ্রথিত গল্পগুচ্ছ। গল্পের মধ্যে গল্প, আবার তার মধ্যে গল্প—এমনি করেই বিচিত্র-শৃঙ্খলিত গল্প-মালা রচিত হয়েছে। কিন্তু মূল গল্প যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে—শুধু এক একটি প্রসঙ্গ অবতারণার সময় উদাহরণ হিসেবে গল্পের মালা গাঁথতে হয়েছে। তাই 'আরব্য উপন্যাস' মন্থরগতি ও বিলম্বিতলয়ের বিচিত্র রোমান্স! 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের আখ্যায়িকামালাও এই রীতিতেই রচিত হয়েছে। প্রধানত, প্রাচীন প্রাচ্যগল্প-সম্ভারে এই রীতিই অবলম্বিত হয়েছে—'দেকামেরন' ও 'হেপ্তামেরন' জাতীয় গল্প-মালা এই রীতিতেই রচিত।

এই রীতিই যে গল্পলেখার আদিম রীতি এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। তার আগে গল্প মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এই মৌখিক গল্পগুলি যখন লিখিত আকার ধারণ করলো তখনো গল্প বলার মৌখিক ভঙ্গিটিকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই 'আরব্য উপন্যাস'-এর ইন্দ্রজাল-ঘেরা বর্ণদীপ্ত জগতের মর্মমূলে কান পাতলে আজও অনুভব করা যায় কোন এক অদৃশ্য কথক যেন রাতের পর রাত গল্প বলে চলেছেন : রহস্যঘন রাত্রির ছায়ার

নীচে মরূদ্যানের খর্জুরকুঞ্জে যাযাবর বেদুয়িনেরা তাঁবু খাটিয়েছে—ভ্রাম্যমান কুশলী কথক 'রবি' (Rawi) অক্লান্তকণ্ঠে গল্প বলে চলেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী আরব্য উপন্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন: "আরব্যোপন্যাস এখন লিখিত আকার ধারণ করিলেও তাহার মধ্যে মূল কথনগুণ যেন ধ্বনিত। ইহা পড়িবার সময়ে মনে হয় গল্প পড়িতেছি না, অদৃশ্য কথক বলিয়া যাইতেছে, আমরা শুনিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। আরও একটি কারণে আরব্যোপন্যাসের উল্লেখ করিতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের 'টেকনিক' বস্তুত আরব্যোপন্যাসের 'টেকনিক'। এই অমর কাব্য উপন্যাসও নয়, আবার গল্পও নয়—অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খল। একটি গল্পের সহিত আর একটি গল্প গ্রন্থিযুক্ত হইয়া শ্রোতার অন্তহীন মনোযোগের শেষ সীমা পর্যন্ত চলিয়াছে।"

'মুক্তা-মালা'র 'টেক্‌নিক' সম্পর্কে 'আরব্য উপন্যাস', 'বত্রিশ-সিংহাসন' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র কথা মনে পড়ে। একটি কাঠামোর মধ্যে এখানে অনেকগুলি গল্প শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। গল্পমালার আদিকথক ঘনশ্যামবাবু, আর স্থান মহাদেববাবুর বৈঠকখানার গাঁজার আসর। এক বর্ষামুখর সন্ধ্যায় মহাদেববাবুর গাঁজার আসরে আজগুবি ও আষাঢ়ে গল্প জমে উঠেছে। পরিবেশটি আষাঢ়ে গল্পের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পরিবেশে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সহজাত গল্প বলার শক্তিকে যথেচ্ছচারী ও উদ্দাম করে তুলেছেন। 'আরব্য উপন্যাস', 'বত্রিশ-সিংহাসন' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র সংস্কার যে তাঁর উপর কি প্রবল প্রভাব বিস্তৃত করেছিল, তা এই গল্প মালার 'সূচনা' অংশ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়:

"মহাদেববাবু বলিলেন,—'সেকালের মত একালে আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে না। 'আরব্য উপন্যাস'-এর লোকে কত জিন্ দেখিতে পাইত। পঞ্চাশের উপর আমার বয়স হইয়া গেল। এ পর্যন্ত একটাও জিন্ কি পরী আমি দেখি নাই। সে জন্যে 'আরব্য উপন্যাস'-এর মত গল্পও আর একালে হয় না।'

রাঘব বলিলেন,—'একালে তেমন বাদশাও নাই, তেমন রাজাও নাই। বিক্রমাদিত্যের মত রাজা একালে থাকিলে, কত 'বত্রিশ-সিংহাসন', কত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' হইত।"

ঘনশ্যামবাবু গল্পটির মূল কথক। সুবল গড়গড়ির বাঁকুড়ার বাসায় রাত্রিতে শয়ন করার আগে তাঁর জীবনের যে বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছেন, ঘনশ্যামবাবু তা একখানি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। গড়গড়ি মহাশয়ের কাহিনীকে সাতটি সান্ধ্যবৈঠকে শোনানো হয়েছে। কালীমূর্তির গলায় মুণ্ডমালারূপী বেতালের কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র গল্প-মালার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং 'মুক্তা-মালা' তিনটি গল্পচক্রের সমষ্টি। ঘনশ্যামবাবুর গল্পটি মূলফ্রেম, সুবল গড়গড়ির গল্প মূলফ্রেমের মধ্যবর্তী অংশ ও তারও কেন্দ্রে আছে মুণ্ড-মালার কাছে কথিত গল্পগুলি। গড়গড়ি মহাশয়ের জীবনকাহিনী রচনায় ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দাম কল্পনা উদ্ভট ও অসম্ভবের রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে। গল্প বলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। অনেক গল্পই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য, কিন্তু আশ্চর্য এদের সজীবতা। পাঠকের ঔৎসুক্যে কখনো ভাটা পড়েনা। আদিম গল্প-কথকদের আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ যেন গল্প বলে চলেছেন—পাঠকেরা শ্রোতা হয়ে উঠেছেন। গল্পগুলিতে প্রাচীন প্রাচ্যকাহিনীর মন্থরতা ও বিলম্বিত ছন্দ সুপরিস্ফুট।

৭

'ভূত ও মানুষ' ত্রৈলোক্যনাথের সর্বপ্রথম গল্প-সংগ্রহ। আধুনিক গল্পের নাটকীয়তা, তীক্ষ্ণচূড় 'ক্লাইম্যাক্সে'র বিদ্যুদ্দীপ্তি, ব্যঞ্জনাধর্মী আকস্মিক পরিসমাপ্তি ত্রৈলোক্যনাথের কোনো গল্পেই নেই। আয়তনেও অধিকাংশ গল্পই দীর্ঘতর, আবার গল্পগুলিকে উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বলা যায়না। একমাত্র 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটিতে ঔপন্যাসিক রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। স্বরূপত 'বাঙ্গাল নিধিরাম' উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। নিধিরামের নৌ-যাত্রার দুঃসাহসিক বিবরণটি লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রক্ষেপ। নিধিরাম চরিত্রের আদর্শ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পরচনার আর একটি বিশিষ্ট রীতির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মূলগল্পের ধারাকে মন্থর করে, কখনো বা থামিয়ে দিয়ে তিনি নানা শাখা কাহিনীর জাল বুনতে থাকেন। মূলগল্পের চেয়ে শাখাকাহিনীগুলিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। এখানেও

প্রাচ্যকাহিনীগুলির কথাই মনে পড়ে। শাখাকাহিনীগুলির উপরে বেশী জোর দেওয়ার ফলে কাহিনী শ্লথগতি ও বিলম্বিত। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটির ফলশ্রুতিতে হাস্যরসের আভাসমাত্র নেই—হিরণ্ময়ীর সুখের জন্য নিধিরাম বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে শেষপর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু শাখাকাহিনীগুলির মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনীশক্তি, খোশগল্প প্রবণতা ও পুরোনো দিনের বৈঠকী মেজাজ অনুপস্থিত নয়। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পের পঞ্চম অধ্যায়ে মড়া-পোড়ানোর দলটির আলাপ-আলোচনা ও মদ্যপান কৌতুকরসের উদ্রেক করে। উদ্ধবদাদা ও রামেশ্বর খুড়োর কাহিনী অবিস্মরণীয়।

'বীরবালা' গল্পটিও একটি স্বপ্ননির্ভর উদ্ভট কাহিনী। ত্রৈলোক্যনাথের যথেচ্ছচারী কল্পনা বাগদাদে, মক্কায়, সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে, মরুচারী উটের পিঠে, সবুজভূত ও সাহেবভূতের রাজ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করেছে।

'লুল্লু' ও 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ত্রৈলোক্যনাথের গল্পমালার মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'লুল্লু' গল্পটির মধ্যে আজগুবি ও অলৌকিক ঘটনার অভাব নেই, কিন্তু ভূতপ্রেত ও অলৌকিক উপাদানগুলিকে কাহিনীর বহিরঙ্গ বলে মনে হয়। এর নেপথ্যে আছে রঙ্গ-কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এক অন্তঃশীল প্রবাহ। গল্পের খাতিরেই গল্প নয়—রঙ্গ-কৌতুক ছাড়াও অনেকক্ষেত্রেই সুতীক্ষ্ণ সামাজিক বিদ্রূপও আছে। ব্রাহ্মণের মুরুব্বি ভূতটি বলেছে ঃ

"ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী পড়া বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি। ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে ঢলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেন না, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচকা ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্তলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলপির পাক-বিশিষ্ট নয়।"

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে আমস্টার্ডমে যে শিল্প-মহামেলা হয়, সেখানে গভর্ণমেন্ট ত্রৈলোক্যনাথকে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের মত না হওয়াতে তিনি যেতে পারেননি। তারপরে কর্মোপলক্ষে তাঁকে দুবার বিলাত যেতে হয়েছিল। কিন্তু দেশে ফিরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। এই ব্যাপার থেকেই স্বধর্মনিষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের প্রকৃতির

পরিচয় পাওয়া যায়। ঘ্যাঁঘো-নাকেশ্বরীর শুভপরিণয় উপলক্ষে ভূতদের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে লুল্লু বলেছে ঃ

"মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই আমাদের শিরোধার্য। তবে কিনা, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্র-পারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন। যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা, দিবারাত্রি তাঁহাদিগের পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিংবা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়ে টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।"

গোঁ গোঁ ভূত প্রসঙ্গে খবরের কাগজের সম্পর্কে আমীর যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমীর বলিলেন,—'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতরে যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি সম্পাদক করিব।' গোঁ গোঁ বলিল,—'আমি যে লেখা-পড়া জানি না।' আমীর বলিলেন,—'পাগল আর কি! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস ত?' গোঁ গোঁ বলিল,—'ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' আমীর বলিলেন,—'তবে আর কি! আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষ যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে, সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।"

'লুল্লু' গল্পটিতেও অনেক আজগুবি ঘটনা আছে। সঙ্গীতবিশারদ তাঁতি,

বিরহজর্জরিত ঘঁ্যাঘো, ঘানিমর্দিত গোঁগোঁ, নব্যসভ্য ভূত লুল্লু, ভৌতিক বিবাহের ঘটকালি প্রভৃতি কৌতুককর বিচিত্রকাহিনীকে লেখক অবলীলাক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। 'লুল্লু' গল্পটির প্রায় বারো-আনা কাহিনীই ভৌতিক জগতের কিন্তু নিতান্ত অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গল্প বললে এর স্বরূপধর্মটিকে অস্বীকার করাই হবে। ভৌতিক জগতের মাধ্যমে তিনি মানুষকে নিয়েই রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেছেন।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা' গল্পটি খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু একাধিক শাখাকাহিনীর বিচিত্র প্রবাহে শ্লথগতি। এই নাতিদীর্ঘ গল্পটিকে ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যায়। তাঁর একাধিক ছোটগল্পে যে 'টেক্‌নিক' ব্যবহৃত হয়েছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ফরাসডাঙার সুবিখ্যাত গুলি'র আসরে কয়েকজন গুলিখোর সমবেত হয়ে সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমিয়ে তুলেছেন। এর প্রধান কথক নয়নচাঁদ। আসল গল্প আরম্ভ হওয়ার আগে গুলিখোরদের তর্ক-বিতর্ক ও গল্প-গুজবে গল্পের উপযুক্ত পটভূমিকা রচিত হয়েছে। নয়নচাঁদের শীতলা-ব্যবসার বিচিত্র কাহিনী কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর তার গতি রোধ করে গগন সুবলের কাহিনী শুনিয়েছে। তারপর আবার নয়নের গল্প শুরু হয়েছে। কিন্তু গল্প তো নয়, গল্পের বিচিত্র শৃঙ্খল। কর্তা ভূত শীতলা ফেরৎ দিতে নিয়ে তার কাহিনী শুনিয়েছে—কিন্তু সে গল্পও একটানা চলেনি, 'নেই-আঁকুড়ে দাদা'র কাহিনীও এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তাভূতের কাহিনীর শেষ হওয়ার ছোট্ট একটু 'পরিশেষ' অংশের পর গল্পটি শেষ হয়েছে।

প্রাচীনকালের বিখ্যাত কথাকোবিদদের মুখে মুখে গড়ে উঠত শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবাকীর্ণ এক একটি বিপুলায়তন গল্প-বনস্পতি। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' স্বল্প-প্রসারিত কাহিনী হলেও আদিম কথকদের ভঙ্গিটিই সেখানে অনুসরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, উদ্দাম কল্পনা ও গল্পের খরস্রোত মনুষ্য-জগৎ থেকে যমপুরী ও বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হলেও, গল্পটির অন্তর্নিহিত সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ঋজুগতিতে লক্ষ্যভেদ করেছে। ধর্মের নামে যারা ভণ্ডামি করে অসাধু ব্যবসায়ের সুকৌশলী ফাঁদ পেতেছে, লেখক তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। রঙ্গ-কৌতুকের আড়াল থেকে সামাজিক ব্যঙ্গের তীব্র বিদ্যুৎ-বহ্নি জ্বলে উঠেছে। অসাধু ব্যবসায় কতদূর প্রসারিত

হয়েছে তার চিত্রটিও চমৎকার। তাই লব্ধকাম জোচ্চোর ধর্ম-ব্যবসায়ী নয়নচাঁদ সগর্বে বলেছে ঃ

"আগে যদি একগুণ পসার ছিল, এখন দশগুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম্-এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোকসব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম।"

৮

'মজার গল্প' (১৯০৬) আটটি গল্পের সমষ্টি। এই আটটি গল্পের মধ্যেও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 'সোনা-করা জাদুগরের গল্প', 'জাপানের উপকথা' বিদেশী গল্প অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। 'ভানুমতী ও রুস্তম' একটি নিছক উপকথা—গল্পের জন্যই গল্প। 'পূজার ভূত', 'পিঠে-পার্বণে চীনে ভূত'—খোশ-গল্পের পর্যায়ে পড়ে। 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি' গল্পটির শেষে নীতিমূলক বক্তৃতা থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথের স্বভাবসিদ্ধ প্লট রচনার কৌশল ও রহস্যময় অলৌকিক পূর্বজন্ম সূত্রের অবতারণা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'একঠেঙো ছকু'-ও বৈঠকী মেজাজের গল্প। মহাষ্টমীর দিন কিনুবাবুর 'যোগ-মন্দির' নামক ছোট্ট চালাঘরে মদ্য ও গঞ্জিকার যৌথ নেশায় একঠেঙো ছকু তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছে।

'কঙ্কাবতী' ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনা হলেও 'ডমরু-চরিত'-এর গল্পসপ্তকে তাঁর প্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে। ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পের মতো আড্ডাখানাই এই গল্পগুলির উদ্ভবভূমি। বহিরঙ্গের দিকে কোনো কোনো গল্পের সঙ্গে খানিকটা অবস্থাগত মিল থাকলেও স্বাদে ও বৈচিত্র্যে গল্পগুলির জুড়ি নেই। গ্রন্থটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো গল্প কথকের অসাধারণ চরিত্র। ডমরুধর এই কাহিনীগুলি শুনিয়েছেন। বৃদ্ধ, কদাকার, সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী ও বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন মানুষটির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক

হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক তাঁকে এমনভাবে এঁকেছেন যে, ভালো না বেসে উপায় নেই। তাঁর গল্প বলার এমন আশ্চর্য কৌশল যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর বিচার বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায়—কতটুকু সম্ভব আর কতটুকু অসম্ভব তার সীমারেখা নির্ণয়ের ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না। গল্প শেষ হওয়ার পর আমেজ যখন একটু কমে আসে, যখন লম্বোদর ও শঙ্কর ঘোষ জাতীয় আড্ডার কোনো বন্ধু যদি গল্পের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে, তা হলে প্রত্যুৎপন্নমতি ডমরুধর তখনি তার এমন এক উত্তর দিতেন যে আর কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ থাকত না।

'ডমরু-চরিত'এ ত্রৈলোক্যনাথের শিল্প-প্রতিভার প্রতিটি দিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘনশ্যামবাবু (মুক্তা মালা), নয়নচাঁদ (নয়নচাঁদের ব্যবসা), তিনু (মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প : মুক্তা-মালা), ছকু (একঠেঙো ছকু : মজার গল্প), উদ্ধব দাদা (বাঙ্গাল নিধিরাম : ভূত ও মানুষ) প্রভৃতি চরিত্র বিচিত্রকথা-কোবিদ। মদ-গাঁজার আড্ডায় অনুকূল পরিবেশে এরা প্রত্যেকেই গল্প-জমানোর ওস্তাদ। কিন্তু ডমরুধরের সঙ্গে এদের কারো তুলনা হয় না। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী উদ্দাম কল্পনা, উদ্ভাবনী শক্তির বৈচিত্র্য ও অজস্রতা ডমরুধরের গল্পগুলিকে বর্ণময় ও রসোজ্জ্বল করে তুলেছে। হাস্যরসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অফুরন্ত কথারসের বিচিত্র স্পন্দনে লীলায়িত। কোথায়ও রঙ্গ-কৌতুকের ফেনোচ্ছ্বাস, কোথায়ও বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎরেখা, আবার কোথায়ও বা শ্লেষ-বিদ্রূপের তির্যক ভ্রূভঙ্গি! 'ডমরু-চরিত' কৌতুকশিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের অপূর্ব সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যে ডমরুধরেরও জুড়ি নেই। দুর্গোৎসবের সময় কলকাতার দক্ষিণে একটি গ্রামে নিজের পূজার দালানে ডমরুধর মজলিশ জমিয়ে বসেন। লম্বোদর, শঙ্কর ঘোষ প্রভৃতি বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথন ও তর্কবিতর্কের মাধ্যমে গল্প জমে ওঠে। তাঁর গল্প শুনে শ্রোতারা কৌতুকে-কৌতূহলে—বিস্ময়ে—হাস্যরসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু ডমরুধরের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর গল্প ভাণ্ডার অফুরন্ত, কল্পনা ত্রিভুবন সঞ্চারী। ছাদফুঁড়ে আকাশ-পথে ভ্রমণ, যমপুরীতে চিত্রগুপ্তের সঙ্গে কথোপকথন, সুন্দর-বনে মশার মাংস খাওয়া, কুমীরের পেটের ভিতরে সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে

গহনা নিয়ে কলহ, শূন্যমার্গে রাহুর কামড়, ভিকু ডাক্তারের কৃপায় অর্ধ গো-দেহ ধারণ, 'আরব্য উপন্যাস'-এর জিনকে বশ করা প্রভৃতি আশ্চর্য ও আজগুবি কাহিনী বর্ণনার সময় ডমরুধর কখনো অস্বস্তি বোধ করেন না, মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন ভয় তাঁর নেই। মিথ্যাকথার সরস-বিন্যাসে কখনো তিনি পশ্চাৎপদ হন নি।

বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন শক্তিমান কথক আছেন—বীরবলের নীল-লোহিত ও ঘোষাল, পরশুরামের কেদার চাটুজ্যে ও জটাধরবক্শী নিজেদের ক্ষেত্রে অসাধারণ। কিন্তু ডমরুধরের সঙ্গে এদের কোনো তুলনাই হয় না। নীললোহিত, কেদার চাটুজ্যে-জাতীয় কথকদের অসম্ভব উপাখ্যানের একটা সীমা আছে—তা ছাড়া সবগুলি কাহিনী তাদের সমান জমেনি। কিন্তু ডমরুধর এ বিষয় অদ্বিতীয়, কোথায়ও তিনি থামতে জানেন না। এক এক সময় এমন সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হয় যে মনে হয় বুঝি ডমরুধর রণে ভঙ্গ দিলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই দেখা যায় বিচিত্র কৌশলে এই অসামান্য কথক গল্পসূত্রকে গেঁথে চলেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প-জমানোর একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে; কিন্তু এই ক্ষমতা 'ডমরু-চরিত'-এ যেন তুঙ্গস্পর্শ করেছে। 'ডমরু-চরিত' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই মেজাজে লেখা। তাই এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন চিত্তাকর্ষক সরস কাহিনী আছে যে উদ্ধৃতির প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন।

গাছে-ঝোলা অন্ধ সাধুকে নিয়ে ভণ্ড ব্যবসায়ীরা যে বিচিত্র ব্যবসা ফেঁদেছিল, তার কৌতুককর বর্ণনায় ত্রৈলোক্যনাথ সামাজিক ব্যঙ্গকে তীব্র করে তুলেছেন:

"সাধুর দুইটি চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে তাহার বয়স পাঁচশত তিপান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে, চেলারা তাহার ডালে সাধুর দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া কেহ সাধুর পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমাগান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল।

ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল, সেই ধামায় পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।" [প্রথম গল্প]

আর একটি গল্পে পিং যে কথা বলেছে, তার অন্তরালেও কপট স্বদেশ-ভক্তদের সম্পর্কে অম্লমধুর মন্তব্য করা হয়েছে ঃ

"অল্পদিন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া যম আবেদন করিলেন যে,—'বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারি না। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্নে যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হইবে। তাহাদিগকে আমি স্থান দিতে পারিব না। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়তো কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তারপর মহাপ্রভুরা এক কড়া বর্গা কড়িও উপুড়হস্ত করিবেন না। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন।" [চতুর্থ গল্প]

স্বদেশী-কোম্পানী খুলে এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ তৈরীর ব্যবসায়ের মধ্যে যে কতবড় জোচ্চুরি আছে, ডমরুধরের একটি গল্প থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বদেশী কোম্পানী করার নামে অসাধুতা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, তা নিম্নলিখিত অংশ থেকে জানা যায় ঃ

"আমাদের কোম্পানীর নাম হইল,—'গ্র্যাণ্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড'। কয়েকজন বড়লোক ও উগ্রবক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে হুন্‌হর। ইহারা না জানেন এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কোম্পানীর বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।"

"দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে।·· প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে

লাগিল।…টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল। কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটি দিয়া শঙ্কর ঘোষ একখানিও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে যে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শঙ্কর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারীতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোম্পানী 'লিমিটেড' ছিল। মোকর্দমা ফাঁক হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না।" [পঞ্চম গল্প]

'ডমরু-চরিত' রত্নভাণ্ডার। তাই বিমুগ্ধ পাঠক এখানে পথ হারিয়ে ফেলে—কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা গ্রহণ করবে, এই হয় তার সমস্যা। 'ডমরু-চরিত' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ঐশ্বর্য, কিন্তু এই ঐশ্বর্যের মধ্যমণি হচ্ছেন ডমরুধর স্বয়ং। এই কুৎসিৎ কদাকার পুরুষ নিজের রূপসম্পর্কেও নানা কৌতুককর অম্ল-মধুর মন্তব্য করেছেন। প্রকৃত পক্ষে ডমরুধরের হাস্যরসের একটি প্রধান উপকরণ হলো, নিজের কুৎসিৎ রূপ। নিজের কুৎসিৎ রূপ সম্পর্কেও তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। শেক্সপীয়রের অমর চরিত্র ফলস্টাফ নিজের স্থূলত্ব নিয়ে পরিহাস করেছেন। ডমরুধর এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। নিজে যে কুৎসিৎ এ সম্পর্কে তিনি অতিসচেতন, তাই তাকে মশলা করে তিনি যে অম্লমধুর পরিহাসরসের সৃষ্টি করেন, তা অতুলনীয়। তিনি নিজেই যখন সেই কন্দর্পকান্তির বর্ণনা করেন, তখন হাস্যবেগ সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠে ঃ "নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই,—এই দেখ আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে।" এই অপরূপ চেহারার জন্য নিজেরই বাগানের মালীর কাছে তিনি লাঞ্ছিত হয়েছেন, [প্রথম গল্প] ধাঙ্গড় তাঁকে ভদ্রলোক বলে বিশ্বাস না করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছে। [চতুর্থ গল্প]

ডমরুধরের সঙ্গে দুর্লভী বাগ্‌দিনী, তৃতীয় পক্ষের পত্নী এলোকেশী, ফচ্‌কে ছোঁড়া কেষ্ট প্রভৃতি চরিত্রও চিরন্তন হয়ে আছে। তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর মধ্যেই দুর্লভী ও এলোকেশীর প্রসঙ্গ আছে। ডমরুধর কোনোকালেই নীতি

বা রুচির ধার ধারেন না। তাই দুর্লভীর প্রতি দুর্বলতা ও এলোকেশীর সম্মার্জনী প্রহারের কাহিনীকে তিনি রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন। এলোকেশী ও দুর্লভীর প্রসঙ্গ ডমরুধরের কাহিনীকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। অসাধু ব্যবসায়, পরের পুকুরের মাছ চুরি, পরস্বাপহরণ—প্রভৃতি ব্যাপার থেকে ডমরুধরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বৈষয়িক বুদ্ধি যে কতখানি তীক্ষ্ণ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো কাজ তাঁর অসাধ্য নয়। কিন্তু এই সমস্ত কীর্তিকলাপ থেকে তাঁকে যতখানি হীনচরিত্র মনে হয়, আসলে তিনি তত খারাপ নন। সম্ভব-অসম্ভবের বিচিত্র রাসায়নিক মিশ্রণে গল্প তৈরী করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। নিজের চরিত্রকে অতিরিক্ত মসীরঞ্জিত করে তিনি আনন্দ পান—কারণ এইখানেই তাঁর গল্পগুলির আসল উৎস। ডমরুধরের হাস্যরসের কোনো কোনো অংশে স্থূল রসিকতার চিহ্ন বিদ্যমান। আধুনিক নাগরিকমানস ও শিক্ষিতচিত্তের বৈদগ্ধ্য ডমরুধরের গল্পে অনুপস্থিত। প্রাচীন বাঙালীর রঙ্গ-রসিকতা, গ্রামবৃদ্ধদের ঠাট্টা-মস্করা চণ্ডীমণ্ডপে গঞ্জিকাসেবীদের সম্ভব-অসম্ভব গালগল্প প্রভৃতির ঐতিহ্য এখানে অনুসৃত হয়েছে। ডমরুধর বাংলাদেশের শেষ কথক, যিনি প্রাচীন গ্রাম-বাংলার দাঠাকুর, ঠাকুরদা-দের মতো রসিয়ে রসিয়ে গল্প শুনিয়েছেন। তাই একালের কথকদের মধ্যে তাঁর স্থান অনন্য।

৯

ত্রৈলোক্যনাথের গল্প ও উপন্যাসে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানা প্রভৃতির অপ্রতিহত প্রাধান্য। সম্ভবত এই কারণেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার যথার্থ সমাদর ঘটে নি। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি যদি নির্জলা ভূতুড়ে কাহিনীই হতো, তা হলে তার বিশিষ্ট রচনারীতিটি পর্যন্ত লুপ্ত হতো। কিন্তু এখানে ভূতপ্রেতের আধিপত্য থাকলেও, একে অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের ভূতচরিত্রগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূতচরিত্রগুলিকে মানুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভূতজগৎ ও মনুষ্যজগতের মধ্যে এখানে কোনো

পার্থক্য নেই। 'কঙ্কাবতী'র কোনো ভূতই প্রচলিত অর্থে ভূত নয়, মনুষ্য-জগতের রীতিনীতি এবং মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তিও ভূতসম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'লুল্লু' গল্পের ভূতগুলিও মানুষ। বিরহজর্জরিত ঘ্যাঁঘোঁ, সংবাদপত্র সম্পাদক গোঁগোঁ, 'সভ্য ভব্য নব্য ভূত' লুল্লু প্রভৃতি চরিত্র মনুষ্যচরিত্রেরই ব্যঙ্গাত্মক রূপ। 'পাপের পরিণাম' উপন্যাসের খাঁদা ভূত ভূত নয়, মানুষই। বিকৃত ও কদর্য মূর্তি দেখে সকলেই তাকে ভূত মনে করেছে। এর ফলে উপন্যাসের গল্পাংশটি রহস্যনিবিড় হয়ে উঠেছে। 'ডমরুচরিত'-এর ভূতগুলিও মনুষ্যচরিত্রের প্রকারভেদ মাত্র।

'বীরবালা', 'মুক্তা-মালা'র কোনো কোনো গল্প, 'মজার গল্প'-এর কয়েকটি গল্প এই ধারার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। রূপকথার ঢঙে লেখা গল্পগুলিতে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দাম কল্পনা ভৌতিক জগতকে আশ্রয় করে যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। 'পূজার ভূত', 'পিঠে-পার্বণে চীনেভূত' জাতীয় গল্পকে ভূতুড়ে গালগল্প বলা যায়। 'মুক্তা-মালা'-র কিয়দংশ তো উদ্ভট ভূতুড়ে গল্পের পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু এই ধরণের বিশুদ্ধ ভূতুড়ে গল্পগুলিকে ত্রৈলোক্যনাথের স্বাভাবিক প্রতিভার ব্যতিক্রম হিসেবেই নির্দেশ করা যায়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ ভূতই মানুষের বিকল্প, আবার ঐ ভূতকে সম্মুখে রেখে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতকে তীব্রতর করেছেন। ভূতসমাজের সঙ্গে মনুষ্যসমাজের মিল ও বৈপরীত্যের যুগপৎ লীলা তার হাস্যরস সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলেছে। কার্টুনশিল্পী যেমন আসল ছবির আদল ঠিক রেখে তির্যকরেখার সাহায্যে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন, ত্রৈলোক্যনাথের ভূতও তেমনি মনুষ্যসমাজের কার্টুন।

'ভূতুড়ে' ভূত সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথের ধারণা কি ছিল, তার কিছু কিছু নিদর্শন তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ধার করা যায়ঃ

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যদি আমাদের মতো ভূতদিগের রোগ হয়, তাহা হইলেও ভূতেরাও তো মরিয়া যায়? আচ্ছা মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?"

স্কল উত্তর করিলেন,—'কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়? সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে।'...

আমি বলিলাম,—'…যদি অনুমতি করেন তো আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—ভূত মরিয়া যদি মারবেল হয়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া খেলা করা তো বিপদের কথা?'

স্কল উত্তর করিলেন,—'মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে আবার দোষ কি? হ্যাঁ জীবন্ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে।"

ত্রৈলোক্যনাথ এখানে ভূতের অস্তিত্ব নিতান্ত লঘুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'পাপের পরিণাম' উপন্যাসে ভূত দেখার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই উপন্যাসের শেষদিকে (তৃতীয় ভাগঃ অষ্টম অধ্যায়) বিজয়বাবু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করেছেনঃ 'সোনা বৌ, খাঁদা ভূত রাজাবাবুর ভূতকে দর্শন করে নাই, তাহাদের বিকারপ্রাপ্ত মনঃসম্ভূত ছায়া দেখিত মাত্র। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিও যে, আমরা সর্বদা নানাপ্রকার ভৌতিক জীবের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছি।' বিজয়বাবুর দাদা খাঁদা ভূতকে নদীতীরে কাদা দিয়ে নাক তৈরী করতে ও সোনা বৌকে উষরপ্রান্তরে কাঁদতে দেখেছিলেন। বিজয়বাবু এই ব্যাপারকেও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

"আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাকে লোক জীবাত্মা বলে। পৃথিবীতে তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিয়া কাজ করিতে হয়, সেজন্য তাহার শক্তি অল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অসীম শক্তি নিহিত আছে। কোন কোন মানুষে সেই শক্তি আপনাআপনি বিকশিত হয়, কোন কোন মানুষ নিয়মানুসারে যত্ন করিয়া সেই শক্তি বিকশিত করে, কোন কোন মানুষে পীড়িত অবস্থায় অথবা মৃত্যুকালে সেই শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত হয়। এই শক্তি বিকশিত হইলে মানুষের অনেক-প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-অডিয়েন্স (Clair-audience) বলে। অনেক দূরের ঘটনা কেহ বা দেখিতে পায়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-ভয়ান্স (Clair-Voyance) বলে।…মৃত্যুকালে আমার দাদা মহাশয়ের মানসিক বৃত্তিসমূহ কিয়দংশে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই তিনি খাঁদা ভূতের নাসিকা-গঠন ও সোনা বৌয়ের অরণ্যে রোদন দর্শন করিয়াছিলেন।"

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পরচনার একটি প্রধান টেকনিক স্বপ্নকাহিনীর অবতারণা। কারণ তিনি যে সব ঘটনা বলেছেন, তা স্বপ্নের মাধ্যম ছাড়া ঘটা অসম্ভব। 'কঙ্কাবতী', 'বীরবালা', 'মুক্তা-মালা', 'ময়না কোথায়!', 'মজার গল্প'-এর কোনো কোনো গল্পে স্বপ্নকাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের যথেচ্ছাচারী কল্পনা স্বপ্নের বাহন ছাড়া যে তার প্রার্থিত জগতে উপস্থিত হতে পারত না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বপ্নের মাধ্যম একটি অতি পুরাতন পন্থা—প্রাচীনকালের খ্যাতনামা কথকেরাও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। স্বপ্নের মাধ্যমেই অসম্ভব ও উদ্ভট জগতে পাড়ি জমানো সম্ভব। ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী'তে নিরঞ্জন কবিরত্নের মুখ দিয়ে কঙ্কাবতীর স্বপ্নবৃত্তান্তের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বপ্নজগৎটি যে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এ কথা তিনি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া স্বপ্ন-সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি। সেজন্য কঙ্কাবতীর স্বপ্নকে আমরা উপহাস করিব কেন? সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়কল্পিত। দুইজগতে বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ নাই। কঙ্কাবতী যাহা দেখিয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, যাহা কখনও চিন্তা করিয়াছে, সেই সমুদয় লইয়া একটি স্বপ্নজগৎ নির্মিত হইয়াছিল।...কঙ্কাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ ভ্রমও দেখিতে পাই। হাতীদিগের মত মশাদিগের নাক পরিবর্ধিত হইয়া শুঁড় হয় না, মশাদিগের দুই চল বাড়িয়া শুঁড় হয়। আবার অন্যস্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনাদেবী কঙ্কাবতীর সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন।"

'বীরবালা' গল্পটিতে অযোধ্যাবাসী দেবীসিংহ অশ্বত্থমূলে শুয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার অনেকাংশই উদ্ভট খেয়ালীকল্পনা মাত্র, কিন্তু বীরবালা যে মিথ্যা নয়, তা জাগরণের পর প্রমাণিত হয়েছে। এখানে সত্য-কল্পনার টানা-পোড়েনে একটি স্বপ্নকাহিনী বয়ন করা হয়েছে। 'মুক্তা-মালা'র স্থবল গড়গড়ির বিচিত্র স্বপ্নটি তাঁর জরাতুর দুর্বল মস্তিষ্কের খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি' গল্পে অন্নপূর্ণার

স্বপ্ন কাহিনীটি প্রকৃতপক্ষে তার পূর্বজীবনের ইতিহাস। সুতরাং এখানেও স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন নয়। বায়রনের মতো তিনিও বলতে পারেন: 'I had a dream which was not at all a dream.'

আগেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক ছোটগল্পের রূপাদর্শের দিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের কোনো গল্পকেই সার্থক ছোটগল্প বলা যায় না। প্রাচীন প্রাচ্যকথকদের শ্লথগতি দীর্ঘবিতানিত বিলম্বিতলয়ের গল্প তিনি লিখেছেন। তবু তাঁর মেজাজ উপন্যাসিকের নয়, গল্পকারেরই। আর একটি দিকে তাঁর নিজস্ব রীতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর স্টাইল ও ভাষার মধ্যেও একটি নূতনত্ব আছে। তাঁর ভাষা যেমন অনলঙ্কৃত, তেমনি স্বচ্ছন্দ। কোনো প্রকার জড়তা তার ভাষাকে আড়ষ্ট করতে পারে নি। এমন কি যেখানে ত্রৈলোক্যনাথের খেয়ালী-কল্পনা নূতন রূপকথার সৃষ্টি করেছে, সেখানেও তাঁর ভাষা আড়ম্বরবহুল অথবা ভাবালুতায় আর্দ্র হয়ে ওঠেনি। খেয়ালী কল্পনাকে প্রকাশ করার উপযুক্ত অনাড়ম্বর ও লঘু-স্বচ্ছ ভাষা ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন:

"চাঁদ উত্তর করিলেন, 'বড় মেয়েটি একখানি কাঁসির মত হইয়াছে। কেমন চক্‌চকে কাঁসি! তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁসির সেরূপ রং হয় না! মেজ ছেলেটি একখানি খত্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেক-গুলি ছেলেমেয়ে আছে। কোলের মেয়েটি একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পড়িতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক, মেয়েটির শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর যখন আকাশে কালো চাঁদ উঠিবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক-সুন্দরী বটে! তাহার কালো কিরণে জগতে চক্‌চকে অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ যেন বার্‌নিশ-চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে!" [কঙ্কাবতী: দ্বিতীয়ভাগ, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ]

ত্রৈলোক্যনাথের স্টাইল যেন গল্প বলার মৌখিকভঙ্গিরই রূপভেদ মাত্র। গল্প বলার সহজাত শক্তির সঙ্গেই তিনি এই স্টাইল ও ভাষা পেয়েছিলেন। এর জন্যে তাঁর কোনো স্বতন্ত্র অনুশীলনের প্রয়োজন হয়নি। তাই কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি কলম ধরেই পাকা হাতে লিখতে পেরেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ভাষা আধুনিককালের চলতি ভাষা নয়, কারণ

সে ভাষাও যত্নকৃত, অনুশীলননির্ভর। তিনি গল্পবলার প্রাচীন ঢঙটিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র—অক্লান্ত আগ্রহে এক নিপুণ গল্পকার যেন গল্প বলে চলেছেন ঃ

"বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়ো হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন! তোমাদের একি নূতন কাণ্ড!···অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইতেছিল যে, যাঃ! লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি-মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই। পাকা আমের নীচের দিক্‌টা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল, কলিকাতার হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীয়ন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল।" [ডমরু-চরিত ঃ দ্বিতীয় গল্প]

ত্রৈলোক্যনাথ যেন আদিম গল্প-কথকদের মুখের ভাষাকে অপূর্বকৌশলে একালে বন্দী করে রেখেছেন। গোটা বর্ণনার মধ্যে কথকের স্মিতহাস্য ও পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর এতোই স্পষ্ট যে, তাঁরও সান্নিধ্য অনুভব করা যায়। ভাষা অনলঙ্কৃত ও ঋজুগতি হলেও যেমন-তেমন ভাবে যখন-তখন গতিপরিবর্তন করে মোড় ফিরতে পারে। পরশুরামের ভাষার মতো এ ভাষায় ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি নেই। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি যেমন শিথিলবন্ধ, ভাষাও তেমনি ঢিলেঢালা। এই দুয়ের সমন্বয়ে গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক মেজাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। কখনো কখনো অত্যন্ত সাধারণ বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যেও হাস্যরসের উপকরণ থাকে। সংলাপের তো কথাই নেই, বর্ণনা অংশগুলির মধ্যেও ত্রৈলোক্যনাথের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

হাস্যরসিক ত্রৈলোক্যনাথও গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথের মতো। 'বঙ্গবাসী'

পত্রিকার নিয়মিত লেখক হলেও মনোধর্মের দিক থেকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কম নয়। ইন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা বড় ছিল না, চুটকি রচনা ও সংক্ষিপ্ত টীকা-টিপ্পনীর মধ্যেই তাঁর প্রতিভার স্বরূপধর্মটি নিহিত আছে—'পাঁচুঠাকুর' নামক টীকা টিপ্পনী সমন্বিত রচনাটিই তাঁর রচনার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে প্রচারধর্মিতা উগ্র হয়ে উঠেছে, হাস্যরস এক এক সময় বীভৎস রসে পরিণত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথও স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এক 'ময়না কোথায়!' ছাড়া অন্য কোথাও প্রচারধর্মিতা তাঁর শিল্পবোধ ক্ষুণ্ণ করেনি। রবীন্দ্রনাথ ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' সম্পর্কে 'কৌতুক' ও 'করুণা' দুটি বিশেষণই ব্যবহার করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরস কৌতুকে ও করুণায় মাখামাখি। তাই তীব্র স্যাটায়ারের বিদ্যুৎ-কশাঘাত তাঁর কোনো রচনাতেই বহ্নিদীপ্ত হয়ে ওঠেনি—কৌতুকের স্নিগ্ধতা, উইটের চমক ও উদ্দাম রঙ্গপ্রবণতা তাঁর হাস্যরসকে শিল্পশ্রী মণ্ডিত করেছে। করুণা ও সমবেদনার স্পর্শে এই হাস্যরস কখনো কখনো শ্রেষ্ঠ হিউমারের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

আড্ডায় যাঁরা গল্প জমাতে ওস্তাদ তাঁদের তিনটি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। প্রথমটি, বিচিত্র গল্প উদ্ভাবনের ক্ষমতা; দ্বিতীয়ত, হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতা। হাস্যরস বৈঠকী খোশগল্পে মশলার কাজ করে। তৃতীয়ত, রহস্যসৃষ্টির নৈপুণ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে হাস্যরস ও রহস্যরস বৈঠকী গল্পকে উপভোগ্য করে তুলেছে। হাস্যরস গল্পকে উপাদেয় করেছে, আর রহস্যরস গল্পশোনার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছে। উইট্‌ ও প্লটরচনার কলাকৌশল —দুদিকেই ত্রৈলোক্যনাথের নৈপুণ্য। তাই তাঁর কণ্ঠে আদিম কথকের সজীবতা! আরব্যরজনীর নিশাচর কল্পনা যেন একালের বাংলাদেশে সামাজিক ব্যঙ্গের মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আদিম কথকদের কণ্ঠে যেন একালের সমাজভাষ্য রূপ পেয়েছে। তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে মধ্যযুগীয় অসম্ভব ও আলৌকিক কাহিনীর কল্পনাখচিত মখমল আবরণের মধ্যে একালের সমাজ জীবনটি 'কৌতুকে-করুণা'য় মুক্তাবিন্দুর মতো উদ্ভাসিত।

———

রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনবত্বের সঞ্চার করেন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী মোটামুটি সেই ধারাই কথা সাহিত্যের গতি নির্দেশ করেছিল। এই পর্বের উপন্যাসের মধ্যে প্রধানত দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—ইতিহাস-মিশ্র রোমান্স-নির্ভর আখ্যায়িকা ও সমাজ-সমস্যা-মূলক উপন্যাস। বঙ্কিম-পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি ধারাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে পরিপুষ্ট করেছিল। ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্র ইংরেজীতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, কিন্তু তাঁকে মাতৃভাষায় সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। এই অবিস্মরণীয় ঘটনার প্রায় তেইশ বছর পরে রমেশচন্দ্র নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উৎসাহ-বাণীর কথা স্মরণ করেছেন ঃ

These words created a deep impression in me, and two years after this conversation, my first Bengali Work, 'Banga Bijeta,' was out in 1874.

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথাই এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ শুধু প্রেরণা নয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবও তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অবশ্য ইতিহাসের উপর বাল্যকাল থেকেই তাঁর একটি গভীর আকর্ষণ ছিল। স্কট ছিলেন তাঁর প্রিয়তম লেখক। স্কটের উপন্যাসের মধ্যযুগীয় পটভূমিকা, বর্ণ-বিচিত্র ঐতিহাসিক রোমান্স ও বীরযুগের রোমাঞ্চকর জীবনচর্যার ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-রস-রসিকতাকে পরিতৃপ্ত করেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন :

I do not know if Sir Walter Scott gave me a taste for history, or if my taste for history made me an admirer of Scott ; but no subject, not even poetry, had such a hold upon me as history.

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ স্কট। তবে একথাও যথার্থ যে, যে সময় তিনি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন, তখন

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস প্রকাশিত হয়—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। স্কটের উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সচেতন সংস্কার যে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাসেই লক্ষণীয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার দশ বছরের মধ্যে অনেকেই বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

তথাপি রমেশচন্দ্রের পথ স্বতন্ত্র। সেকালের অধিকাংশ ইতিহাস-মিশ্র কাহিনী রচয়িতাদের মত রমেশচন্দ্র ইতিহাসের মধ্যে সুলভ রোমান্স-রসের অনুসন্ধান করেন নি। রোমান্স পিপাসা তাঁরও ছিল, কিন্তু তাকেই তিনি চূড়ান্ত করে তোলেন নি। দূর অতীতের কুহেলি-মণ্ডিত রোমান্সের দিগন্ত থেকেই তাঁর যাত্রা সুরু, কিন্তু তার বৃহত্তর পরিণতি অকুণ্ঠ দেশপ্রেমিকতায়, দেশের লুপ্ত-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়—এখানে তিনি যথার্থই চারণ-কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন—'বঙ্গবিজেতা' (১৮৬৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'জীবন-প্রভাত' (১৮৭৭) ও 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৭৯)। উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক গতির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে ঐতিহাসিক রোমান্সকে কাটিয়ে ক্রমাগত ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিকেই ঔপন্যাসিকের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে এই চারখানি উপন্যাস একত্রিত করে 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৯)। 'শতবর্ষ' নামকরণ থেকে মনে হয় একশো বছরের ভারত-ইতিহাস নিয়ে ক্রনিক্‌ল বা ঐতিহাসিক কাহিনীবৃত্ত রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য অতি ক্ষীণ সূত্রাকারে কাহিনীগুলির মধ্যে সংযোগ থাকলেও, স্বতন্ত্র উপন্যাস হিসেবেই এদের আসল মূল্য। 'বঙ্গবিজেতা'র ঘটনাকাল ১৫৮০-৮২, টোডরমলের তৃতীয়বার বাংলায় আগমনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'জীবন-সন্ধ্যা' 'বঙ্গবিজেতার'ও পূর্ববর্তী—এখানকার কাহিনী সুরু হ'য়েছে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের আহেরিয়া উৎসব থেকে। ঘটনাকালের দিক থেকে 'মাধবীকঙ্কণ'-এর স্থান তৃতীয়। তখন শাজাহানের রাজত্বকাল, সুজা বাংলাদেশের সুবাদার। রাজসিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ ও ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তিতে কাহিনীর উপসংহার। উপন্যাসটির ঘটনা-পরিধি প্রায়

চার পাঁচ বছর (১৬৫৩-১৬৫৭)। শতবর্ষের শেষাংশ 'জীবন-প্রভাত' এর কথাবস্তু। ১৬৬৩ থেকে কাহিনীর আরম্ভ—ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর কাহিনীই 'জীবন-প্রভাত'-এর মূল আখ্যায়িকা। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের (১৫৭৬) প্রাক্-লগ্ন থেকে রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক (১৬৭৪) কাল পর্যন্ত শতবর্ষের কাহিনী-চক্র। কিন্তু চারখানি উপন্যাস একত্রিত করে 'শতবর্ষ' নাম দেওয়ার খুব বেশী যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ, শতবর্ষের গ্রন্থন-বিন্যাসের শিথিলতা, দ্বিতীয়ত প্রকৃতিগত দিক থেকে উপন্যাস চারখানির মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

'বঙ্গবিজেতা' রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। আখ্যায়িকা-অংশের কেন্দ্র তিনটি—মুঙ্গের, ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেষ্টিত দুর্গ। মুঙ্গের কাহিনীর মধ্যেই অনেকটা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস অংশের নায়ক রাজা টোডরমল্ল। কিন্তু এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রটিকে নিতান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়। তাঁর গুণাবলী ও ব্যক্তি-চরিত্রের বর্ণনা লেখকের মুখ থেকেই যতটুকু শোনা যায়, তার বেশী প্রত্যাশা করাও ঠিক নয়। কারণ চরিত্রটির অন্তর্জীবন বলে কোন বস্তুই নেই। ঔপন্যাসিক যে কথা বিস্তৃতভাবে বলার চেষ্টা করেছেন, টোডরমল্লের চারিত্রিক ব্যঞ্জনা থেকে তা উদ্ভুত হয় নি। কাহিনীর প্রথমেই লেখক তাঁর আখ্যায়িকা-সম্পর্কে একটি আভাস দিয়েছেন : "কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে।" কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্রের অস্পষ্টতার জন্য লেখকের এই উদ্দেশ্যটি সফল হয়ে উঠতে পারে নি—তা ছাড়া চরিত্রটিকে যুগ-জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে সংযুক্ত করা হয় নি।

ইচ্ছাপুর ও চতুর্বেষ্টিত দুর্গের কাহিনীকে প্রধানত কাল্পনিক কাহিনী বলা যায়। তবে এই কাহিনী দুটি নিতান্ত শূন্যগর্ভ ও নিরালম্ব রোমান্স মাত্র নয়। এই সময় প্রায় সাড়ে তিন বছর রমেশচন্দ্র রাজকার্য উপলক্ষে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেন। (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩—৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৬)

স্থানীয় জনশ্রুতি ও লৌকিক কাহিনীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে।

চতুর্বেষ্টিত দুর্গের আধুনিক নাম চৌবেড়ে—ইতিহাস ও জনশ্রুতি-মিশ্রিত নানাকাহিনী সেখানে প্রচলিত আছে। আসল কথা 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসের উপাদান অংশ তিনটি—ইতিহাস, লৌকিক কাহিনী ও কল্পনা। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল-মুখর রাজপথ ও এর জনবিরল গলিপথ সম্ভবত দুধারার মধ্যে একটি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি আলোকরঞ্জিত রাজপথেরই যাত্রী, কিন্তু আশে-পাশের অনভিজাত গলিপথও তাঁর কাছে এক বিস্মৃত দিনের ছায়া-দীর্ঘ কম্পমান যবনিকা বলে মনে হয়েছে। রমেশচন্দ্র কৌতূহলী হয়ে সেই যবনিকা-প্রান্ত উত্তোলন করেছেন মাত্র, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করেন নি। সে দায়িত্ব পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন।

টোডরমল্লকে বাদ দিলেও অন্যান্য চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি। দেশকালের অতিরিক্ত কতকগুলি প্রাণহীন পুতুল হয়ে উঠেছে মাত্র। এমন কি কাহিনীর অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ইচ্ছাপুর জমীদারপুত্র ইন্দ্রনাথ, সর্বত্র উপস্থিত আছেন বটে, কিন্তু কোথায়ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেনি। শকুনি 'ভিলেন' চরিত্র, কিন্তু আসলে সে জীবনবোধ-বিবর্জিত একটি টাইপ চরিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। মহাশ্বেতা চরিত্রের সহনশীলতা, আভিজাত্য ও প্রতিহিংসাবৃত্তি খানিকটা মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। 'শকুনি' ও 'মহাশ্বেতা' এই দুটি নামকরণের মধ্যে যথাক্রমে মহাভারত ও কাদম্বরীর প্রভাব আছে—সম্ভবত এই দুটি চরিত্রের খানিকটা বৈশিষ্ট্যও সঞ্চারিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই দুটি ক্লাসিক চরিত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়।

কাহিনীর মধ্যে দুর্বলতম অংশ উপেন্দ্রনাথ ও কমলার আখ্যায়িকাটি। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সর্বসম্পর্ক-বর্জিত এই চরিত্র দুটি নিতান্ত অস্বাভাবিক-ভাবে কাহিনীর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। বহিরাশ্রয়ী ঘটনায় অকারণ চমক-সৃষ্টি উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত গতিবেগকে পদে পদে খর্ব করেছে। অলৌকিকত্ব, আকস্মিকতা কাহিনীকে সমতালমণ্ডিত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিশ্বেশ্বর পাগলিনীর দৈবশক্তি ও তার বাস্তব পরিচয়টির মধ্যে একটি প্রবল বিরোধ আছে। 'বঙ্গবিজেতা'র উপরে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রভাব স্পষ্ট—

মহাশ্বেতা যেন বিমলা ও বিমলা যেন আয়েষার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গবিজেতা' অবিমিশ্র রোমান্স,—কিন্তু এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যেও রমেশচন্দ্র যে ইতিহাস-আনুগত্য দেখিয়েছেন তা বঙ্কিমের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টতর। কিন্তু বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসারতা ও সৃষ্টিনৈপুণ্য তাঁর ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে 'বঙ্গবিজেতা'র তুলনা করলে এ সত্য সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

২

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র প্রাথমিক প্রচেষ্টার জড়তাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। ইতিহাস-চিত্রণ ও ঔপন্যাসিক ধর্ম—দুদিক থেকেই 'মাধবীকঙ্কণ' রমেশচন্দ্রের উন্নত শিল্পশক্তির পরিচয় বহন করে। মূল কাহিনীর দিক থেকে ইতিহাস হয়তো মুখ্য নয়, কিন্তু নায়কের দৈববিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে ইতিহাসের বিচিত্র বর্ণের সূত্র এক অবিচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত। নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্র—কোনটিই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু বৃহত্তর ইতিহাসের স্পন্দন তাদের জীবনকেই বৈচিত্র্য-মুখর ক'রে তুলেছে। বাল্য-প্রণয়-বিড়ম্বিত নরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের এক অখ্যাত পল্লীগ্রামকে বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। যদিও শ্রীশচন্দ্র ও হেমলতার দাম্পত্য-জীবনের উপর ভারত-ইতিহাসের আবর্তসঙ্কুল অধ্যায়টি তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি, তথাপি এখানকার ইতিহাস-চিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

'বঙ্গবিজেতা'য় ইতিহাসের স্পর্শ আছে, কিন্তু সে ইতিহাস ম্লান প্রাণহীন, কিন্ত 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের ইতিহাস প্রাণ-চঞ্চল ও গতি-মুখর—রমেশচন্দ্র এখানে একটি ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের অন্তিমলগ্নে যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের প্রলয়ঙ্কর শিখা জলে উঠেছিল, তাকেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের দূর-বিসর্পী রহস্যের সঙ্গে সমন্বিত করে রমেশচন্দ্র এক অসাধারণ যুগচিত্রকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। পটভূমিকার বিস্তৃতিও বিস্ময়কর। ভাগীরথী-তীরবর্তী একটি

নিস্তরঙ্গ পল্লীগ্রাম থেকে লেখকের ইতিহাসদৃষ্টি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে বিলাস-বিভ্রমময় দিল্লী, এমন কি মোগল রাজান্তঃপুরের ভীষণ-রমণীয় সৌন্দর্যের বিষপুষ্পের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। উজ্জয়িনীর যুদ্ধের পরে ইতিহাসদৃষ্টি সঞ্চারিত হয়েছে নূতন পথে। এবার আর বাদশাহী রোমান্সের মোহ-মদির কাহিনী নয়—এবার শৈলবন্ধুর আরাবল্লীর পাষাণ-শিলায় অঙ্কিত এক বীরত্ব মণ্ডিত দুঃসাহসিক দেশপ্রেমিকতার ইতিহাস। পরবর্তীকালের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'র বীজ উপন্যাসের এই অংশেই লক্ষ্য করা যায়। চিতোর, যোধপুর উদয়পুর, একলিঙ্গ-দেবের মন্দির প্রভৃতি প্রসঙ্গ এক সংগ্রামশীল জীবনের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাসকেই উদ্ভাসিত করে তোলে। স্বার্থকৌটিল্য, মোগল হারেমের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল রাজনৈতিক জটিলাবর্ত—যুগজীবনের প্রতিটি সত্য যেন রমেশচন্দ্র জাতিস্মরের মত বর্ণনা করেছেন। নরেন্দ্রনাথের রণক্লান্ত অর্ধচেতন স্মৃতি-দর্পণে জেগে ওঠা 'বেগমসাহেবার সরাই'-এর রহস্যময় ভীষণ-রমণীয় চিত্র ও জেলেখার ব্যর্থ-প্রেমের কয়েকটি আবেগনিবিড় মুহূর্ত বর্ণনায় রমেশচন্দ্র উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। লেখক কোনটিকেই বাস্তবের সূর্যালোকিত জগতে টেনে আনেন নি—তার ফলে একটি করুণ-সুন্দর সূক্ষ্মসার গীতি-মূর্ছনার সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত আর কোন ক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্র তাঁর হৃদয়াবেগকে এমনভাবে মুক্তি দেন নি। জেলেখার জ্বালাময় জীবনের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি অদৃশ্যভাবে নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যতকেই যেন মসী-রঞ্জিত করে তুলেছে। একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের উপর আরব্য উপন্যাসের গভীর প্রভাব আছে। ইরাণী রোমান্সের এমন জীবন্ত ও বর্ণাঢ্য চিত্র বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নরেন্দ্র-হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্রের কাহিনী। নরেন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্রের চারিত্রিক বৈপরীত্যকে লেখক কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় মন্তব্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নরেন্দ্রনাথ তার অভিমান-ক্ষুব্ধ, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নিয়ে বৃহত্তর জীবনস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—এও যেন তার চরিত্রেরই স্বরূপ। শ্রীশচন্দ্রের শান্ত, সংযত চরিত্রটি হেমলতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে মাত্র, কিন্তু তার হৃদয়ের গোপন-গুহায় কোন সাড়া জাগাতে

পারেনি—বিবাহিত জীবনের মধ্যেও একটি ম্লান ও ধূসর ছায়া সংক্রামিত হয়েছে—মিলনের সুতীব্র হৃদয়াবেগ এখানে নেই। অপর পক্ষে, হেমলতাকে ঘিরে নরেন্দ্রনাথের প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি—তার উচ্ছ্বসিত অভিমান, অসংবরণীয় হৃদয়াবেগ, প্রীতিসমুজ্জ্বল কল্যাণকামনা, একটি জীবন্ত হৃদয়ের লীলা-চাঞ্চল্যে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্রের প্রেম-চিত্রণ সাধারণত বিশেষত্ব-হীন ও বর্ণবিরল কিন্তু 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসটি তার একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাস-প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কথা মনে হয়। বাল্য প্রণয়ের পরিণতি উভয়ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে ও অন্তর্জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব শিল্প-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবজীবনের সঙ্গে মানব-নিয়তি ও দুর্নিরীক্ষ্য রহস্যকে একসূত্রে যুক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, কবিকল্পনার মহিমাদীপ্ত ঐশ্বর্য ও উচ্চতর ট্রাজেডির মহৎ সমুন্নতি রমেশচন্দ্রের পক্ষে অনায়ত্ত ছিল। তবে 'চন্দ্রশেখর' ও 'বিষবৃক্ষের' মত রমেশচন্দ্রও দাম্পত্য-বন্ধনকেই জয়যুক্ত করেছেন।—যে প্রেম বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি, তার বৈচিত্র্য ও হৃদয়াবেগ যতই থাকুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র কেউই তাকে চরম ব'লে স্বীকার করেন নি।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'মাধবীকঙ্কণ' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যথার্থ শক্তির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কারণ এই জাতীয় উপন্যাসের স্বরূপধর্মটিকে তিনি এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্রের জীবনবৃত্ত একটি অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাহিনী, কিন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। কাহিনীর নায়ক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র নরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'মাধবী-কঙ্কণ' উপন্যাসে ইতিহাস অপেক্ষাকৃত অপ্রধান অংশ অধিকার করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মূল্য কম নয়। ইতিহাস এখানে কতকগুলি ঘটনাপ্রধান তথ্যপঞ্জী মাত্র নয়—আবেগে, উত্তাপে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবতায় ইতিহাস-অংশ সজীব ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। এক বীরযুগের সংঘাতমুখর চিত্র রঙে ও

রেখায় উজ্জল হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের যে কটি দৃশ্য আছে তা যেমন নির্বাচিত, তেমনি উপন্যাস-অনুমোদিত।

'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি চিত্রণেই শুধু রমেশচন্দ্র কৃতিত্ব দেখান নি নরেন্দ্র-হেমলতার সম্পর্ক ও ঘাতপ্রতিঘাতের বর্ণনায়ও তিনি উচ্চতর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নরেন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস আছে। উগ্রতা, হঠকারিতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা নরেন্দ্রনাথ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই মূল সূত্রটিকে অবলম্বন করেই তাঁর পরবর্তী চরিত্র রচিত হয়েছে। তার স্বভাবের উগ্রতাই তাকে নবকুমারের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অচরিতার্থ প্রেমের তীব্র দহন তাকে জলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে—ইতিহাসের জটিলাবর্তের সঙ্গে অনিবার্য ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। স্বপ্নে, জাগরণে ও কর্মচঞ্চল মুহূর্তে—সর্বদাই হেমলতার স্মৃতি তাকে দংশন করেছে। কিন্তু হেমলতাও সুখী হয়নি, ব্যর্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়া তার মনের স্বাভাবিক বিকাশকে সঙ্কুচিত করেছে। রমেশচন্দ্র স্বল্প-সংক্ষিপ্ত রেখাঙ্কনে হেমের মৌনবেদনার চমৎকার ছবি এঁকেছেন:

"নয়ন দুইটি জ্যোতির্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, ওষ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমাচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। তথাপি যৌবন-প্রারম্ভের প্রফুল্লতা সে অবয়বে লক্ষিত হয় না, যৌবনের উন্মত্ততা সে মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না, বোধ হয় যেন, সে সুন্দর ললাটে, সেই স্থির চক্ষুদ্বয়ে, সেই সুচিক্কণ ওষ্ঠে, অল্পকালেই চিন্তার অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে। নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঈষৎ স্তিমিত হইয়াছে, মুখমণ্ডলের প্রফুল্ল আলোকের উপর জীবনের সন্ধ্যার ছায়া বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।···অর্ধপ্রস্ফুটিত কোরকে দুঃখকীট প্রবেশ করে নাই, তথাপি কোরক জীবনাভাবে যেন ঈষৎ শুষ্ক ও নতশির। জীবনের অরুণোদয় যেন মেঘচ্ছটায় বিমিশ্রিতা।" [অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ]

নরেন্দ্র হেমলতার সম্পর্কের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রতাপ-শৈবলিনীর সম্পর্কের তুলনামূলক আলোচনার কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। প্রতাপের চিত্তসংযম অসাধারণ, নরেন্দ্রনাথের চরিত্র অসংযত হৃদয়াবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার শৈবলিনী ও হেমলতা চরিত্রের মধ্যেও

মূলগত পার্থক্য আছে। হাস্য-পরিহাসে, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে, ব্যর্থপ্রেমের হৃদয়োচ্ছ্বাসে শৈবলিনী চরিত্রটি জীবন্ত। শৈবলিনীর তুলনায় হেমলতা অনেক বেশী সংযত। বাইরের দিকে তার কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু দুটি চরিত্রের পরিণতির মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য আছে। শৈবলিনীর চিত্তবৃত্তিকে শোধন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ করে প্রায়শ্চিত্তবিধান করেছেন। তার ফলে শৈবলিনীর মতো বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রটিও এক অপার্থিব জগতের অধিবাসিণী হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্রও অবশ্য মাধবীকঙ্কণ বিসর্জন-কালে হেমলতার মুখ দিয়ে নীতিকথা ও আদর্শবাদের অবতারণা করিয়েছেন, কিন্তু সেখানে সুদীর্ঘ নরকবর্ণনার প্রয়োজন হয়নি। মাধবীকঙ্কণ বিসর্জন-দৃশ্যটির মধ্যে যে শান্ত ও অনুচ্ছসিত মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তা যেন তীব্র দাব-দাহের পর স্নিগ্ধ শান্তিবারি বর্ষণ। ঔপন্যাসিকের বাহুল্যবর্জিত অনাড়ম্বর ভঙ্গিটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসে জেলেখার জ্বালাময় জীবন ও মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও কবিত্বময়। মোগল হারেমের ঐশ্বর্যবিলাসমণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে এই তাতার-তরুণীর প্রণয়-ব্যর্থতার কাহিনী নীলোজ্জ্বল বেদনার শিখায় উদ্ভাসিত। মোগল হারেমের রোমান্সের সঙ্গে এই কাহিনী যুক্ত হয়ে অতীত যুগের পটভূমি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জেলেখার অগ্নিগর্ভ হৃদয়াবেগ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের মতো সমালোচকেরও বায়রনের অমর কাব্যাংশটি মনে পড়বে :

> The cold in clime are cold in blood,
> Their love doth scarce deserve the name,
> But mine was like the lava flood,
> That boils in Etna's breast flame.

রমেশচন্দ্র জেলেখা চরিত্রটিকে অনেকটা ছায়ারূপিণী করে সৃষ্টি করেছেন। নরেন্দ্রনাথের অস্ফুট স্মৃতিলোকে এই প্রণয়-বঞ্চিতা তাতার তরুণীর অস্পষ্ট পদধ্বনি একটি করুণ মর্মর জাগিয়ে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ উপন্যাসের দরিয়া চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। কিন্তু দরিয়া চরিত্রটি স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত, তার ব্যক্তিত্বও সুপরিস্ফুট। তার ঈর্ষাদগ্ধ প্রণয়জর্জরিত হৃদয় শেষে

এক আদিম ও আত্মঘাতী বহ্ন্যুৎসবে মত্ত হয়েছে—মবারকের সঙ্গে সে একই আগুনে দগ্ধ হয়েছে। জেলেখা মোগল হারেম থেকে ছায়ার মতো নরেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছে—ব্যর্থপ্রেম তাকে করেছে আত্মঘাতী। দরিয়ার মতো জেলেখা কাহিনীর সূর্যালোকিত পুরোভাগে আসতে পারেনি। দরিয়া আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত, জেলেখা সায়াহ্ন সমীরণের বিষণ্ণ নিশ্বাস। রমেশচন্দ্র জেলেখা চরিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার জন্য 'The Slave girl of Agra' নাম দিয়ে উপন্যাসটির অনুবাদ করেছিলেন।

৩

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতায় রমেশচন্দ্রের বিদায়-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছে :

"I remember the solitary evenings when I was encamped in the midst of the rice-fields of Dakhin Shahbazpur, a sea-washed island in the mouth of the Ganges, when I read Grant Duff's inspiring work on the history of the Mahrattas, and spent my nights in dreaming over a story of Sivaji. I remember the days when I travelled over Trippera and occasionally crossed over to Hill Trippera, with Tod's spirited 'History of Rajasthan' in my knapsack, and when I ventured to compose a story of Pratap Sinha."

রমেশচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে মারাঠা ও রাজপুত ইতিহাসের প্রতি যে সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাই এক সময় তাঁকে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' রচনায় প্রণোদিত করেছিল। এই উপন্যাসদ্বয়ে রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি ধরেছেন। পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান গৌণ : ইতিহাস বহির্ভূত নর-নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে ইতিহাসের রঙীন মশালের আলোয় রঞ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'য় ইতিহাস সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। শিবাজীর নেতৃত্বে

মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থান ও জীবনের বীরত্বমণ্ডিত দুঃসাহসিক মুহূর্ত এত বেগবহুল যে, ব্যক্তিহৃদয়ের স্পন্দনগুলি সেখানে লুপ্ত হয়েছে। 'জীবন-সন্ধ্যা'-তেও তাই;—রাজপুতজাতির অদম্য দেশপ্রেম, বজ্রকঠোর সঙ্কল্প, রাজপুত বীরাঙ্গনার আত্মাহুতির জ্বলন্ত ইতিহাস যে ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরব কাহিনীর সৃষ্টি করেছে, তার আড়ালে পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিচরিত্র ঢাকা পড়েছে। দুখানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সমগ্রভাবে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের দুটি সংঘাত-সঙ্কুল ইতিহাসেরই তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন।

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' উপন্যাসে শিবাজীর অধিনায়কত্বে মহারাষ্ট্র জাতি কিরূপে গৌরবের চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল, তারই সর্বজনবিদিত কাহিনী অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্যসন্নিবেশে, ব্যাপক যুগচিত্রণে ও ঐতিহাসিক যাথার্থ্যে 'জীবন-প্রভাত' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম পরিচ্ছেদেই রমেশচন্দ্র নিপুণ ঐতিহাসিকের মতো মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ থেকে যাদবরাও ভোঁসলা বংশের বৈবাহিক সূত্রের উল্লেখ করে শিবাজীর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনাই নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা ও রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিহাসকেও তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রীর ছদ্মবেশে সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, রাত্রির অন্ধকারে পুনার রাজপথে চাঁদখাঁকে হত্যা, অতর্কিতে সায়েস্তা খাঁর গৃহ আক্রমণ, রুদ্রমণ্ডল দুর্গজয়, দিল্লী থেকে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রভৃতি শিবাজীর জীবনের কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অধ্যায় ঔপন্যাসিক সজীব ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছেন। শিবাজীর চরিত্রটি নির্বাচিত কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' উপন্যাসে শিবাজীর জীবনের চার বছরের (১৬৬৩-৬৭) ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ইতিহাস-অংশের সঙ্গে রঘুনাথজী হাবিলদার ও চন্দ্ররাও জুমলাদারের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। শেষোক্ত কাহিনী কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু ঐতিহাসিক কাহিনীর বিস্তৃতি ও প্রবলতা অনেক বেশী। রঘুনাথ-সরযূর প্রণয়কাহিনীটি যেন বৃহত্তর ইতিহাসের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে আসন গ্রহণ করেছে। চন্দ্ররাওয়ের পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ঐ একই মন্তব্য করা যায়। ইতিহাসের প্রবল

ঘূর্ণ্যাবেগে পারিবারিক জীবন সামান্য তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গিয়েছে, এক শিবাজী ছাড়া কোনো চরিত্রই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হতে পারেনি—তারা যেন ইতিহাসের হাতের পুতুল মাত্র। এমন কি রঘুনাথজী হাবিলদার গর্জন-মুখর বিশাল ইতিহাস-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ, তার চরিত্রের যেমন কোনো নিজস্ব রূপ নেই, তেমনি নেই অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য।

তবু 'জীবন-প্রভাতে' চরিত্র-চিত্রণের যে সামান্য চেষ্টা আছে, তার মূল্য কম নয়। কিন্তু 'জীবন-সন্ধ্যা'য় ব্যক্তিচরিত্র বিকাশের সামান্যতম প্রচেষ্টাও নেই। এখানে রমেশচন্দ্র শুধু একটি দেশ-কালকে নিপুণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন—একটি জাতীয়-জীবনের গরিমাদীপ্ত পতনের বর্ণনাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। টডের রাজস্থান কাহিনীকে অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র সরল, সত্যনিষ্ঠ ও বাহুল্যবর্জিত আখ্যায়িকায় ভারত-ইতিহাসের এক কীর্তি-মুখর কাহিনীকেই আরতি করেছেন। আহেরিয়া উৎসব, রাঠোর চন্দাবতের বংশগত বিরোধ, সূর্যমহল দুর্গের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বীরত্বমণ্ডিত দুঃসাহসিক কাহিনীগুলি প্রতাপসিংহের দুর্জয় ও সংগ্রামশীল জীবনেতিহাসের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে রাজপুত জাতীয়-জীবনের একটি বৃহত্তর পরিধি রচনা করেছে। এখানে প্রতাপসিংহ ব্যক্তি নন, সংগ্রামশীল জাতীয় জীবনেরই উজ্জ্বলতম প্রতীক। চারণকবির বিস্মৃত ছন্দটিকে যেন লেখক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আতিশয্যবর্জিত সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এর দুর্বলতা সুপ্রকট। তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীর বিরহ-মিলনকাহিনী প্রাণহীন কয়েকটি চিত্র মাত্র। এই উপকাহিনীটি উপন্যাসের পক্ষে মোটেই অনিবার্য নয়, বাদ দিলেও উপন্যাসের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। রাঠোর-চন্দাবতের বিরোধ লগ্নে ও প্রতাপসিংহের নেতৃত্বে রাজপুত জাতীয়-জীবনে চূড়ান্ত সঙ্কটকালে যে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, দুর্জয়সিংহ ও তেজসিংহ তারই দুটি বহ্নিকণিকা মাত্র। তাদের অন্তর্জীবন দু একটি স্থূল রেখাঙ্কনেও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। ভীল বালিকাটির ব্যর্থপ্রেমের কাহিনীটিও ছায়া-শরীরী, উপন্যাসের মধ্যে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি। 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা'

—এই দুটি উপন্যাসের সার্থকতা ও ব্যর্থতা একজাতীয়। তবে প্রথমোক্ত উপন্যাসটি শেষোক্ত উপন্যাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

অবশ্য ইতিহাস-অংশ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়, কিন্তু উপন্যাস-অংশ তেমনি দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথ চক্রতলে যদি একটি মানব হৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও, রথের চূড়া যে-গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথ এখানে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতিটি উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

রমেশচন্দ্র তাঁর শেষ দুটি উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবকে সমন্বিত করতে পারেন নি। ইতিহাসের মহিমান্বিত গৌরব এখানে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে, অপরপক্ষে মানবজীবনের সামান্যতম বিশ্লেষণও এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য সে যুগের উপন্যাসে হৃদয়বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করে নি। স্কট, লিটন, ডুমা প্রমুখ ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনাবহুলতা ও ঘটনাবৈচিত্র্যের তুলনায় মানবহৃদয় বিশ্লেষণকে নিতান্ত প্রাথমিক ধরণের বলা যায়। শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসে কেন, উপন্যাসের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও সে যুগে ঘোরালো ও ঘটনাবহুল প্লটের প্রতি ঔপন্যাসিকদের একটি মোহ ছিল। উনিশ শতকীয় বাংলা উপন্যাসেও এই ধারার ব্যতিক্রম ঘটেনি তাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে হৃদয়বিশ্লেষণের যে স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়, তাকে সে যুগের বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পটভূমিকাতেই বিচার করার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, রমেশচন্দ্রের স্বপক্ষে আর একটি কথাও বলার আছে। 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' যে জাতীয় উপন্যাস, সেখানে মানুষের অন্তর্জীবন বিশ্লেষণের অবকাশ কম। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির জাগরণের কাহিনী ও

প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহের সময়ে রাজপুত জাতির পতনের কাহিনী—দুটি বিশাল যুগ-জীবনের উদ্বেলিত ইতিহাস। এখানকার চরিত্রগুলিও সৈনিক—যুদ্ধক্ষেত্রে বা আসন্ন জাতীয় সঙ্কটকালে তাদের আত্মচিন্তার অবকাশ কোথায়? বহির্ঘটনার প্রবল প্রবাহে অন্তর্জীবনের সূক্ষ্মতর ভাবগুলি পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পায় নি।

কিন্তু রমেশচন্দ্র শেষ দুটি উপন্যাসে ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের দিকেই অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাই এক এক সময় এ কথাও মনে হয় যে, এর চেয়ে তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞান আর একটু কম হলেও ক্ষতি ছিল না। রমেশচন্দ্র ইতিহাসকেই উপন্যাসের ঢঙে লেখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে গেলে যে কল্পনাশক্তি থাকার প্রয়োজন, রমেশচন্দ্রের তার অভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এইখানেই বড়ো পার্থক্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজীব ও রাজসিংহের কুটিল সংঘাত যে বৃহত্তর রাজনৈতিক আকাশকে বজ্রবিদ্যুতের প্রলয়াগ্নি শিখায় রঞ্জিত করে তুলেছিল, তার সঙ্গে সম্রাটনন্দিনী জেবউন্নিসার রক্তরঙীন হৃদয়বেদনা সমন্বিত হয়ে ইতিহাস ও মানবজীবনকে এক গভীর অর্থগৌরবে মণ্ডিত করেছে। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞান ছিল গভীর, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি ইতিহাসের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের বৃহত্তর জীবনাবেগের সঙ্গে পারিবারিক জীবনকে গ্রথিত করে তাকে একটি বিশালতা দিয়েছেন। লরেন্স ফস্টরের তরণী বেদগ্রামের নিস্তরঙ্গ ও ঘটনাবিরল সমাজ জীবন থেকে ব্রাহ্মণবধূ শৈবলিনীকে উন্মূলিত করে ইতিহাসের সফেন ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছে, মোবারক-জেবউন্নিসার বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে ইতিহাসের ঘনঘটাচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এক 'মাধবীকঙ্কণ' ছাড়া অন্যত্র রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেন নি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস, উপন্যাসেরই বিশেষ শ্রেণীমাত্র—ইতিহাস নয়। তাই এখানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ঔপন্যাসিকের প্রতিভা। কিন্তু ঔপন্যাসিক-কলাকৌশলের কণ্ঠরোধ করে যেখানে ইতিহাস-গবেষক স্বপ্রধান হয়ে ওঠেন, সেখানে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হওয়া সম্ভব নয়। রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে মানবজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে গ্রথিত করে তাকে কল্পনার

উত্তাপে বিগলিত করে একটি সামগ্রিক শিল্পরূপ দিতে পারেন নি। তাঁর শিল্প-সামর্থ্য ও কল্পনাদৃষ্টি তেমন গভীর ও প্রখর ছিল না। তাই 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যায়' চিত্রের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু চরিত্র নেই।

রমেশচন্দ্র দুখানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন—'সংসার' (১৮৮৫) ও 'সমাজ' (১৮৯৪)। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান আছে। এই কয়েক বছরের মধ্যেই রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তির স্বাক্ষর আছে। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ (১৮৮৫-৮৭) ও 'হিন্দুশাস্ত্রের' সঙ্কলন ও অনুবাদ (১৮৯৩-৯৭) সম্ভবত রমেশচন্দ্রের মনোজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দুখানি সামাজিক উপন্যাস রচনার পর তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন:

"On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage, etc) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I can not tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels, "Sansar" goes in for widow marriage, and "Samaj",···goes in for inter-caste marriage."

দুখানি সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কোলাহলমুখর ঘটনাবহুল ইতিহাস থেকে তাঁর দৃষ্টি নেমে এসেছে পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের মধ্যে। মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের রোমাঞ্চকর ও বর্ণদীপ্ত ঘটনার ছবি যিনি বিশ্বস্তভাবে এঁকেছেন, তাঁর পক্ষে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার পল্লীসমাজের এমন অন্তরঙ্গ ছবি আঁকা কেমন করে সম্ভব হলো, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে দীর্ঘকালব্যাপী হাত পাকানোর পর, সামাজিক জীবনের সুখদুঃখের ছবি এত মর্মস্পর্শী করে আঁকা সহজ ব্যাপার নয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনায় কোথায়ও

ঐতিহাসিক উপন্যাসের টেকনিক ব্যবহার করেন নি। সামাজিক উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নিপুণ প্রয়োগ এখানে অনুপস্থিত। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনার কলাকৌশলও এমন কিছু নয়, যা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কলাকৌশল-বর্জিত সহজ সুরে তিনি অনেক সময় মর্মের গভীরে প্রবেশ করেন। কড়া রঙ ও চড়া সুর এখানে অনুপস্থিত, কিন্তু সে যুগের সামাজিক উপন্যাস নামাঙ্কিত অধিকাংশ উপন্যাসেই যেমন অস্বাভাবিক ও অতিনাটকীয় ঘটনার ছড়াছড়ি, রমেশচন্দ্রের উপন্যাস সে ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে তাই ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পড়েছে ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের কথা।

'সংসার' উপন্যাসটির প্রথমাংশের ঘটনাস্থল কাটোয়ার অন্তর্গত তালপুকুর গ্রাম, কিন্তু বাকি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনার পটভূমি কলকাতা। রমেশচন্দ্র একশো বছর আগের বাংলাদেশের পল্লী ও নাগরিক সমাজের মনোরম ছবি এঁকেছেন। ছবিগুলি বর্ণঘন তৈলচিত্র নয়, কয়েকটি লঘুস্পর্শ তুলির আঁচড়ে আঁকা রেখাচিত্র মাত্র। কিন্তু দুটি দুর্লভ গুণের জন্য এই বাহুল্যবর্জিত রেখাচিত্রগুলিও শিল্প-সাফল্যে মণ্ডিত হয়েছে। এই দুটি গুণ হলো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও গভীর সহানুভূতি। হেমচন্দ্র ও বিন্দুর অনাড়ম্বর গার্হস্থ্যজীবনের ছবি স্নিগ্ধতায় ও সরসতায় সমুজ্জ্বল—কোনো বাড়াবাড়ি নেই, যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সহজ। সনাতন কৈবর্ত ও তার স্থূলাঙ্গী মুখরা গৃহিণীর চরিত্র স্বল্পপ্রসারিত হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সনাতন-গৃহিণীর আপাত-রুক্ষচরিত্রের অন্তরালে স্নেহনির্ঝরিণীর যে স্বচ্ছপ্রবাহ আছে, তার অন্তরঙ্গতা মর্মস্পর্শ করে। তারিণী বাবুর বৈষয়িকবুদ্ধি ও সুচতুর কথোপকথনভঙ্গি তাঁর চরিত্রকে নিপুণরেখায় ফুটিয়ে তুলেছে। তারিণীবাবুর গৃহিণীও স্বল্পরেখায় চরিত্রবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। নিজের সৌভাগ্যকাহিনীকে তিনি যখন রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকেন, তখন আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না। হেমচন্দ্র একবার তারিণী-গৃহিণীর পাল্লায় পড়ে যে কেমন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তা যেমন কৌতুককর, তেমনি উপভোগ্য :

"কতক্ষণ পর্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিকবাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুরের ধনশ্বরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব, এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেইদিন স্বায়ংকালে শুনিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে এই পর্যন্ত জানি যে, ক্ষণেক পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটি একটু একটু মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই 'তা বটেই ত,' 'তা বৈ কি' ইত্যাদি শ্বাশুড়ীর সন্তোষজনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন।" [পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বড়মানুষের কথা]

বিন্দু, কালীতারা ও উমা—তিন বান্ধবীর বিবাহিত জীবনের পার্থক্যকে নিপুণরেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ধনবান ঘরের বধূ উমাতারার চরিত্রটির উপরে যেন তাঁর ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ম্লান ছায়া পড়েছে। উমা বলেছে : 'বিন্দু দিদি. এই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হলেই যদি সুখী হত, তবে পৃথিবীতে আর কিছুর অভাব থাকত না।' বলাবাহুল্য, উমার এই উক্তিটি নিয়তির অট্টহাসির মতো শোনায়।

তালপুকুর-কাহিনীর তুলনায় কলকাতার কাহিনী দীর্ঘ হলেও নিষ্প্রভ। কলকাতার তৎকালীন সমাজ জীবন ও কয়েকটি নূতন চরিত্রের সঙ্গে এখানে পরিচয় ঘটে। একাদশ পরিচ্ছেদে (কলকাতা বড়বাজার) কলকাতার বৃহত্তর সমাজ জীবনকে বড়বাজারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। এই রূপকাত্মক চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের অনুরূপ বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দেবীপ্রসন্নবাবুর গৃহিণীর তিক্ত স্বভাব ও গর্বোদ্ধত চরিত্রটি নিপুণ-রেখায় অঙ্কিত। ষোড়শ পরিচ্ছেদে সপার্ষদ ধনঞ্জয়বাবুর যে স্থূলরুচি ও বিলাসব্যসনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তা কলকাতার তৎকালীন সমাজের একটি অন্ধকারময় দিক। সে যুগের অনেক লেখক এই নারকীয় কলকাতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

'সংসার' উপন্যাসের শেষ কয়েকটি পরিচ্ছেদ সামাজিক তর্ক-বিতর্কে পরিপূর্ণ। শরৎ-সুধার বিবাহের ব্যাপার নিয়ে সামাজিক জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। হিন্দুধর্মসংরক্ষক দিগ্‌গজ ঠাকুরের ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রটি সবচেয়ে সরস ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে : "দিগ্‌গজ

ঠাকুর ভবানীপুরের মধ্যে হিন্দুধর্মের একটি আকটর্লনী মনুমেণ্ট, ধর্মশাস্ত্রের একটি পেসিফিক সমুদ্র, বিদ্যায় একটি শুণ্ডধারী দিগ্‌গজ, তর্কে বন্য-বরাহ অবতার।" হিন্দুধর্ম সংরক্ষকদের কপটাচার ও ভণ্ডামিকে তিনি তীব্রভাবে কশাঘাত করেছেন। এঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কেও কটূক্তি করতে ছাড়েন নি। যাঁরা বিধবাবিবাহকে সমর্থন করতেন, তাঁদের মতামতও এখানে বর্ণিত হয়েছে। শরতের গুরুদেব বিদ্যাসাগরকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন।

রমেশচন্দ্র তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য মুক্তকণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণ স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতকে তিনি সমর্থন করেন নি। 'সংসার' উপন্যাসে 'বিষবৃক্ষের' প্রসঙ্গ আছে। সুধাকে বিষবৃক্ষ পড়তে দেখে বিন্দু তাকে নিষেধ করেছে। বিষবৃক্ষের পরিণাম সম্পর্কে সুধাকে সে বলেছে : "গল্প আর কি. নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ হইল, কিন্তু তাহাতে সুখ হইল না, কুন্দ শেষে বিষ খাইয়া মরিল"। (ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ) রমেশচন্দ্র তাঁর অগ্রজ সাহিত্যিকের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন নি—মিলনান্ত পরিণতিতে তিনি তাঁর উপন্যাসটি শেষ করেছেন। উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে শরৎ-সুধার নববিবাহিত জীবনের একটি সুখ-পরিতৃপ্ত ছবি আছে।

'সংসার' উপন্যাসের শেষদিকে প্রচারধর্মিতার আভাস থাকলেও উপন্যাসের শিল্পধর্মকে তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি, কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস 'সমাজ' রমেশচন্দ্রের উগ্র প্রচারধর্মিতার পরিচয় দেয়। পূর্ববর্তী উপন্যাসের তালপুকুর গ্রামের সামাজিক কাহিনীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তীগ্রাম সনাতনবাটির জমিদারবংশের এক রহস্যময় কাহিনী যোগ করেছেন। উপন্যাসের প্রথমাংশটি পূর্ববর্তী উপন্যাসের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। তারিণীবাবুর পুনর্বিবাহ ব্যাপার যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি করে, তাঁর প্রথমা স্ত্রীর পরিণতিটি তেমনি বেদনায় বিহ্বল করে। তারিণীবাবুর বালিকাবধূ গোপবালার ক্ষমতালিপ্সার চিত্রটি অত্যন্ত কৌতুককর। সনাতনবাটির কাহিনী বর্ণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে এগারটি পরিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে সরসতা ও স্বাভাবিকত্বের অভাব নেই।

বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে তালপুকুর ও কলকাতা—পল্লী ও নগর দুদিকের ছবিই তিনি এঁকেছিলেন, কিন্তু অসবর্ণবিবাহ প্রতিপন্ন করার জন্য সনাতনবাটির জমিদার-পরিবারের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস যুক্ত করেছেন।

রমাপ্রসাদ সরস্বতীর আবির্ভাব যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অসঙ্গত প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষার দ্বারা হিন্দুসমাজের কুপ্রথা দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে এক পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিবাহ করেন। উপন্যাসের শেষদিকে অসবর্ণবিবাহকে সিদ্ধ করার জন্য যেন সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র দলবদ্ধ হয়েছে। বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্কের প্রাবল্যে লেখকের প্রচারধর্মিতাই উগ্র হয়ে উঠেছে। 'সমাজ' উপন্যাসের শেষদিকে রমেশচন্দ্রের সংস্কারবৃত্তির আগ্রহ উৎকট হয়ে শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছে। রমাপ্রসাদ সরস্বতীর এক একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। দ্বিতীয়ত, সনাতনবাটির জমিদার-পরিবার ঘিরে যে সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানেও ঔপন্যাসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। পূর্ববর্তী উপন্যাসে রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসের টেকনিক্ সার্থকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে আকস্মিক ও অতি-নাটকীয় ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন।

সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ তেমন তীক্ষ্ণ না হলেও, শান্ত মৃদু বর্ণবিরল কয়েকটি তূলির আঁচড়ে তিনি সমাজ জীবনের যে ছবি এঁকেছেন, তার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও গভীর সহানুভূতি রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসকে এক বিরল সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস রচনায় তিনি শরৎচন্দ্রের মতো Critical ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাস রচনায় যে বিশ্লেষণশক্তি ও মানবজীবন-রহস্যজিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়েছেন, রমেশচন্দ্র তা কোনোদিনও আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যেটুকু শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্য অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠায়, সমাজজীবনের সমবেদনাপূর্ণ পর্যবেক্ষণদক্ষ চিত্রণে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'মাধবীকঙ্কণ'-এ তিনি ইতিহাস ও মানবজীবনকে সমন্বয় করে প্রণয়জ্বালার যে কাহিনী রচনা করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সৃষ্টিগুলির তুলনায় তা মোটেই ম্লান নয়।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের ভাবগত পার্থক্যের সবচেয়ে বড় কথা বোধ হয় বিষয় ও ব্যক্তির সম্পর্ক-নির্ণয়ের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। প্রাচীন সাহিত্যের ব্যক্তিবিলোপী বিষয়মুখীনতা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ বললেই হয়। ব্যক্তি সেখানে অনুপস্থিত. অথচ বিষয়ের গরিমা ও সর্বব্ধর অখণ্ডতা বিস্ময়কর মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেশ-কালের ইতিহাস রচনা করা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হত। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই সব রচনায় রচয়িতার ব্যক্তিজীবনের ভাললাগা মন্দলাগা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু একালের কথা স্বতন্ত্র—ব্যক্তিজীবনের একান্ত উদ্ঘাটন ও রচয়িতার উষ্ণ সান্নিধ্য সব শ্রেণীর সাহিত্যেই অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। জীবনী, আত্মজীবনী, ডায়েরি, স্মৃতিচিত্র, চিঠিপত্র প্রভৃতি আত্মোদ্ঘাটনের বহুতর মাধ্যম আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হয়েছে। য়ুরোপ এ বিষয়ে অগ্রণী—দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও অনুশীলনে য়ুরোপ চিঠিপত্রকেও অপরূপ সাহিত্যিক মর্যাদা ও কৌলীন্য দিতে সক্ষম হয়েছে। যে কোনো প্রকারের চিঠিপত্রই উচ্চতর সাহিত্যের অঙ্গীভূত হতে পারে না। পত্র-লেখকের রচনারীতি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও অন্তরঙ্গ উপস্থিতি অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়কেও অসামান্য করে তোলে। শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্যের মধ্যে যত্নকৃত শিল্পপ্রয়াস, কষ্টকল্পিত হাস্যরস, অযথা তথ্যভারাক্রান্ত দুর্বহ চিন্তা প্রভৃতি বর্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে চিঠি প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখে দেয়, তার উপর কোনো ক্রমেই উঠতে পারে না, তার কোনো সাহিত্যিক মর্যাদাই নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রের খুব বেশী সাহিত্যিক মূল্য নেই। তাঁর রচনা বিচারের উপাদান হিসেবে এর যথেষ্ট মূল্য থাকলেও, শুধু চিঠি হিসেবেই এর কোন উচ্চতর রসমূল্য নেই। অথচ মধুসূদনের প্রতিটি চিঠি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত। অনেকে হয়তো খুব বড় সাহিত্যিক নন, এমন কি হয়তো সাহিত্যিকই নন, অথচ তাঁদের চিঠিপত্র জগদ্বিখ্যাত—এমন উদাহরণও পত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে মিলবে।

দীর্ঘকালের অনুশীলনের ফলে য়ুরোপীয় সাহিত্যে চিঠিপত্র একটি স্থান অধিকার করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পত্র-সাহিত্য সাহিত্যিক

কৌলীন্যের অধিকারী। এর অধিকাংশ চিঠিই অভিজাতবংশীয় মহিলাদের রচিত। যে সমাজে তাঁরা চলাফেরা করতেন তার একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর পত্র-রচয়িত্রীদের মধ্যে মাদাম সেভেনি ও মাদাম ডার্বেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের প্রচুরতর অবকাশ ও জীবনযাত্রার মন্থরতা পত্র-সাহিত্যের জন্য সম্ভবতঃ অধিক অনুকূল ছিল। সম্ভবতঃ অপরূপ একটি উত্তরের প্রত্যাশাও পত্রলেখককে অধিকতর উৎসাহিত করেছে। কারণ, 'Those were glorious days when leisure called for the goose-quill and therefore, epistles in the form of essay. Even a young man wasted two sheaves to get a guinea from an old aunt. Ideas required elaboration and style flourished in the process." বৈচিত্র্যে ও আয়তনে পত্র-সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন ভল্টেয়ার—শ্লেষ, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অননুকরণীয় গদ্যরীতিতে ভল্টেয়ারের পত্র-সাহিত্য সমৃদ্ধ।

পাঠ্যপুস্তকগন্ধী হয়েও কুপার ও চেস্টারটনের পত্রাবলীর কতকগুলি বিশেষ মূল্য সাহিত্যজগতে স্বীকৃত হয়েছে। কবি ও সাহিত্যিকদের অনেকেরই চিঠি তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে খুব কমই সাহিত্যিক মর্যাদা পেয়েছে। বায়রন, কীট্‌স্‌, লরেন্স, কাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ড প্রমুখ কয়েকজন কবিসাহিত্যিকের রচনা উচ্চতর সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রাক্‌-রবীন্দ্রযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিকমর্যাদাসম্পন্ন চিঠি প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তীযুগের শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্য-রচয়িতা মধুসূদন—অবশ্য মধুসূদনের সব চিঠিই ইংরেজীতে লেখা। কিন্তু মানুষ মধুসূদন ও কবি মধুসূদনের এমন নিকট সান্নিধ্য মধুসূদনের অন্য কোনো রচনায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরীর পত্র-সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর পত্রাবলীতে গদ্যরীতির ইস্পাত-কঠিন বাঁধুনি ও বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়—বীর সন্ন্যাসীর এক বীর্যদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে তাঁর পত্রাবলী বাংলাসাহিত্যের এক উৎকৃষ্ট সম্পদরূপে পরিগণিত। প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী তাঁর সুকর্ষিত গদ্যরীতি ও বুদ্ধিদীপ্ত আলাপচারণার বাহক। তবু রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য অতুলনীয়। বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক থেকেও এর পরিধি কম নয়। সম্ভবতঃ প্রাচুর্যে তিনি পত্ররচয়িতাদের

মধ্যে ভল্টেয়ারের ঠিক নীচেই। কিন্তু ভল্টেয়ারের সুবিপুল পত্র-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সেই কল্পনাপ্রসার কোথায়? তাঁর অনেকগুলি চিঠি কবি-মানস ও কাব্যজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের অপরূপ ব্যাখ্যা— এই দিক দিয়ে কীট্‌সের পত্রাবলীর মতোই তাঁর পত্র-সাহিত্যের মূল্য। প্রত্যেকটি চিঠির মধ্যেই একটি অপরূপ সৃজনশীল মন আত্মপ্রকাশ করেছে। সামান্য ও অতি-তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পীর রসিকচিত্ত নানা খেয়ালখুশির মালা গেঁথে চলেছে। পত্ররচনাতেও রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ রূপদক্ষ।

২

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পত্র-সংকলন গ্রন্থ। কবির পত্র-সাহিত্যের সর্বপ্রথম সংকলন হলেও নানা কারণে গ্রন্থটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্য আলোচনার পক্ষে এই সংকলনটি অপরিহার্য। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'ছিন্নপত্র'-এর কিয়দংশ মিলে ভিক্টোরীয় যুগের একটি চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে। প্রাক্-মহাযুদ্ধ উনিশশতকীয় য়ুরোপ আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। একটি তরুণ-মনের ভালোলাগা-মন্দলাগার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্লাড্‌স্টোন-শাসিত ইংলণ্ডের একখানি ঘনিষ্ঠ ছবি। হয়তো য়ুরোপীয় জীবন-প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য আজ যথার্থ বলে বিবেচিত হবে না, হয়তো অনেক জায়গায় দৃষ্টিভঙ্গীও আংশিকতা-দোষদুষ্ট, অনেক জায়গায় আবার অযথা ঝাঁজ বা বক্রোক্তিও যে না আছে এমন নয়; কিন্তু কবির এই প্রথম যুগের পত্র-সংকলনটিতেও এক জাতীয় ঔদার্য চোখে পড়ে—যা একজন সতেরো-আঠারো বছর বয়সের কিশোরের পক্ষে অভাবনীয়।

আর একটি কারণে এই গ্রন্থটি মূল্যবান। কথ্যভাষাকে কতদূর সহজ ও সাবলীল করে তোলা যায় তার প্রমাণ এই পত্র-সংকলনটি—এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রমথ চৌধুরী-পরিচালিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার কথ্যভাষার আন্দোলন এর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরের ঘটনা। পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জিত গদ্যরীতির উদাহরণ হিসেবে এই পত্র-সংকলনটি সম্ভবতঃ বাংলা কথ্যরীতির পথিকৃৎ

হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরবর্তী কালে কবির কথ্যভাষার গদ্যরীতি যদিও অধিকতর শিল্পসমৃদ্ধ ও কারুমণ্ডিত, তবুও এইখান থেকেই যে তার কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। কবি এ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছেন তা সর্বাংশে প্রণিধানযোগ্য—"য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।…আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষায় সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"

'ছিন্নপত্র'-এর প্রথম প্রকাশকাল ১৩১৯ সাল। 'ছিন্নপত্র'-এর রচনাকালের পরিধি দশ বছর বিস্তৃত—১৮৮৫-এর অক্টোবর থেকে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। 'ছিন্নপত্র' শুধু পত্র-সাহিত্যের দিক থেকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ হিসেবেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'সাধনা'-'ভারতী'র যুগের এই পত্রগুচ্ছ স্বাদ-বৈচিত্র্যে সহজ-সাবলীলতায় ও কবিমানসের অপরূপ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার একটি মধ্যমণি। কবি-জীবনের সে এক আশ্চর্য অধ্যায়—সৃষ্টির প্রাচুর্যে, প্রকাশের নূতন নূতন রীতিতে স্বাক্ষরিত; কবিতায়, সঙ্গীতে, ছোটোগল্পে, চিঠিতে, প্রবন্ধে কবি তার সৃষ্টিধারাকে বিচিত্রিত করে তুলেছেন। 'ছিন্নপত্র'-এর সঙ্গে সমকালীন অন্যান্য রচনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। দশ বছরের বিবিধ রচনার মহাভাষ্যকার 'ছিন্নপত্র'-এর রবীন্দ্রনাথ। ভালোলাগা-মন্দলাগার, খেয়াল-খুশির আমেজ অনেকগুলি চিঠিতে একটি অন্তরঙ্গ ব্যক্তিপুরুষকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। তাই এখানেই বলা সম্ভব হয়েছে: "কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সহজ সরল সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে যেন বলতে পারি আমি ধন্য।" 'ছিন্নপত্র'-এর কবি এই সহজ দৃষ্টির অধিকারী। তত্ত্বপ্রিয়তা ও তথ্যবিলাস অতিক্রম করে অপ্রয়োজনের আনন্দ প্রতি চিঠিতেই স্বতোৎসারিত।

'ছিন্নপত্র' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অজিত চক্রবর্তী দুঃখ করেছেন

যে, এই গ্রন্থে কবি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথা কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। কথাটা অবশ্য অযথার্থ নয়, কিন্তু একথাও বলা যায় যে, এইটিই হল পত্ররচয়িতা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি। দৈনন্দিন জীবনের ডায়ারি রচনা করা অথবা 'মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে' তার গোটা অনাবৃত মূর্তি প্রকাশ করা পত্ররচয়িতা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য নয়। বায়রনের চিঠিপত্রে যে-জাতীয় অসংযত আত্মোদ্ঘাটন আছে, রবীন্দ্রনাথের কোনো পত্র-সাহিত্যেই তা নেই। এইখানেই পত্ররচয়িতা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য সংযত ও সাবধানী মনের পরিচয়বাহী। কারণ তাঁর বেশীর ভাগ পত্রে যে ব্যক্তিপুরুষের পরিচয় আছে তিনি শিল্পী ও রসিক। সুতরাং এখানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী অনুসন্ধান করা একপ্রকার ব্যর্থতা—কবি নিজেই বলেন —"কবিরে পাবে না তাঁহার জীবন-চরিতে"। কিন্তু 'ছিন্নপত্র'-পাঠকের সে খেদ না থাকাই উচিত—কারণ কবি এখানে তাঁর শিল্পীজীবনের অনেকখানিই প্রকাশ করেছেন।

যে কালে 'ছিন্নপত্র' রচিত হয়, তখন কবির শিল্পবোধ এক বৃহত্তর সত্যের অভিমুখে চলেছে। জীবনের মধ্যে সত্যের এই গভীর অনুভব 'ছিন্নপত্রের বিভিন্ন চিঠিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—এক মহাশিল্পীর পদসঞ্চার কবি তাঁর অন্তস্থলে অনুভব করেছেন—"আমার জীবনের অন্তস্থলে ক্রমশই যেন একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে; কেবল তার আভাস পাই যে, আমার পক্ষে এক স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাটি সোনাটুকু, আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের তুষের ভিতরকার অমৃত শস্যকণা; সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট করে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রবাহ, সেও একটা পরম লাভ।"—'ছিন্নপত্র'র শেষ দিকের চিঠিগুলিতে রবীন্দ্র-মানসের পট-পরিবর্তনের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে—জীবনের এক প্রগাঢ় সত্যানুভূতি কবিকে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসার প্রান্তসীমায় অগ্রসর করিয়ে দিয়েছে। এই হিসেবে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবি-চরিত।

'ছিন্নপত্র'র সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য কবির নিসর্গ-জিজ্ঞাসা। 'ছিন্নপত্র'র

কবির সম্মুখে এক বিস্তৃত রূপলোক উদ্‌ঘাটিত। আনন্দ-তন্ময় কবি বলেছেন, "যদি বাসনা এবং সাধনা-অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।"—'ছিন্নপত্র'র এক-একটি চিঠি যেন এক একটি স্বভাবোক্তির কবিতা। ১৮৯৫-এর ১৬ই ডিসেম্বরের একটি চিঠিতে এক অপরূপ সন্ধ্যার বর্ণনা আছে: "কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌনমুখে, শান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে।"—বর্ণনাটির মধ্যে সন্ধ্যার সমস্ত ক্লান্তি ও কবিচিত্তের নির্জন একাকিত্ব একটি স্বপ্নমুগ্ধ রূপ-লোকের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই জাতীয় চিঠি কবিমনের এক একটি 'মুড'-কে আশ্রয় করেই উদ্ভাসিত—সেইজন্যই সম্ভবতঃ গীতিকবিতারও জন্মলক্ষণ-গুলির সঙ্গে এই পত্রাংশগুলি নিবিড়ভাবে সম্পর্কান্বিত। 'ছিন্নপত্র'র নিসর্গানুভূতির আর একটি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই রীতিকে বলা যেতে পারে চিত্ররীতি—এখানে তৈলচিত্র ও রেখাচিত্র—এই দুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। 'ছিন্নপত্র'র কেন্দ্রীয় আকর্ষণ পদ্মা ও পদ্মালালিত জনপদ-জীবনের চিত্র। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র অনেকগুলি প্রকৃতি-কবিতার যথার্থ টীকাকার কবির এই সমস্ত চিঠি। 'গল্পগুচ্ছ'র অনেকগুলি গল্পের পটভূমিকাও এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রপত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে 'ছিন্নপত্র'তেই সর্বপ্রথম অন্তর্গূঢ় ও স্মৃতিচারী একটি মুগ্ধমন ধরা পড়েছে।—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই একান্ত সান্নিধ্য ব্যতীত সেই মনটি হয়তো ধরা পড়ত না। কবি নিজেই বলেছেন: "এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গুপ্ত, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে।"—এইসব নির্জন মুহূর্তে কবির অন্তরঙ্গ সঙ্গী

জুটেছে এমিয়েলের জার্নাল—কবির স্বীকৃতি: "এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি।"—'ছিন্নপত্র'র চিঠিগুলিও অনেকটা জার্নালধর্মী। মুক্ত প্রকৃতি, নীলাকাশের অসীম বিস্তৃতি ও আত্মমুগ্ধ ভালোলাগার আবেশে গেঁথে তোলা কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! 'ছিন্নপত্র' তাই দোসরহীন, অনন্য।

৩

'ছিন্নপত্র' মোটামুটিভাবে "সিরিয়াস" এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অখণ্ড এক একটি লিরিক। কবি যে কত লঘু হাল্কা ও ঘরোয়া হতে পারতেন তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'।—এই পত্রগুচ্ছ কবির পরিণত বয়সের রচনা—'মহুয়া' 'বনবাণী' 'তপতী' 'শেষের কবিতা' রচনার প্রায় সমসাময়িক। এখানে গদ্যরীতিও একটি অপূর্ব পরিণতি লাভ করেছে—কবির খেয়াল-খুশি মতো গদ্যরীতির যদৃচ্ছ-ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'ভানুসিংহ' নামটি কবি তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে মাত্র দুবার ব্যবহার করেছেন—একবার এই পত্রাবলী রচনার সময়, আর একবার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনার সময়ে। কিন্তু এই ছদ্মনামটি ব্যবহার করার কারণ দুটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। পঞ্চাশ বছর আগে প্রাচীন রীতিতে কাব্য রচনার ছলে কবি পুরাতন-গন্ধী এই নামটির অন্তরালে আত্মগোপন করতে চেয়েছিলেন—সেদিন এর পেছনে অনেকখানিই ছিল কৌতূহল। কিন্তু প্রৌঢ় কবির কাছে আবার পঞ্চাশ বছর পরে এই নামটি গ্রহণের তাৎপর্য আর কৌতূহল নয়—এবার নিছক কৌতুকবশেই কবি তাঁর কিশোর বয়সের নামটিকে গ্রহণ করেছেন। যার কাছে কবি এই সব চিঠি লিখেছেন সে-ও যে বালিকা, তাই সম্ভবতঃ কবিকে কিশোর বয়সের প্রিয়নামটিকেই স্মরণ করতে হয়েছে।

এই পর্যায়ের চিঠিগুলির প্রসঙ্গে কবি প্রায় দশ বছর পরে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য: "…চিঠির বেশীর ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্য দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বিশেষ কিছু নেই, হাসি-তামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে

সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস, আর তার সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শানবাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।"—এইখানেই 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র সঙ্গে 'ছিন্নপত্র'র প্রভেদ। - 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' একটি চমকপ্রদ পত্রসঙ্কলন—শানবাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তা বর্জিত হলেও শিশু-মনের গহনে প্রৌঢ় কবির সাবলীল-প্রবেশ অত্যন্ত সহজ ও অন্তরঙ্গ। শিশু-মনের গহনে প্রবেশাধিকারের সহজ মন্ত্রটি কবির আয়ত্ত। 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' 'ছেলেবেলা'—প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থটি মিলিয়ে পড়লেই এর সহজ মাধুর্যটুকু উপলব্ধি করা যাবে। চিঠিগুলিতে এক সকৌতুক স্নেহের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কথ্যভাষা অতি সরল আলাপচারণায় বিন্যস্ত—শিশুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গিয়ে কবি যেন ক্ষণিকের জন্য তাঁর হারানো শৈশব খুঁজে পেয়েছেন। কৌতুক-পরিহাসে কবি যে কতখানি কাছের মানুষ তার প্রমাণ সঙ্কলনটির পাতায় পাতায়: "আজ তোমার চিঠি পেতে দেরী হল দেখে ভাবলুম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেছে কিংবা হাওয়া জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছ। কিংবা হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নীচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করছ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সর্দি হয়েছে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েছ।"—পত্রাংশটুকুতে যে প্রবল হাস্যবেগ অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তার মধ্য থেকেই কবির খেয়াল-খুশি ও মেজাজ অতি সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে যে বালিকাটির কাছে চিঠি লেখা হয়েছে তাকেও তার বয়সের তুলনায় অসাধারণ বলতে হবে। তার কারণ কবির অনেকগুলি রচনা সম্পর্কে সে কতকগুলি মন্তব্য করেছে—মন্তব্যগুলি আবার কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব! কবিও এই বালিকার প্রত্যেকটি সমালোচনা প্রসঙ্গে যতদূর সম্ভব উত্তর দিয়ে চলেছেন—সহজ ভাষায় কবির এই উত্তরগুলি যেমন মসৃণ, তেমনি সুকুমার—কবি অদ্ভুতভাবে ছেলেভোলানোর খেলা

খেলেছেন :—"কবিশেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল। ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্য আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।"—গল্পের সমাধানটুকু শোনার জন্য শিশুর চির-আকাঙ্ক্ষা—গল্পের সুস্পষ্ট উপসংহার সে শুনবেই। তার হাত এড়াতে এমন সব উত্তর ফাঁদতে হবে, যার পরে সে আর কিছু প্রশ্ন করতে না পারে। রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে এই সব সম্ভব অসম্ভব নানা কথার অবতারণা করেছেন—শিশুর সঙ্গে কবিও খুশীমনে বকেই চলেছেন—অথচ কী অপরূপ সেই বকুনি! বালিকার সঙ্গে কথার লুকোচুরি খেলতে বসে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কবিও তাঁর বালক বয়স ফিরে পেয়েছেন যেন!

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র কৌতুক-পরিহাসের সুর ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কবির ভালোলাগায় আবিষ্ট মন আত্মপ্রকাশ করে—এই সব চিঠি 'ছিন্নপত্র'র সুরের সঙ্গে মেলানো। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে কবি যখন তাঁর মনের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন তখনই তার প্রকাশ যথার্থ লিরিকধর্মী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও 'ছিন্নপত্র'র তুলনায় এর প্রকাশরীতি অনেকখানি বাহুল্য-বর্জিত। আপন মনের নিগূঢ় রস-সঞ্চারে 'ছিন্নপত্র'র গদ্যরীতি ভাব-গম্ভীর ও রস-মন্থর, কিন্তু 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র গদ্যরীতিতে সদা-জাগ্রত চলতাধর্মিতা একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য—এই রীতি যেন বেশীক্ষণ আবিষ্ট থাকতে দেয় না। মনে হয় ভাবুক ভানুদাদাটি নিজের স্বপ্নমোহে আচ্ছন্ন হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেন না, কিশোরী নাতনীটি সম্ভব-অসম্ভব নানা বকুনিতে তাঁর তপোভঙ্গ করে। তথাপি এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে কবির স্বপ্নাবিষ্ট মন ভালোলাগার মন্ত্রে তন্ময় :—"নদী আমি বড়ো ভালোবাসি ; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।"—

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'কে একজন সমালোচক "মস্‌লিনের" সঙ্গে তুলনা করেছেন: "A shot muslin again, if that were possible, for colours chase each other with every change in the lightfall. No, these letters are not trifles. They are only the god's play at the foot of Olympus on beds of asphodel."

দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীর নিকট লিখিত পত্রাবলীর সঙ্গে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র একটি নিকট সম্পর্ক আছে। সকৌতুক স্নেহ উভয়েই লক্ষণীয়। কিন্তু দৌহিত্রী এবং পৌত্রীর নিকট লিখিত পত্রাবলীতে ('চিঠিপত্র', চতুর্থ খণ্ড) ঘরোয়া সুরটি আরো বেশী চোখে পড়েছে—আত্মীয়-স্বজন-পরিজন প্রসঙ্গও বাদ পড়ে নি। অত্যন্ত কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে এই শ্রেণীর চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়। নন্দিতা দেবীকে লিখিত চিঠির সম্বোধনগুলি পর্যন্ত কৌতুকরসপূর্ণ—কবির মেজাজ এখানে একেবারেই হাল্কা। রবীন্দ্রনাথের বহু স্মরণীয় পরিহাস এই পত্রগুচ্ছে সঙ্কলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একখানা চিঠি কবি উপসংহার করেছেন বিচিত্র ভঙ্গীতে: "শীত রীতিমত জমেচে। পিঠের উপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠেছে। ধোবার গাধার যে কি দুঃখ তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।" নন্দিতা দেবীর ম্যাট্রিক পাসের খবর পেয়ে কবি যে চিঠি লিখেছেন তা আগাগোড়া কৌতুকরসে পূর্ণ: "গতকল্য অপরাহ্ণে চারু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা চিরকুট এসে পৌঁছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষা-খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিতচক্ষু মাস্টার মহাশয়ের জয়জয়কার। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করেছি তার শরণাগত হব, অন্তত ম্যাট্রিকটাও কোনো মতে যদি তরে যেতে পারি।" নন্দিনীর কাছে লেখা চিঠিতে কবি আরও ছেলেমানুষ—কারণ যাকে উদ্দেশ করে লেখা সে যে নেহাত শিশু—তাই কোনো রকম বয়স্ক বুদ্ধির কথা এখানে একেবারেই নেই: "আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেছে।...পালাতে যদি পারতুম তো খুশী হতুম। তোমার পুতুলের বাক্সর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখলে না কেন? তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা

তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দি কাশি আরম্ভ হয়েচে—তাই এই রুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।"—ঘরোয়া রীতির দিক থেকে দৌহিত্রী ও পৌত্রীর কাছে লেখা চিঠি অত্যন্ত উপভোগ্য।

৪

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক চিঠিপত্র এ পর্যন্ত তিনটি সঙ্কলনে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তিনখণ্ডে ('চিঠিপত্র' প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড) সম্ভবতঃ পারিবারিক বা ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছেন। 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ড পত্নীকে লিখিত কবির ছত্রিশখানি চিঠির সঙ্কলন। এই চিঠিগুলির আস্বাদন স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের মধ্যেও অত্যন্ত দুর্লভ। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিমিতি অতিক্রম করে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেশ-কালের অতীত একটি সার্বজনীন আবেদন আছে—সে ক্ষেত্রে কবির গার্হস্থ্য জীবন ও পারিবারিক বন্ধনেরও যে একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে তা এই চিঠিগুলি প্রকাশের পূর্বে লোকচক্ষুর অগোচরেই ছিল। এই পত্রগুচ্ছে স্বামী ও পিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া রূপ ফুটে আছে। য়ুরোপের বিভিন্ন মনীষীর আত্মজীবনী ও পত্রসাহিত্যে স্ত্রীপুত্র-পরিজনপরিবেষ্টিত মূর্তি পাওয়া যায়—অনেক সময় সমালোচকেরা এই সব উপাদান থেকে তাঁদের অন্তর্জীবনও আলোচনা করেছেন। স্ত্রীর কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রিশটি চিঠির দু-একটি ছাড়া কবির সাহিত্যালোচনার উপাদান হিসেবে যে খুব উপযোগী, তা নয়, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ধরার সবচেয়ে বড়ো উপাদান এই চিঠিগুলিতে ছড়িয়ে আছে। চিঠিগুলির কালবিস্তার প্রায় এগারো বারো বছর (১৮৯০-১৯০১), অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের প্রথম ছ-সাত বছর বাদ দিয়ে মোটামুটি স্ত্রীবিয়োগের পূর্ব পর্যন্ত। এর সঙ্গে এই সময়ে লিখিত স্ত্রীর চিঠিগুলিও যদি থাকত তা হলে রবীন্দ্র-জীবনী রচনার পক্ষে একটি মূল্যবান উপাদান হত।

হাসি-পরিহাস, পুত্রকন্যার প্রতি সস্নেহ উদ্বেগ, স্ত্রীকে নানা উপদেশ দেওয়া, নিজেদের ভবিষ্যৎ ও পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা, নব-বিবাহিতা কন্যা

সম্পর্কে অভিজ্ঞ মন্তব্য—কোনো কোনো চিঠি বেশ হাল্কা সুরের, আবার কোনোটি একটু গুরুগম্ভীর ভাবের, পরিবারাশ্রয়ী একটি মানুষের হৃদয়বৃত্তির কত বিচিত্র স্পন্দন! একটি সুন্দর পরিহাসের উদাহরণ প্রথম চিঠিতেই দেখা যায়ঃ "যেম্‌নি গাল দিয়েছি অম্‌নি চিঠির উত্তর এসে উপস্থিত। ভাল-মানুষির কাল নয়। কাকুতিমিনতি করলে অমনি নিজ মূর্তি ধারণ করেন আর দুটো গালমন্দ দিলেই একেবারে জল। একেই তো বলে বাঙ্গাল!"—পিতা রবীন্দ্রনাথের স্নেহদুর্বল মন কয়েকটি চিঠিতে ধরা পড়েছেঃ "বেলি, খোকার জন্যে এক একবার মনটা ভারি অস্থির হয়। বেলিকে আমার নাম করে দুটো 'অড' খেতে দিয়ো। আমি না থাকলে সে বেচারা তো নানারকম জিনিস খেতে পায় না। খোকাকেও কোনোরকম করে মনে করিয়ে দিয়ো।" বাংলাদেশের উত্তরপুরুষ ঋষিকবির নিস্পৃহ শিল্পাচরণের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি দেখতেই অভ্যস্ত—কিন্তু বাংলাদেশের আরো পাঁচজন ছা-পোষা গৃহীর মতো কবিরও যে স্নেহদুর্বল মন ছিল তা বুঝতেও আজ অসুবিধা হয়।

স্ত্রীর কাছে লেখা এই চিঠিগুলিতে প্রথম যৌবনের মোহমদিরতা অথবা অকারণ বিহ্বলতা একেবারে নেই বললেই চলে। একটি পরিপূর্ণ সংসার, পরিতৃপ্ত মন নানাপ্রকার অভিজ্ঞতায় অপ্রমত্ত। এই সমস্ত চিঠিতে 'মহুয়া'র বলিষ্ঠ প্রেমের পূর্বাভাস পাওয়া যায় যেন। ১৮৯৮-এ লেখা একখানা চিঠিতে কবি বলেছেনঃ "স্ত্রী পুরুষের অল্পবয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবন থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গ দোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়, নিজের সংসার-বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশি বাইরে চলে যায়—সেই জন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসেবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধন-গুলি চারদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।"...এই চিঠিখানি সঙ্কলনটির শ্রেষ্ঠ চিঠি। নরনারীর প্রেমজীবনের যে পরিণত মন্তব্য করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাই কবির শিল্প-জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে টুকি-টাকি নানাকথা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতার দায়িত্ব প্রভৃতি অজস্র

কথা কয়েকটি স্মরণীয় চিঠিতে গাঁথা আছে। কয়েকটি চিঠিতে সুস্থ পরিতৃপ্ত পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ কামনার কথাও আছে। কবির জীবন-বিধাতা কবির এই ছোটো কামনাটুকু অল্পদিনের মধ্যেই ভস্মীভূত করলেন—সম্ভবতঃ বৃহত্তর পরিবার কবির প্রতীক্ষায় ছিল।

'চিঠিপত্র'র চতুর্থ খণ্ডে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লেখা চিঠিগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। সন্তানের অসুস্থতার সংবাদে শঙ্কাতুর পিতৃহৃদয়ের পরিচয় অনেক চিঠিতে ফুটে উঠেছে—এমন কি কবির বিচিত্র হোমিওপ্যাথি-চর্চার খবরও অজানা থাকে না। তা ছাড়া আত্মীয়-পরিজনের খুঁটিনাটি খবরে এই সব চিঠি পূর্ণ। ভাষার আতিশয্যহীন পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। পারিবারিক জীবন ও প্রত্যহের খবরাখবরের মাঝখান থেকে মাঝে মাঝে কবি তাঁর জীবনসত্যকে দেখতে পাচ্ছেন। য়ুরোপের কর্মবহুল বেগবান জীবনস্রোত কবিকে নূতন উপলব্ধির সমীপবর্তী করেছে: "দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে—সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে, পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে।... আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্য এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেছেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। দেশের কাজ নয়—তাঁর জগতের কাজ।" সমসাময়িক য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের নানা তথ্য মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়। আবার বিশ্বখ্যাতির অন্তরালে কবির পারিবারিক দায়িত্ব যে চাপা পড়েনি তাও বেশ বোঝা যায়। জীবনে স্বজন-বিয়োগের বেদনা পেয়েছেন কিন্তু সেই বেদনাকে বিশেষ রসে পরিণত করার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল কবির। দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে কবি মীরা দেবীকে যে চিঠি লিখেছেন তা রবীন্দ্রসাহিত্যের এক বিশেষ দিগ্‌দর্শন: "শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই।... সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা

কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।” রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই উপলব্ধির স্বাক্ষর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

‘চিঠিপত্র’ (পঞ্চম খণ্ড) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে লিখিত চিঠিগুলির সঙ্কলন কয়েকখানি চিঠি বাদ দিলে প্রায় সব চিঠিই শেষোক্ত দুজনকে লেখা পারিবারিক চিঠির কিছু স্বাদ থাকলেও এই চিঠি স্ত্রী বা কন্যাদের কাছে লেখা চিঠি থেকে যেন ভিন্নরূপের। কারণ চৌধুরীদম্পতির কাছে লেখা চিঠিতে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সমন্বয় আছে—এর ফলে কবি এখানে পারিবারিক পরিমিতিকে অনেক পরিমাণেই কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। ইন্দিরা দেবীর চিঠিতে কবির বিবিধ রচনা সম্পর্কে মন্তব্য আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা কবির চিঠিগুলির মূল্য আরও বেশী। বাংলা দেশের এই অসাধারণ দম্পতিটি শুধু পারিবারিক সূত্রেই নয়, চিন্তাজগতের দিক থেকেও কবির যে কতখানি সম-প্রাণ ছিলেন, চিঠিগুলি পড়লেই তা বোঝা যাবে। কারণ এঁদের দুজনেরই রুচি ও রসিকতার ওপর ছিল কবির অসাধারণ শ্রদ্ধা। প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা প্রথম যুগের কয়েকটি চিঠিতে ‘ছবি ও গান’, ‘কড়ি ও কোমল’ এবং ‘মানসী’ পর্বের কবির মানস-জীবনের অপরূপ উদ্ঘাটন আছে। একখানি চিঠিতে কবি বলেছেন: “আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনের সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসী গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক আকারে সাকারে জড়িত। একটা Shelly-র ‘Skylark’ আর একটি হচ্চে Wordsworth-এর ‘Skylark’, একজন অনন্ত সুধা পান করচে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করচে।” এই পত্রাংশটিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল সত্য নিহিত আছে। ‘সবুজপত্র’র যুগ রবীন্দ্র-জীবনের পক্ষে একটি মূল্যবান অধ্যায়—এই অধ্যায়ের কবিমানস ও ‘সবুজপত্র’র বহু দরকারী জ্ঞাতব্য তথ্য চিঠিগুলিতে মিলবে।

প্রমথ চৌধুরীর একাধিক রচনা সম্পর্কে কবির সংক্ষিপ্ত অথচ বিদগ্ধ মন্তব্য চিঠিগুলির অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য। ছুটি অসাধারণ মনের অপরিমিত ঐশ্বর্যে চিঠিগুলি সমৃদ্ধ।

৫

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব ভ্রমণকাহিনীই পত্রাকারে রচিত। সুতরাং ভ্রমণকাহিনীগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্র-সাহিত্যের পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু এই পর্যায়ের চিঠিগুলি পত্র-সাহিত্য অপেক্ষা যেন ডায়ারিরই অনেকটা কাছাকাছি। ব্যক্তিগত সুরও এই শ্রেণীর পত্র-সাহিত্যে অত্যন্ত কম। বিদেশী জীবন, তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কবি অপূর্বভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, অথচ অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত করেও তোলেন নি। জীবন-রসিক শিল্পী সমস্তই গ্রহণ করেছেন, নিজের "জারকরসে" তাকে রসায়িত করে তুলেছেন। য়ুরোপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, পারস্য, রাশিয়া— প্রভৃতি দেশের প্রচুর জ্ঞাতব্য তথ্যও আছে, শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবন-সমালোচনাও রয়েছে বিস্তর,—কিন্তু এ দেখা যে সম্পূর্ণ রসদৃষ্টি এ কথা আরও সত্য। পথে ও পথের প্রান্তে' পত্র-সঙ্কলনটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি যখন য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখনকার পথ ও পথের প্রান্তের চলচ্ছবি—চিঠিগুলি শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশকে লেখা। এই সঙ্কলনটিতে চলতি পথের বর্ণনা থাকলেও "কিছুকাল ধরে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশী।"—রবীন্দ্রনাথের পত্রাকারে বিধৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি পড়লে ইংরেজ সমালোচকের আপ্তবাক্যটি খুবই মূল্যবান বলে বোধ হবে—"Ultimately it is probably true that a first rate travel-book depends comparatively little upon strangeness or remoteness of the locality, and much upon the character and vision of the traveller."

'পথে ও পথের প্রান্তে' সঙ্কলনটি ঠিক কোনও বিশেষ দেশভ্রমণের বৃত্তান্ত নয়। চলমান জীবনের যে সমস্ত চলতি ছবি, পথযাত্রার ক্ষীণাভ রেখাটুকু অথবা অর্থগূঢ় চলতি ভাব পত্রগুচ্ছতে ফুটে উঠেছে তার টুকরো রেখাচিত্রণ অবিস্মরণীয়। কবি একখানা চিঠিতে লিখেছেন: "আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে-দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হল না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলেছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর।"—রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক পত্র-সঙ্কলনগুলির সব চেয়ে বড়ো কথা হল এইটি। আত্মোপলব্ধি ও আত্মজিজ্ঞাসার সুর সর্বত্র ছড়ানো আছে—এই সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে চিঠিগুলি মিলিয়ে পড়লেই কবির বিশেষ অভিপ্রায়টি বোঝা যাবে। সন্তোষকুমারের মৃত্যুভাবনার দ্বারা রঞ্জিত তিন চারটি চিঠি মৃত্যু-রহস্য ও জীবন-জিজ্ঞাসার আন্দোলনে স্পন্দিত। সর্বত্রই একটি গভীরাশ্রয়ী মন চিন্তার গ্রন্থিমোচন করে চলেছে। প্রাচীন ঈজিপ্টের ভূগর্ভ-উদ্ভুত স্থাপত্য-কীর্তি, কায়রোর হোটেল, ম্যুজিয়ম, আরবী সাহিত্য, সহযাত্রী জার্মান নৃতত্ত্ববিদ,—প্রভৃতির টুকরো কথার মধ্যে কবির মন্তব্যগুলি গভীরপ্রসারী। ভ্রাম্যমান কবি চলার ফাঁকে ফাঁকে জগৎ ও জীবনের যে সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা বিস্ময়কর। অনেকগুলি চিঠি পত্র-সাহিত্যের এলাকা পার হয়ে ডায়ারির সীমায় এসে পড়েছে—এই সব চিঠি যেন কাউকে লেখা হয় নি, আপন হৃদয়ের গোপন খাতায় স্বগতোক্তি-সমূহকে যেন ভাষা দিয়েছেন। প্রায় সত্তর বছরের সীমারেখায় এসে কবির আত্মোপলব্ধি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি শুধু শিল্পী নন, জীবনশিল্পী। কবি বলেছেন, "আমার বীণার অনেক বেশী তার, সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড়ো কঠিন। আমার জীবনের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবীই আমাকে মানতে হল—কোনোটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না।"—সুর সমন্বয় বা সুরৈক্যের সাধনাই কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। বাইরের নানা বৈচিত্র্য একই সুরের রেখায় যদি বাঁধা না পড়ে তো অখণ্ড সমগ্রতার সাধনা হয় ব্যর্থ। 'মানসী' কাব্যের প্রথম কবিতা 'উপহার'এ কবি বহুকাল পূর্বে এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। গ্যয়টের জীবনসাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা এই

হিসাবই ভিন্নরূপী—সম্ভবতঃ শেক্সপীয়রের সঙ্গেও কবির এই প্রভেদ। বিচিত্রতা একটি মূলভাবের দ্বারা শিল্পায়িত করে তোলা রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য :

"একের চরণে রাখিলাম,
বিচিত্রের নর্মবাঁশী, এই মোর রহিল প্রণাম।"

প্রকৃতি সম্পর্কিত মূল্যবান মন্তব্য অনেক আছে—'বনবাণী' কাব্যের জন্মলগ্নটির কথা বিশেষভাবে জানা যায়। ১৫নং চিঠিখানি প্রকারান্তরে 'বনবাণী' কাব্যের ভূমিকা। খেয়ালী স্রষ্টা রৌদ্রমাখা অলসপ্রহরে ক্ষণিকের ভাব-ঝলকের ছবি এঁকে চলেছেন। কবিবর্ণিত এই ক্লান্তিভরা কুঁড়েমি কবির শেষ দশকের অনেকগুলি গদ্যকবিতার প্রাণ। ৩৬নং পত্রটি 'শেষ সপ্তক'-এর একটি প্রসিদ্ধ কবিতার ব্যাখ্যা বললেই চলে। এই পর্বের অনেকগুলি কবিতার ব্যাখ্যাই পত্রাকারে বিধৃত হয়েছে। ২৩নং ও ২৭নং চিঠি স্বরচিত চিত্র সম্পর্কে মন্তব্যে পূর্ণ। ২৩নং চিঠিতে ছবি ও কবিতার পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। কবিতার বিষয় অস্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়, পরে তার বিস্তৃতি, কিন্তু ছবি একেবারেই খেয়ালের খেলা—অর্থব্যঞ্জনা তার শেষের কথা। নিজের ছবি সম্পর্কে কবির এই আলোচনা রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রকৃতি নির্দেশক। কবিতা রচনার মধ্যে যতটুকু প্রয়াস আছে, চিত্ররচনায় ততটুকু প্রয়াসও নেই। কবির মগ্ন-চৈতন্য খেয়ালের রেখায় গাঁথা পড়ে, তারপরে আসে মাজাঘষার পালা। রেখার এই মত্ততার কথা কবি ২৭নং চিঠিতে বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

এই সময়ে কবির কবিতার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য পূর্ব-স্মৃতি রোমন্থনের সুর। 'পূরবী' কাব্যে যে "শেষ রাগিণীর বীণ" বেজে উঠেছে, তার সঙ্গে অতীত স্মৃতি-চিন্তনের সূক্ষ্ম বেদনার রেশটুকু সুস্পষ্ট-লক্ষ্য। অতীত স্মৃতি-পর্যালোচনায় কোথায় যেন বেদনার মূর্ছনা রয়েছে। পূর্ব-স্মৃতি রোমন্থনের ম্লান সুর কয়েকটি চিঠির উপজীব্য। ১৮নং ও ৫৪নং পত্রসংখ্যায় এই সুর সবচেয়ে বেশী। ১৮নং পত্রে ক্লান্ত বার্ধক্য এড়িয়ে ডাকঘর-শারদোৎসব-গীতাঞ্জলির মুগ্ধ প্রহরের কথায় পূর্ণ—তার সঙ্গে একটি ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসও আছে: "আমার সেদিনকার পরিচয়টাকে এখানকার প্রদোষান্ধকারে ভালো করে আর খুঁজে পাইনে।" শিলাইদহের অতীত স্মৃতির পূর্ণতর পরিচয় ৫৪নং চিঠিখানির প্রাণ। বার্ধক্যের

অলস মুহূর্তে কবির এই অতীতাশ্রয়ী ভাবনা রূপকথার স্বপ্নমোহে বিহ্বল : "মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভৃত ঘরটি—আমের বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বহুদূরে দেখা যাচ্ছে বালুচরের রেখা, আর গুণটানা মাস্তুল। দিনগুলো অবকাশে ভরা—সেই অবকাশের উপর প্রজাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে রঙীন পাখাওয়ালা কত ভাব এবং কত বাণী। কর্মের দায়ও ছিল তার সঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, পরিচয়হীন বেদনা।" অতীতের স্বপ্ন-মন্থর দিন কবির স্মৃতিচারী চিত্তের মণিদর্পণে স্মরণের বিদ্যুৎরেখা আঁকে,—কাব্যধর্মী এইসব চিঠি করুণ-সুন্দর!

এ ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত (৪৮নং), আমেরিকার জীবনচর্যা (৫০নং), হলকর্ষণ উৎসবের ব্যাখ্যা (৪০নং), 'তপতী' ও গদ্যকবিতার প্রসঙ্গ (৩৯নং), মেঘদূত ব্যাখ্যা (৩৮নং) প্রভৃতি পত্র নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে এই ক্ষুদ্র কলেবর সঙ্কলনটি মূল্যবান।

'জাপানে পারস্যে' প্রকারান্তরে দুটি গ্রন্থ। এর 'জাপানযাত্রী' অংশটি অনেক আগেকার লেখা (১৯২৬),—তার প্রায় ছ-সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ পারস্য ভ্রমণ করেন। রচনারীতি ও শিল্পের দিক থেকেও দুটি গ্রন্থে প্রচুর পার্থক্য আছে। 'জাপানযাত্রী' অংশটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী - রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থটি বাংলা-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। 'পারস্যে' অংশটি অনেকটা বিবৃতিমূলক। 'জাপানযাত্রী'র মাদকতা ও অপরূপ শিল্পরীতি এখানে যেন অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। 'পথে ও পথের প্রান্তে'র তুলনায় 'জাপানযাত্রী'র পত্রাংশগুলি দীর্ঘতর ও পূর্ণতর— ভাবনাগুলি যেন অনেকখানি দানাবাঁধা এবং সংহত। একটি দেশ জাতি ও একটি কালের কথা হয়েও এর আবেদন সার্বজনীন। একটি জাতির চলন-বলন ও জীবনচর্যার ইতিহাস এখানে আছে, কিন্তু কবিচিত্তের এমন একটি সাধারণ ক্ষমতা আছে যার ফলে নিতান্ত বস্তু ও সত্যের অংশ ও রসে পরিণত হয়েছে। পত্র-সঙ্কলনটির মধ্যে যে সমস্ত অংশ আত্মগত সেই সব অংশই শিল্পাংশে শ্রেষ্ঠ। আত্মগত ভাবনায়, দার্শনিকসুলভ জিজ্ঞাসায় ও শিল্পসম্মত রূপায়নে 'জাপান-যাত্রী'র কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। ৭নং

চিঠি ক্লাসিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে : "এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে।…অব্যক্তের দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।" রবীন্দ্র-মানসের সেই চিরন্তন বাণী, সুগভীর জীবন-দর্শন পত্রাংশটির মধ্যে অনবদ্য ভাষায় রূপ পেয়েছে। জাপানের গৃহ-সজ্জা, সৌন্দর্যবোধ, কাব্য-চিত্রকলা সম্পর্কে গভীর মন্তব্য সঙ্কলনটির সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে – সঙ্গীত-নৃত্যকলার মাধ্যমে একটি জাতির আত্মপ্রকাশের গরিমাময় রূপ কবি দেখেছেন। শিমোমুরার সুবিখ্যাত চিত্রটি উপনিষদের আলোকপ্রার্থীর কাছে নূতন বাণী নিয়ে এসেছে। জাপানকে অবলম্বন করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পর্কসূত্র কবি নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। 'জাপানযাত্রী'তে আকাশ-সমুদ্র-গ্রথিত বিশ্বপ্রকৃতির যে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে কবির আত্মোপলব্ধির সুরের ছোঁয়াচ লেগেছে—তাই ব্যঞ্জনাগর্ভ গীতিকবিতার মতই এর আস্বাদন।

'পারস্যে' অংশটি জাপানে অংশটির মতো শিল্পকর্ম ও ভাবনার দিক দিয়ে অসাধারণ না হলেও এখানেও বহু লোভনীয় অংশ চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই অংশটুকুই কবির শেষ ভ্রমণ-কাহিনী। জাপান ও পারস্য—এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কবি এক প্রাচ্য সমপ্রাণতা অনুভব করেছিলেন। কবি বলেছেন : "এদের কাছে শুধু কবি নই, প্রাচ্য কবি।" কবি পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস ও রসের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। শিরাজ নগরীর শহরতলীতে পারস্যের রূপরসিক হাফিজের সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌছল, এখানকার এই বসন্ত-প্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনেই এক পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানারসের অনেক পিয়ালা ভর্তি করেছি।" সেদিন কবি অজ্ঞাতসারেই হাফিজের সঙ্গে নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন। হাফিজ-রসিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই কবির এই দীক্ষা হয়েছিল। প্রাচীন পার্সিপোলিস নগরীর ধ্বংসাবশেষ কবিকে সেই অতীত-জীবী সভ্যতার কথা ভাবিয়ে তুলেছে—কবির 'রোম্যান্টিক'

প্রতিভা এক বহু প্রাচীন সভ্যতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক দেশ-কালাতীত মানব-সভ্যতাকেই অনুভব করেছে। আধুনিক পারস্যের নবসৃষ্টির মুহূর্তে কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পূর্ণ মিলন কামনা করেছেন।

৬

'জাভাযাত্রীর পত্র' এবং 'জাপানযাত্রী' যেন একই সুরে বাঁধা। কালানুক্রমিক দিক দিয়েও এই দুটি পত্র-সঙ্কলনের ব্যবধান প্রায় এক বছর। বক্তব্য ও রচনারীতির সমধর্মিতায় একটি গ্রন্থেরই দুটি অংশ বলে মনে হওয়াও এমন কিছু বিচিত্র নয়। এই গ্রন্থটির সুর একটু গভীর বটে, কিন্তু রবীন্দ্রসুলভ পরিহাসের অভাব নেই। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কবি বৃহত্তর ভারতের রূপ দেখতেই গিয়েছিলেন সুতরাং ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের একটি দিক এই পত্র-গুচ্ছের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি রামায়ণ ও মহাভারতের বুদ্ধিধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন—'রক্তকরবী' নাটকের ভূমিকায়ও কবি এই জাতীয় ব্যাখা দিয়েছেন। প্রথম চিঠিতেই কবি ভারত-সংস্কৃতির কবি-ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন—"ভারতবর্ষের সেই সর্বত্র-প্রবেশের ইতিহাসের চিহ্ন দেখবার জন্য আজ আমরা তীর্থযাত্রা করেছি।" জাভাযাত্রার উদ্দেশ্যটি এই অংশে সুচিহ্নিত। মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক অংশগুলির মধ্যে কবি সংস্কৃতি-ব্যাখ্যা করেছেন—অনুষ্ঠানবহুল পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, শিল্পকলা, সামাজিকতা প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সুবিস্তৃত পটভূমিকা মিলিয়ে কবি এক অখণ্ড জীবন-সঙ্গীত রচনা করেছেন। বেশভূষা, আচার আচরণকেও কবি সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিকল্পনার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। নৃত্যকেই কবি জাভার আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম বলেছেন, "এ দেশের উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় দুলছে, তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে।" কথাপ্রসঙ্গে কবি সাধারণভাবে

নৃত্যতত্ত্বের দিকও আলোচনা করেছেন। এমন কি মুখোশ-নৃত্যের কথাও কবি উল্লেখ করেছেন—মুখোশ-নৃত্যের পরিকল্পনাও কবির হয়তো ছিল। 'তাসের দেশ' নাটক ঠিক মুখোশ-নাট্য না হলেও এখানে সজ্জা-নাট্যের (Costume Drama) একটি সুমার্জিত রূপ চোখে পড়ে। 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থের মূল সুর দুটি—ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা, আর নৃত্য-সঙ্গীত-অভিনয়কলা সম্পর্কে মন্তব্য। শুধু নৃত্যনাট্যই নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের নাট্যসাহিত্যের কলাবৈশিষ্ট্যের বহু প্রমাণ এই গ্রন্থটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সবটুকু মিলে একজন কলা-নিপুণ শিল্পীর ও কলা-সমালোচকের বিদগ্ধ প্রকাশ এই গ্রন্থটির রসমর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে।

'রাশিয়ার চিঠি'র রচনারীতি কবির অন্যান্য পত্র-সংকলন থেকে অনেকখানি ভিন্ন। এর কারণ প্রধানত দুটি—প্রথমটি, এর গদ্যরীতি। 'রাশিয়ার চিঠি'র গদ্যরীতির মধ্যে পূর্বতন ভ্রমণ-পত্রগুলির মদিরতা নেই। আবেগ এখানে সংহত হয়ে তীক্ষ্ণাগ্র বাণীবিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে, আবেগের কুহক থেকে মুক্ত করে তাকে ধারালো অসিফলকের মতো দীপ্ত করে তোলা হয়েছে। বক্তব্যের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকাশের স্পষ্টোচ্চারণ 'রাশিয়ার চিঠি'কে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। অতিকথন ও বিশেষণবাহুল্য এখানে প্রায় পরিত্যক্ত। 'রাশিয়ার চিঠি'র দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এর বস্তুনিষ্ঠ বিষয়মুখীনতায়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্র-সংকলনে চূড়ান্ত আত্মনিষ্ঠতার ছাপ আছে,—অনেক সময় বিষয়ের বিচিত্রমুখী আবেদন অন্তর-সত্যের রূপময় অভিব্যক্তিতে গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই এই সমস্ত চিঠি অনেক ক্ষেত্রেই ডায়েরিধর্মী, আত্মগত ভাবনার বাহন। কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধধর্মী—প্রবন্ধের বিষয়মুখীন বৈচিত্র্য ও নির্লিপ্ততা এখানে অনুপস্থিত নয়। শুধু প্রবন্ধ নয়, মননিষ্ঠ প্রবন্ধ—তাই গদ্যরীতিতে পেলবতার চেয়ে দীপ্তি বেশী।

কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটি নবজাগ্রত দেশ ও জাতি যেমন কবির কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হয়েছে, তেমনি নিজের পরপদানত দেশের রুদ্ধপ্রায় জীবনের কথা তাঁকে বার বার পীড়িত করেছে। সে পীড়ন মানুষের অপমানবোধের পীড়ন। 'রাশিয়ার চিঠি' সংকলনটির মূল সুর কবিচিত্তের এক প্রসন্ন মধুর মানবিক ঔদার্যের অন্তর্ভেদী মানবতা।

কবি বলেছেন "ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ওই রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তি-সাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এটা দেখবার জন্য আমি যাব না তো কে যাবে।" মস্কোর কৃষিভবন পরিদর্শন করতে গিয়ে তাদের বিস্ময়কর সমুন্নতি কবিকে আনন্দ দিয়েছে। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কবি, সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা ও নাটকেরও আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুপরিকল্পিত শোষণনীতিকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দীপ্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক ও শোষণপরায়ণ সভ্যতার বীভৎস রূপের বর্ণনায় 'কালান্তর' প্রবন্ধ-গ্রন্থটির সঙ্গেই 'রাশিয়ার চিঠি'র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবি অন্যান্য চিঠিতেও লিপিবদ্ধ করেছেন: "আমি যা বহুকাল ধ্যান করেছি, রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি তা পারি নি বলে দুঃখ হল। অল্পবয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধি না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেদিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না।" (প্রতিমা দেবীর কাছে লিখিত চিঠি— 'চিঠিপত্র' ৩নং)। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লিখিত আর একখানা চিঠিতে কবি লিখেছেন: "জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়।" ('চিঠিপত্র' ২নং)। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দুখানি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ যে রেনেসাঁসের পৌরোহিত্য করেছেন, তার মূল সুর মানবিকতার। কবির শেষ দশকের কবিতায় নাটকে ও প্রবন্ধে বিশেষভাবে এই সুরটিই বেজে উঠেছে। কবির জন্মলগ্নটি যেমন বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে, তেমনি তিরোধানলগ্নটিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাৎপর্যময় মুহূর্তে। ভাঙা-গড়া উদয়-বিলয়ের মধ্য দিয়ে

মানবেতিহাসের যে অভিব্যক্তিধারা কবির চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে, দেশকাল-গ্রথিত সভ্যতা ও জনজীবনের নিয়ত-পরিবর্তনশীল কাহিনীর দিক থেকে ভাবীকালের কাছে তা একটি মূল্যবান দলিল।

'রাশিয়ার চিঠি'র এক একটি পত্রাংশ সম্ভবতঃ কবির দীর্ঘতম পত্র—তথ্যে পরিপূর্ণ, 'বিবৃতি'র ঘনবদ্ধতায় বস্তু-অংশ প্রধান। কবির সবগুলি ভ্রমণ-পত্রিকাতেই বৈদেশিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা সহানুভূতির সাহায্যে উপলব্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে এই জন্য প্রায়ই কোনো ঝাঁঝালো অভিব্যক্তি থাকে না—ঔদার্যে তিনি রোলাঁর দোসর। সংস্কৃতে যাকে বলেছে "বিদগ্ধ"—পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এই বিশেষণটি যথার্থভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যকে এক হিসেবে পত্র-সাহিত্যের মহাকাব্য বলা যায়। সুদীর্ঘকালের ভাবনার ইতিহাস যেমন এখানে সংকলিত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনও খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উপন্যাসে গদ্যরীতির যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, পত্র-সাহিত্যে তা নেই বললেই চলে। সম্ভবতঃ কবি চিঠির ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার একটু তফাৎ করেই চলতেন। পরবর্তী কালে চিঠির ভাষা ও সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধের গদ্যে প্রথম জীবনে কিছু কাঁচা হাতের ছাপ ছিল, কিন্তু পত্র-সাহিত্যের গদ্যরীতি যেন প্রথম থেকেই পরিণত—পরবর্তী কালে অধিকতর চর্চা ও যত্নের ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্য সুমসৃণ হয়েছে, শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে বক্তব্যের কলাকৌশল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্যনাট্যের অতিচর্চার ফলে রবীন্দ্র-গদ্যের চেহারা প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে না। যদি কদাচিৎ চোখে পড়ে, তা হলে দেখা যাবে গদ্যরীতির কর্ষণায় কবি কতদূর যত্নতৎপর।

রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যকে তাঁর প্রতিভার তুচ্ছ দিকও বলা চলে না। তার কারণ অনেক বড় ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি পত্র-রীতিকেই অবলম্বন করেছেন। এই দিক দিয়ে পত্র-সাহিত্যকে তিনি দিয়েছেন কৌলীন্য! পত্র-সাহিত্যের অবলম্বন হাল্কা হাসি থেকে গভীর আধ্যাত্মিক রস পর্যন্ত সব কিছুই। তথ্য, তত্ত্ব ছাড়াও এর উপরি পাওনাটাই সবচেয়ে বড় পাওনা—

সেটি হল একটি মানুষের নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সাহচর্য। হয়তো সব সময় পারম্পর্য থাকে না, খেয়াল-খুশির মালা গেঁথে চলেন—তবুও এর কেন্দ্রে থেকে যায় এক স্থির ও অবিচলিত বিন্দু, যার আলোকচক্রে গাঁথা একটি মানুষের মন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি শুধু খবরের প্রত্যাশাই নিয়ে আসে না, তার সঙ্গে নিয়ে আসে অপরূপ মানুষটির নিভৃততম আত্মভাষণ। কথার রসেই অনেক সময় কথা জমে উঠেছে—তবু তার ধারাবাহিকতা কি নিটোল—কোথাও বুনোনির ত্রুটি ঘটে নি—মসৃণ-চিকণ মূল্যবান মস্‌লিন যেন, তার ওপর কারুকরণের সূক্ষ্মতা—সহজ-সরল হয়েও বাদশাহী। কবি বলেছেন :— "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।… এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশী হয়— গাছের মর্মর-ধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।" —('পথে ও পথের প্রান্তে', ৩৭নং)। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে বক্তব্য ও বলার রীতি দুইটিই সমান তালে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যে একটি অপরূপ মানুষের সমৃদ্ধ ভাবজীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা অসামান্য। তাই শুধু কবি হিসাবেই যখন তাঁকে স্মরণ করা হয়, তখন নিঃসন্দেহে তাঁর সামগ্রিক মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। দেশের বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে এ যুগের আর কোনো কবি এমন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ নন। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌সের মতো কবিরাও কবি হিসেবেই তাঁদের দেশে শ্রদ্ধার্ঘ পেয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তিনি এ দেশের বিচিত্র চিন্তা-চেতনা ও কর্মসাধনার পথিকৃৎ। অবশ্য তাঁর যে কোনো রকম চিন্তাই শিল্পসুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিল্পের দিকটি যেমন নজর পড়েছে, বক্তব্যের দিকটি হয়েছে তেমনি হয়েছে উপেক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের আলোচনার স্বল্পতা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তবু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলীর আলোচনা কদাচিৎ চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জাতীয় প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে কবির মনন-সমৃদ্ধ এমন বহু প্রবন্ধই আছে, যা তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি। প্রবন্ধগুলির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য তো আছেই, তা ছাড়া এর মধ্যে এমন অনেক অংশ আছে, যাদের কবির কাব্য-নাটক-কথা-সাহিত্যের সুচিন্তিত টীকা হিসেবে অভিহিত করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের সবচেয়ে বড় ভাষ্যকার কবি স্বয়ং।

'কালান্তর' সঙ্কলনটিতে ১৩২১ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত লেখা প্রধানত রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক লগ্ন পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি রচনার কালগত পরিধি। দীর্ঘ সাতাশ বছরের দেশ ও কালের বিবর্তিত রূপটি কবির পরিশীলিত চিন্তার মণিদর্পণে ছায়াপাত করেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি এই সঙ্কলনটিতে প্রায় শতবর্ষের ইতিহাসই রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মতো তাঁর দেশকালের ইতিহাসও কম বিস্ময়কর নয়। কারণ গত দীর্ঘ এক শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় ও বাঙালী জীবনের জটিল-বন্ধুর পথ রবীন্দ্র-জীবনের পটভূমিকা রচনা করেছে। এই কালের কৌতূহলোদ্দীপক

ইতিহাস ঐতিহাসিক, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনায় এই শতাব্দীর মহাভাষ্য রচিত হয়েছে। যেকালে তাঁর আবির্ভাব সেকালের অভিপ্রায় ও উপলব্ধি তাঁকে অচেতন থাকতে দেয় নি। কবি সচেতনভাবে, আবার কখনো বা নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাঁর কালের ইতিহাস রচনা করেছেন, আবার আপনকালের ইতিহাস বলতে গিয়ে তার সমৃদ্ধ মানস-জীবনকেও অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। নিজের যুগের ঐতিহাসিক লগ্নগুলি যেমন তাঁর গভীরাশ্রয়ী মনকে আন্দোলিত করেছে, তেমনি যুগ-সমস্যার স্বরূপ নিয়ে মননিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

যেকালে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, তাকে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহৎ যুগের উত্তরলগ্ন বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই রেনেসাঁসের উত্তরসাধক। বাংলাদেশের মাটি তখনো অখণ্ড জীবন-ফসলের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ছিল—তার মাটিতে সবে ফাটল ধরেছে, কিন্তু শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির পটভূমিকায় বাঙালীর সমগ্র জীবনের অখণ্ড রূপই উদ্ভাসিত। কবির জন্মলগ্নের সেই কালটিই বোধ হয় বাঙালীর অখণ্ড জীবন-প্রত্যয়ের শেষকাল! রবীন্দ্রনাথের জীবন-পরিধির পূর্বদিগন্তে সিপাহী বিদ্রোহের ঘনঘটা, আর অস্তগোধূলিলগ্নে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই শতাব্দীতে মনীষীর অভাব হয় নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেউ অবিশ্রান্ত লেখনী সঞ্চালন করে এত বিচিত্রভাবে যুগ-মানসের ইতিহাস বিবৃত করেন নি। ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররাও রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে প্রচুর পরিমাণ মাল-মশলা পেতে পারে।

'কালান্তর' গ্রন্থটিতে 'সবুজপত্র'র যুগ থেকে কবির তিরোভাবলগ্ন পর্যন্ত সাতাশ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলী সঙ্কলিত হলেও, প্রসঙ্গক্রমে কবি উনিশ শতকের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বিশিষ্ট ভূমিকাটির কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তর' ও শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'কে এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা যায়। মানবেতিহাসের এক মহালগ্নে বসে কবি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে এক প্রসারিত চেতনার সূত্রে গেঁথে তুলেছেন। কবি আধুনিক যুগের পটভূমি হিসাবে মধ্যযুগের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। মুসলমান

যুগে বাইরের সংঘাত কম ছিল না, কিন্তু চিন্তারাজ্যের মধ্যে কোনো গভীর পরিবর্তন হয়নি। কবি তৎকালীন বাংলাসাহিত্য থেকে এর প্রমাণ দিয়েছেন : "তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা-কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিদ্যার ছাপ পড়ে নি—একমাত্র ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ মার্জিত ভাষায় ও অস্খলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদগ্ধ্যের আভাস পাওয়া যায়।"

ইংরেজদের আবির্ভাবের পরে ইংরেজকে ঘিরে বাঙালীর মানস-প্রতিক্রিয়াগুলিকে কবি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজের আগমন শুধু একটি বিদেশী জাতির আগমন মাত্র নয়, তারা এসেছিল 'নব্য য়ুরোপের চিত্ত-প্রতীকরূপে'। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালীর রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়ের ইতিহাসকে কবি অল্পকথায় নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সেদিন য়ুরোপের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মত-স্বাতন্ত্র্য ইংরেজ জাতির প্রতি মনকে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল। আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ম্যাট্‌সিনী-গ্যারিবল্ডীর আদর্শদীপ্ত জীবনী, তুর্কির সুলতানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বাঙালীর নবজাগ্রত দেশপ্রেমকে নূতন আদর্শে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। কবি এই যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক প্রবণতাকে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে রূপ দিয়েছেন :

"বর্তমান যুগে, অর্থাৎ যাকে য়ুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম সময়টা তখন আঠারো শো খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি।... য়ুরোপের যে অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বর্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতর শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্তকালে কোনো ছিদ্র দিয়ে তার অন্নভাণ্ডারে যে অলক্ষ্মী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করেনি।...রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোল্যুশন-যুগে য়ুরোপ যে মত-স্বাতন্ত্র্যের জন্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুন্ন হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাট্‌সিনী-গারিবাল্‌ডির বাণীতে, কীর্তিতে সেই যুগ

ছিল গৌরবান্বিত। সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।"

রবীন্দ্রনাথ সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ সম্পর্কিত মনোভাবকে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সেদিনের স্বাধীনতা-প্রত্যাশার মধ্যে ছিল মিশ্রধরণের স্বতোবিরোধী মানসিকতা। তাই রঙ্গলালের কবিতায় একদিকে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" মন্ত্র যেমন ধ্বনিত হয়েছিল, তেমনি এই স্বাধীনতায় 'ইংরেজের কৃপাবলে'র কথাও উল্লেখ করে সিপাহী বিদ্রোহকে ধিক্কৃত করা হয়েছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এক সময় লিখেছিলেন: "বাঙালী যে ইংরাজের অনুকরণ করিয়াছে, ইহাই বাঙালীর ভরসা।" এই পর্বকে কবি বলেছেন, "য়ুরোপের সঙ্গে গভীর সহযোগিতার যুগ।" কিন্তু এই শতকের শেষ দশক থেকেই য়ুরোপের প্রতি এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিল। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ত্রিশরণ মন্ত্রে, শেক্সপীয়রের নাটকে, বায়রনের কবিতায় যার সূত্রপাত, তার প্রতি প্রথম দেখা দিল সংশয়। সুপ্ত এশিয়ার মধ্যে দেখা গেল জাগরণের আভাস। য়ুরোপীয় সভ্যতার আর একটি মূর্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো: "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর।"

পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি যতটুকু মোহ ছিল, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাতাল হাওয়ায় গেল উড়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখোশের আড়াল থেকে তার রক্তপিপাসু স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। কল্যাণকামী মানবীয় আদর্শের চিতা রচিত হলো য়ুরোপের সমরাঙ্গনে, মনুষ্যত্ব ও উদার মানবিকতার স্থান অধিকার করলো নির্মম পশুবলের দুর্নিবার লালসা। ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে ক্রান্তদর্শী কবি য়ুরোপের ছিন্নমস্তা মূর্তির নূতন পরিচয় পেলেন— খ্রীষ্টের বাণী সেখানে ব্যর্থ হলো, শুধু জেগে রইলো সাম্রাজ্য-তৃষ্ণার রক্তলোলুপ

উন্মাদনা ও বস্তুসর্বস্ব আত্মবিস্তারের ধ্বংস-করাল মূর্তি! য়ুরোপের এই নিরাবরণ বর্বরতাকে কবি অগ্নিগর্ভ ভাষায় রূপ দিয়েছেন:

"একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে য়ুরোপকে জান্‌তুম, কুৎসিতের সম্বন্ধে তার একটি সংকোচ ছিল; আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই।... সভ্য য়ুরোপের সর্দার-পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে; তার নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত অধিকার লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজির বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডের রক্তপিঙ্গলের যে উন্মত্ত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তারপরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।"

মৃত্যুর প্রায় তিনমাস আগে লেখা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিতেও কবি ইংরেজচরিত সম্পর্কে মোহ ও মোহভঙ্গের ইতিহাসকে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজচরিতের প্রতি শ্রদ্ধার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপীয়রের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়।" গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবাত্মার অপমানে কবি ব্যথিত হয়েছেন। জীবনের অন্তিম প্রহরে সভ্যতার এক মহাসঙ্কটের দিনে 'অপরাজিত মানুষের জয়যাত্রা'র উপর বিশ্বাস না হারিয়েও কবি মুমূর্ষু সভ্যতার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন: "আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।" য়ুরোপীয় সভ্যতা-প্রসঙ্গে কবির দৃষ্টিকোণের এই পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে ইংরেজ সম্পর্কে

শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের পরিবর্তনের স্তরগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী অবলম্বন করে আমাদের শতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায়ের ইতিহাস আলোচিত হতে পারে।

২

'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২১) প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটির সঙ্গে 'সবুজপত্র'র মূল সুর ও 'বলাকা' কাব্যের কোনো কোনো কবিতার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কবি এই প্রবন্ধের গোড়াতেই তাঁর স্বদেশীযুগের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় বাংলাদেশ মত্ত হয়ে উঠেছিল—সমাজের বুকেও আলোড়নের সৃষ্টি হল: "এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল; এমন কি হিন্দু-মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আয়োজনটাও হয় হয় করিতে লাগিল।" কিন্তু এই উন্মাদনার বেগ একদিন স্তিমিত হয়ে এলো। কবি বলেছেন: "সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।"

'বলাকা'-পর্বের তারুণ্যধর্মিতা ও গতির মন্ত্র প্রবন্ধটির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। জীবনযুদ্ধের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদল কবির সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছে। অন্যদিকে কবি কর্মহীন জড়ত্ব সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন: "আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে।" কবি 'অবিবেচনার বেগ'কেই চরম সত্য বলে স্বীকার করতে পারেন নি, 'বিবেচনার সংযম'-এর কথাও তিনি বলেছেন—কিন্তু দুইকেই অস্বীকার করা সঙ্গত নয়, কারণ তা হলে জীবনের ধর্মকেই অগ্রাহ্য করা হয়: "চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক। কিন্তু, অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না—মানুষকে বলিব 'তুমি

শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবল ঘানি চালাও', এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না।"

'লোকহিত' প্রবন্ধে কবি লোকহিত সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতকে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। লোকহিতের মধ্যে একটি 'আত্মাভিমানের মদ' থাকে, কিন্তু আন্তরিকতা ও প্রীতি ছাড়া লোকহিত সম্ভব নয়। কবি বলেছেন: "সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটির মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যথার্থ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষা। লোকসাধারণকে শক্তিহীন করার অর্থ নিজেকেই দুর্বল করা।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এই পর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ। মহাযুদ্ধের তখন তৃতীয় বৎসর। তিলকের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে 'ন্যাশনাল লীগ' গঠিত হল, ঐ সময়ে মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করলেন। শ্রীমতী বেসান্তের রাজনৈতিক কার্যাবলী তৎকালীন সরকার সুনজরে দেখেন নি। মাদ্রাজ সরকার তাঁকে ও তাঁর দুজন সহকর্মিকে অন্তরীণাবদ্ধ করেন (১৬ই জুন, ১৯১৭)। এই ঘটনায় দেশব্যাপী এক প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময় রামমোহন লাইব্রেরীর হলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কবি শুধু ব্রিটিশ রাজনীতির তীব্র সমালোচনাই করেন নি, তিনি দেশের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিরও আলোচনা করেছেন তাই প্রবন্ধের শেষদিকে কবি বলেছেন: "অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন।"

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-

আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচনা করে ইংরেজচরিত বিশ্লেষণ করেছেন। ভারত-সচিবের ঘোষণাপত্র পড়ে কেউ কেউ অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবকে সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ তিনি বড়ো-ইংরেজ ও ছোটো-ইংরেজদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যাঁরা ভারতবর্ষ শাসন করছেন, তাঁরা আসলে বণিকবৃত্তি-সম্পন্ন ছোটো-ইংরেজ। তাঁরা কোনোদিনই কোনো আদর্শের ধার ধারেন না। তাই ভারতসচিব মণ্টেগুর ঘোষণার পূর্ণফল লাভ করা সম্ভব নয়, কারণ মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো-ইংরেজ। বড়ো-ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষ 'স্তূপাকার স্ট্যাটিষ্টিক্সের সমষ্টি' ছাড়া আর কিছুই নয়। বড়ো-ইংরেজের সৃজনধর্মী মন শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-রাজনীতি নিয়ে এক প্রসারিত ও ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রচনা করেছে। কিন্তু ছোটো-ইংরেজদের কোনো গতিও নেই, বৃদ্ধিও নেই —অথচ তাঁরাই চালান শাসন-যন্ত্র। কবি ছোটো-ইংরেজদের সম্পর্কে বলেছেন: "কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাঁধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাঁধা। তাঁর জীবনের একপিঠে অফিস, আর একপিঠে আমোদ।"

ইংরেজ-শাসনের মূল সমস্যাটিকেও কবি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজদের সঙ্গে এ দেশের কখনো 'আন্তরিক সামীপ্য' ঘটে নি। বড়ো-ইংরেজদের যথার্থ স্বরূপকে ছোটো-ইংরেজ কখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেয় নি: "বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখদুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন।" কিন্তু কবির মতে ছোটো-ইংরেজদের ভয়ে আমাদের ছোটো হলে চলবে না— দুঃখের অপরাজেয় শক্তি দিয়ে সেই ভয়কে জয় করতে হবে। কবি আশাবাদী, তাই বিশ্বাস করেন যে বহু ব্যবধান সত্ত্বেও পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলন অবশ্যম্ভাবী।

'বাতায়নিকের পত্র' রচনাটির বিশিষ্টতা আছে। এই পত্রপঞ্চকের রচনারীতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রমথ চৌধুরী কবিকে 'সবুজপত্রে' লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। 'বাতায়নিকের পত্র' সেই অনুরোধের ফসল। কবির মতে এই লেখাগুলি "বৈশাখের বালুতটবাহিনী

মন্দস্রোত ক্ষীণ ধারাটির মতো…।" 'বাতায়নিকের পত্র'কে রচনারীতির দিক থেকে 'কালান্তর'-এর অন্যান্য রচনার সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা সঙ্গত নয়। কারণ এই রচনাটি পত্র-সাহিত্যের অন্তর্ভূতও হতে পারে—রূপ ও রীতির দিক থেকে 'বাতায়নিকের পত্র'কে পত্র-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেললেও অসঙ্গত হবে না। কবির পত্রবিলাসী মন অবকাশের মুক্ত নীলাকাশে ছাড়া পেয়েছে। দুর্লভ অবকাশের ভাবনা-কণিকাগুলি পত্রগুচ্ছের মধ্যে রূপ পেয়েছে। কবি বলেছেন: "যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভরে ভরে তোমাদের চিঠি পাঠাই। পথ-খরচটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে—মাঝে মাঝে লিখব।" তৃতীয় চিঠিতে তিনি লিখেছেন: "অন্যের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্যের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়নটুকুতে।" কবির পত্রবিলাসী মনের মানসভ্রমণ চিঠিগুলিতে নূতন আস্বাদনের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু রূপ ও রীতির দিক থেকে যতই অভিনবত্ব থাকুক না কেন, চিঠিগুলির বক্তব্যের সঙ্গে 'কালান্তর' গ্রন্থের মূল সুরের একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। কবি নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে শক্তিমদমত্ত পাশ্চাত্যজাতির রাজনৈতিক অভিপ্রায়গুলির সমালোচনা করেছেন। শক্তি ও প্রীতির পার্থক্য নিয়ে কবি তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। শক্তিতত্ত্বের প্রকাশ তার ওজনে ও আয়তনে। অন্যের অধিকারকে, এমন কি অন্যের অস্তিত্বকে নির্মমভাবে খর্ব করাই শক্তির একমাত্র সাধনা। তাই 'শক্তি পূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান'।

কিন্তু শক্তিই যে চরম ও পরম সত্য নয়, সে কথাও একদিন উপলব্ধি করা যায়। পশুবল শেষ পর্যন্ত নিজের মৃত্যুর পথকেই প্রশস্ত করে তোলে। বর্তমান য়ুরোপে যে শক্তিপূজা চলেছে, কবি তার স্বরূপকে তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন: "প্রতাপসুরামত্ত য়ুরোপের পলিটিক্স এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তি নয়; কিন্তু তার

লেলিহান রসনার উলঙ্গতা কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীস্-কনফারেন্সের সভাক্ষেত্রে তা লক্লক্ করছে।" শক্তির বীভৎসতাকে উপেক্ষা করে মনুষ্যত্বের অভিমানকে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

দ্বিতীয় পত্রে কবি যুদ্ধ ও যুদ্ধ বিরতির পর রাজনৈতিক ঘনঘটার কথা আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের আকাশ দুর্বলের কান্নায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে অবকাশের উদার প্রাঙ্গণে প্রাচীনভারত বিশ্বশক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন আজ তা বিলুপ্তপ্রায়। অনেকে মনে করেছিলেন যে, 'যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল,' কিন্তু এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল, তার প্রমাণ পরবর্তী ঘটনাবলী। শান্তিবৈঠক বসেছে বটে, কিন্তু পরাজিত পক্ষের সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারার উদ্দেশ্যটি প্রবল হয়ে উঠেছে। মনের দিক থেকে কোনো পরিবর্তন না হলে বাইরের শান্তিবৈঠক আহ্বান করে কোনো লাভ নেই।

তৃতীয় পত্রে কবি আনাতোল ফ্রাঁসের রচনার একটি অংশ উদ্ধার করে পীকিনের 'ভাঙচুর লুটপাট ও উৎপাত'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। দুর্বলকে পীড়ন করে সবল নিজের ভারে নিজেই তলিয়ে যায়। য়ুরোপের শুঁড়িখানা থেকে পোলিটিক্যাল মদ খেয়ে যে সমস্ত এদেশীয় যুবক মুখোমুখি করে, তাদেরও কবি সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। সেক্ষেত্রেও দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের বিচারবুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে। যারা দুর্বল, যারা চিরকাল মার খায়, তাদেরও বলেছেন দুঃখের সাধনায় জয়ী হতে : "আজ প্রায় দুহাজার বছর আগে সামান্য একদল জালজীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাষ্ঠে বিঁধে মেরেছিল। সেদিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অন্নে কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালঙ্কে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সেদিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে? আর আজ? সেদিন সেই মশালে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?"

চতুর্থ পত্রে কবি শিবের সঙ্গে শক্তির বিরোধের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বাংলা মঙ্গলকাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে এই শিব-শক্তির বিরোধকে

দেখিয়েছেন। এ শুধু সাহিত্যের কথা নয়, তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের কথাও বটে। "যখন মোগলপাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ। সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।" শক্তিদেবীর সবচেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল সেইদিন, যেদিন শৈব চাঁদসদাগরের কাছ থেকে জোর করে পূজো আদায় করা হলো। শক্তি-মদমত্ত য়ুরোপের দিকে চেয়ে কবির মনে পড়েছে শক্তির সেই বীভৎস মূর্তির কথা।

শেষ পত্রে কবি দুর্বলের দায়িত্বের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ দুর্বল দেহই ব্যাধির বীজের আশ্রয়। মনুষ্যত্বের পূর্ণগৌরব না পেলে কোনো জাতির যথার্থ উন্নতি হয় না। দীর্ঘকালব্যাপী অপমানের বোঝা বহন করার ফলে এ দেশের জনসাধারণ স্বভাবতই সঙ্কুচিত—তারা 'জোর-গলায় সম্মান দাবি করতে পারে না।' তাই অন্যায় এই সমাজে চিরস্থায়ী আসন পেতেছে। আমরা নানাদিক থেকে নিজেদের দুর্বল করে রেখেছি। এর জন্য ভিক্ষা করে লাভ নেই, আত্মশক্তিতে বলিষ্ঠ হতে হবে। কবি উপসংহারে বলেছেন: "এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধা বিঘ্ন বিরুদ্ধতা চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বই মন্দ নয়, কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে; তাতে অপমানও যাবে, ফলও পাব।" বাতায়নিকের পত্রে কবি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে।

৩

আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে দেশের দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের কোনো যোগ ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তাধারাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচনার মাধ্যমে নিজেদের

দেশের ইতিহাস পড়তেন—বার্ক, গ্লাড্‌স্টোন, গ্যারিবল্‌ডী মাট্‌সিনী প্রমুখ রাজনীতিবিশারদ্ চিন্তানায়কদের রচনার দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হতেন। ভারতরাজনীতির ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব তাই অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। তিনিই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন, দেশের লোকও তাঁকে তাদের আপন লোক বলে সহজেই চিনতে পারল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনকে রূপ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধীজীর ভূমিকা কি, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন :

"বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিক্যাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কারণ তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্প-রচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক, গ্লাড্‌স্টোন, ম্যাট্‌সিনী, গারিবল্‌ডীর অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায়নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'সত্যের আহ্বানে'র একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। হৃদয় যখন যথার্থই ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন সে অপ্রকাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তার চিত্তবৃত্তির বিচিত্র উদ্বোধন ঘটে। বণিক অথবা সৈনিকের দ্বারা এই মুক্তি ঘটতে পারেনা, কারণ সেখানে বিরোধ ও সংঘাতই প্রবল হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর মধ্যে সত্যের যে অবিচলিত মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, তাকে কবি সশ্রদ্ধচিত্তে বরণ করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অসহযোগনীতি সমর্থন করতে পারেন নি তাই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতিমুলক নীতিকে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি : "মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে ; অতএব এই তো ছিল আমাদের

শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।' এই ডাক কি সেই 'অয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা' ? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক ?…যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অনুশাসনে অন্ধভাবে নিজের ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অন্তরের মধ্যেই। চরকা-কাটা একদিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্যই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তি দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর নেতিমূলক পদ্ধতি সমর্থন করতে পারেন নি, কারণ এর মধ্যে কোনো গঠনমূলক বা সৃজনধর্মী পন্থার নির্দেশ ছিল না। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করার বদলে তিনি দেশী শিল্পের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। চরকা কাটা ব্যাপারটিও কবির মতে নিতান্ত বাইরের ব্যাপার, এর সঙ্গে জনসাধারণের আত্মিক সমুন্নতির কোনো যোগ নেই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 'বস্ত্রাভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করে কাপড় পোড়ানো' হলো, তখন অর্থনীতির বদলে ধর্মকে অকারণে প্রধান করে তোলা হয়েছিল, বলাবাহুল্য কবির কাছে এই সুবিধাবাদীর দর্শন নিতান্ত বিসদৃশ বলে বোধ হয়েছিল: "গলদটারই খাতিরে, সেই গলদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, 'বিদেশী কাপড় অপবিত্র, অতএব তাকে দগ্ধ করো।' অর্থশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা, অর্থের নিয়মের উপরের কথা।' বিদেশী বস্ত্রবর্জন ব্যাপারটিকে কবি অর্থনৈতিক দিক থেকেই বিচার করতে চেয়েছেন—ভাবাবেগদ্বারা চালিত না হয়ে পরিমার্জিত বুদ্ধির আলোকে সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন: "কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তির দ্বারা প্রমাণ করে আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড় পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে

পারে।” এখানে কবি স্পষ্টভাবেই তাঁর গঠনমূলক মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, সেখানে গান্ধীজীর অসহযোগ নীতিকে গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে বেলগাঁও কংগ্রেসে ‘খদ্দর’ নীতি গৃহীত হলো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো মনীষীও এই নীতির সমর্থন করলেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চরকা-বিরোধী মনোভাবকে তিনি ‘ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত’ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই বিরূপ মন্তব্যটিই কবিকে ‘চরকা’ প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবি বলেছেন: “সকল মানুষে মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধিবে বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি, কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন।”

কবির এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চরকা-কাটার ব্যবস্থা সর্ব-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবর্তন করা একজাতীয় যান্ত্রিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রয়াস যখন এক রকম হতে পারে না, তখন জোর করে তাদের সকলকে একই নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, কবির কাছে নিতান্ত ব্যর্থতা বলে মনে হয়েছে। সর্বপ্রকার যান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে কবি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে স্থান দিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বৈচিত্র্য খর্ব করে যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস, কবির মতে তা ব্যর্থ ও একদেশদর্শী। চরকায় সুতো কাটা ব্যাপারটা নিতান্ত বাইরের, এর দ্বারা দেশের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে না, এই ছিল কবির বিশ্বাস। তাই তিনি বলেছেন:

“আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা পূজোর ’পরে আমাদের ভরসা বেশি। বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না। আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে

নাড়ী হয়ে ওঠে। এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা। আত্ম-কর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই। এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলেছে।"

'স্বরাজসাধন' প্রবন্ধের মধ্যে কবি সমস্যাটিকে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। স্বরাজলাভের কথা নানাভাবে আলোচনা করা হয়, কিন্তু স্বরাজের প্রকৃত অর্থ দেশনায়কেরা কখনো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। এর একটি বড়ো প্রমাণ এই যে স্বরাজসাধনায় চরকা-কাটাকে একটি প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। চরকা-কাটার সঙ্গে স্বরাজসাধনাকে জড়িত করে 'স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন: "স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সুতো আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এইরকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছুদিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে।··আমি মনে করি এ রকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অনুকূল নয়।"

স্বরাজসাধনাকে যে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ করা সম্ভব নয়, তার সমগ্র মূর্তিকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলা প্রয়োজন। সর্বসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উপরই কবি জোর দিয়েছেন। শুধু সুতো কেটে ও খদ্দর পরে স্বরাজ আনা সম্ভব নয়। যেখানে চারদিকে চিত্তদৈন্য তখন বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব নয়। স্বরাজসাধনের সামগ্রিক রূপটিকেই কবি দেখতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন: "যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তারপরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণ-পথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।"

৪

'কালান্তর'-এর অনেকগুলি প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে। শান্তি, সুষমা ও প্রেমের প্রদীপ হাতে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ জীবন-প্রদক্ষিণ করেছেন। তিনি তাঁর বহু রচনার মধ্যে নানা ভাবে এই কথাটি বলেছেন যে, বিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে শান্তি ও সুষমা নেই, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই তা আছে। এইজন্যই দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে, একমাত্র প্রীতির দ্বারাই এই সর্বনাশা সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। কালিদাস নাগের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি সংক্ষেপে এই সমস্যাটির উৎসমূলটিকে অভ্রান্তভাবে দেখিয়েছেন।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান-মৈত্রীর যে উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, তা নিতান্ত সাময়িক ও অল্পস্থায়ী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পস্থায়ী ও কৃত্রিম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যনীতিকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখতে পারেন নি। কবি 'সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন : "কাঁচা ভিতকে মাল-মসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত মতো চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যের গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকাদেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না।"

খিলাফতের কৃত্রিম আবরণের আড়ালে যে কতবড়ো আত্মঘাতী প্রবৃত্তি লুকিয়ে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ থেকে। এই ঘটনা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। বিদেশী শাসনকর্তারাও এই ঘটনাটিকে যেন নিষ্ঠুর আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন। সমকালীন এই ঘটনাটি কবিকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি 'সমস্যা' প্রবন্ধে ঘটনাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন : "মালাবারে মোপ্‌লাতে হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে

নিত্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপ্‌লা মুসলমানের ধর্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কংগ্রেসমঞ্চ ঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে খুব মজবুত করে পোলিটিক্যাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা।...বাজিমাত করে দিয়ে তারপরে চালের কথা ভাবব ; আগে স্বরাট হব, তারপর মানুষ হব।"

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূল কারণকে কবি কালিদাস নাগের কাছে লিখিত চিঠিখানিতে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুইজাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল।" য়ুরোপ 'সত্যসাধনা' ও 'জ্ঞানের ব্যাপ্তি' দিয়ে মধ্যযুগীয় অন্ধকার পার হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানকে তাদের কূপমণ্ডুকবৃত্তি ত্যাগ করে বৃহৎ প্রাঙ্গণে মিলতে হবে। শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মনের দৈন্য ঘোচাতে হবে।

এই চিঠির প্রায় দশবছর পরে কবি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পরে চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রবলাকার ধারণ করল। এ দিকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন চলেছে। মুসলিম-লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাও দাবি করেছে। দীর্ঘকালব্যাপী যে সমস্যা কবিচিত্তে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে, এই সময় কবি তা পূর্ণাঙ্গরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রবন্ধটির প্রথমে অন্যান্য জাতির নজীর দেখিয়েছেন। যখন জাতীয় জীবনে সাড়া জাগে, তখন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রবল হয়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লব, সোভিয়েট রাশিয়া, স্পেন ও মেক্সিকোর ইতিহাস থেকে কবি এই সত্যটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষদের বাণীকে পরবর্তীকালে সঙ্কীর্ণ করা হয়েছে—তাই ধর্ম নিয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার মানুষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে।

কবি হিন্দুসমাজের শুষ্ক আচারপ্রবণতাকে নির্মমভাবে সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হননি। এই আচারের ন্দুদেপার্থক্য হির মধ্যেই নানা বিচ্ছেদের সৃষ্টি

করেছে। কবি একটি উদাহরণ দিয়েছেন: "মৎস্যাশী বাঙালীকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালী অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষ্যে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অত্যন্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার সমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য।" হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণ আচার-নিষ্ঠতা ও অনুদারতা যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ত্বরান্বিত ও প্রবলতর করে তুলেছে এ কথা কবি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

বঙ্গ বিভাগের সময় বাঙালী যখন বয়কট-নীতি অবলম্বন করেছিলেন, সেদিন যেমন একদিকে বোম্বাইয়ের মিল মালিকেরা মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আন্দোলনটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি বাঙালী মুসলমানরাও এই আন্দোলনে যোগ দেন নি—দেশের এই সর্বনাশা সঙ্কটের সময়েও ভেদবুদ্ধির অন্ত ছিল না। মুসলমানেরা যে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেছিলেন, সে দাবি মেনে নিয়েও মহাত্মাজী আপোষ করতে রাজি ছিলেন। কবি বলেছেন: "আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন টিঁকবে না।...যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।" তাই খিলাফতের সময় যে মিলনের সেতু রচনার চেষ্টা করা হয়েছিল, তা নিতান্তই বাহ্য। 'ব্রিটিশরাজ্যের পাহারা আলগা হবা মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারদিকে ফণা তুলতে' পারে। কবি যে ভয় করেছেন, ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস তার সত্যতা প্রমাণ করেছে। তাই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কবি ১৯৪৬-এর দাঙ্গার বহু আগেই সাবধানবাণী শুনিয়েছেন: "এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।"

'কালান্তর' সঙ্কলনটির মধ্যে 'শিক্ষার মিলন' একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

প্রবন্ধটির প্রথমাংশে কবি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে শেষদিকে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগীয় আচারের মরুবালুরাশির মধ্যে আমাদের শিক্ষা তার স্বাভাবিক প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূলেও আছে যথার্থ শিক্ষার অভাব। দেশের তো এই অবস্থা, কিন্তু পশ্চিমের দিকে চেয়েও তৃপ্তি নেই। কবি তাঁর আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন: "অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরাজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্থ্। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর —অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।"

য়ুরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা করতে গিয়ে কবি ন্যাশন্যালিজম ও ইম্পিরিয়ালিজম সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী "ন্যাশন্যালিজম" ও "পার্সোন্যালিটি" নামে প্রকাশিত হয়। কবির ন্যাশন্যালিজম বিরোধী বক্তৃতাবলী জাপানে, আমেরিকায় ও য়ুরোপে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই শ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবোধ জাতির সঙ্গে জাতির মিলনের প্রবল অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আত্মসর্বস্ব ন্যাশন্যালিজম ব্যক্তির উজ্জ্বলতম প্রকাশের বিঘ্ন ঘটায়। ন্যাশন্যালিজমই ইম্পিরিয়ালিজমের জন্ম দেয়—ব্যক্তির কোনো স্বাতন্ত্র্যকেই সে স্বীকার করে না। কবি বলেছেন: "ইম্পিরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।" ঐ প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় আছে: "পৃথিবীতে নেশান গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজম সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারদিক থেকে নরবলির যোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না, হঠাৎ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্য স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল।"

শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির সর্বনাশা ষড়যন্ত্র থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা-প্রসঙ্গেও কবি ব্যক্তিসত্তার উল্লেখ করে বলেছেন যে, ব্যক্তির স্বরূপধর্মকে খর্ব করে যে শিক্ষা যান্ত্রিকতার ছাঁচে মানুষ গড়ার ব্রত নিয়েছে তা সর্বতোভাবে ব্যক্তিবিলোপী সর্বনাশা পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত, কবি বলেছেন স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের বিদ্যানিকেতনকে তিনি 'পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন' করতে চেয়েছেন। মোট কথা 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি শিক্ষাকে একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেন নি, জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অভিব্যক্তির অঙ্গ হিসেবেই সমস্যাটির উপর তিনি আলোকপাত করেছেন।

৫

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকালব্যাপী রাজনীতি সম্পর্কে বহু আলোচনা করেছেন। দেশ-কালের পরিবর্তনশীল গতিধারার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখাই সঙ্গত। বিশেষ সময়ের ও বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদও তার মধ্যে ছিল। তাঁর প্রবন্ধাবলী আলোচনার সময় এসব কথাও ভাবতে হবে। তা না হলে ভুল বোঝারই সম্ভাবনা। তবে একথা ঠিক যে, যে কালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁকে কালধর্ম সম্পর্কে অচেতন থাকতে দেয় নি। রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনার গজদন্ত মিনারে স্বপ্নবিহ্বল অলস প্রহর যাপন করেন নি, প্রবন্ধগুলি তার বিশিষ্ট প্রমাণ দেয়। দেশ ও জাতির নানা সঙ্কট ও সমস্যা তাঁর হৃদয়কে চঞ্চল করেছে, তিনি শুধু সমস্যাকেই বিশ্লেষণ করেন নি, নিজের মতো করে সমাধানের ইঙ্গিতও করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতামত সর্বত্র সমানভাবে গ্রহণযোগ্য, এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এমন অনেক কথাই তিনি বলেছেন, যার মূল্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালেও অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া যে সমস্ত মন্তব্যের সঙ্গে তৎকালীন বিশিষ্ট ঘটনাবলীর যোগ আছে, সে যুগের ইতিহাস রচনায় পক্ষে তা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁকে

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের (Political Philosophy) প্রবক্তা বলা যায় না। বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক 'স্কুল'ও তিনি স্থাপন করেন নি। য়ুরোপের খ্যাতনামা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তানায়কদের যে অর্থে 'পোলিটিক্যাল ফিলজফার' বলা হয়, রবীন্দ্রনাথকে সে অর্থে 'পোলিটিক্যাল ফিলজফার' বলা সঙ্গত হবে না। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের সূত্র ধরে কোনো চিন্তার ধারা গড়ে ওঠে নি। কিন্তু এই কারণে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ মূলত শিল্পী—কখনো কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে এলেও তিনি অনেক সময় সমস্যাগুলিকে একটু দূর থেকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকেন, তাঁরা অনেক সময় দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না, তৎসাময়িকের উত্তেজনায় বস্তুবিশ্লেষণের অনাসক্ত দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন। এইখানেই কবির উক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের যে শিল্পদৃষ্টি ও জীবনবোধ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক অখণ্ড প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের মধ্যেও তার পরিচয় অনুপস্থিত নয়।

'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্র-জীবনের শেষার্ধের রাষ্ট্রনৈতিক মতামতগুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এরও আগে কবি এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায় পত্রিকায় কবি অনেকগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'কালান্তর' এর প্রবন্ধাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়ঃ (ক) উনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালী তথা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বলতে বোঝায় য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুরুদের মতামতগুলির তর্জমা। এর একদিকে ছিল নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ, অন্যদিকে ছিল ইংরেজচরিতের প্রতি অসাধারণ বিশ্বাস। (খ) 'সাধনা' পত্রিকায় কবি সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। কবি তাঁর এই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেনঃ "তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও মোটা-গলা করে গভর্ণমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম।...তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।" (গ) লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসার পর থেকেই, দেশে

নানাপ্রকার গোলযোগের সূত্রপাত হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি দেশীসংবাদপত্র ও এ দেশবাসী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিয়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হলো। কার্জনী-দম্ভের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'অত্যুক্তি' নামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সময়ে দিল্লীতে যে দরবারের আয়োজন চলেছিল, তাকেও কবি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কবি এই সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্‌যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম।...আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়।...ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে. কিন্তু সেইটিকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।"

(ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে য়ুরোপের এক নূতন মূর্তি উদ্‌ঘাটিত হলো। এতকাল য়ুরোপের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল আজ তা এক মাতাল হাওয়ায় উড়ে গেল: "তারপরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের এক পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আব্রু গেল ঘুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্যে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি।" য়ুরোপীয় ন্যাশান্যালিজম ও ইম্পিরিয়ালিজমের দানবীয় রূপকে কবি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। (ঙ) রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কবির রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের নূতন অধ্যায় দেখা গেল। চরকা-কাটা ও খদ্দর-পরা দেশকে সার্থকতার দিকে আকর্ষণ করতে পারবে না, এই ছিল কবির বিশ্বাস: "খদ্দর পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার

বহুধা শক্তির বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্য ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকায় সুতো কাটবার শক্তির দৈন্য নয়।"
(চ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবসভ্যতার এক সঙ্কটজনক অধ্যায়ে কবি যে 'মানবপীড়নের মহামারী' দেখে গেলেন, তাতে তাঁর মুক্ত মন ও বিশাল মানবিক দৃষ্টি ব্যথিত হয়েছে। তাঁর শেষ জীবনের বহু কবিতায় এর স্বাক্ষর আছে।

ডঃ শচীন্দ্রনাথ সেনের 'The political philosophy of Tagore' গ্রন্থের সমালোচনায় ('রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত') কবি বলেছেন: "যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।...রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমা অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই মতটি অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, কবিচিত্তের সামগ্রিক অভিব্যক্তির সঙ্গে তার নিগূঢ় যোগ আছে। তাই দেশ-কালের পরিবর্তনশীল অধ্যায়গুলির সঙ্গে সঙ্গে কবিমানসের নিগূঢ় অভিপ্রায়টিরও সন্ধান নিতে হবে। এ কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রেম-সৌন্দর্য-প্রকৃতি সম্পর্কে কবির মানসলোকে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যে ভাব-সম্পদ দানা বেঁধে উঠেছে, তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ধারণাগুলির মধ্যেও অনেক সময় তার সুস্পষ্ট প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবসাধনা যে কবির জ্যোতির্ময় মানস-মণ্ডল রচনা করেছে, তা থেকেও তিনি তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার প্রেরণা পেয়েছেন। কবি আবেদন-নিবেদন করে বিদেশী প্রভুর কৃপার পাত্র হয়ে আত্মসম্মান খর্ব করতে চান নি, তিনি

আত্মিক শক্তিতে বলিষ্ঠ হতে বলেছেন : "বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি; সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে।"

বলাবাহুল্য প্রচলিত রাজনৈতিক প্রবন্ধের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গদ্যে উদ্ধৃতাংশের অনুরূপ বহু অংশই আছে। কবির আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও আদর্শবাদ তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকেও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। তা ছাড়া তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার পশ্চাৎপটে আছে উনবিংশ শতাব্দীর 'লিবার‍্যাল ফিলজফি' ও ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট সংস্কৃতি। কবি বলেছেন : "বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষপর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্মপরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়াকর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ববশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।" কবি এই পারিবারিক জীবন থেকে যে বিশিষ্ট শিক্ষা পেয়েছিলেন তা হলো "জীবনে যা কিছু মহোত্তম দান তার পূর্ণবিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই।" ব্যক্তিচিত্তের সাধনাকে কবি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বস্তুবাদী রাজনৈতিক চিন্তানায়কেরা কবির এই জাতীয় বক্তব্যকে 'আধ্যাত্মিকতা' অপবাদ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রমানসের দিক থেকে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি আর হতে পারে না।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে (১৩০৯) কবি বলেছিলেন : "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার

হিস্ত্রি কিসের, তাহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।" কবি এখানে ভারতবর্ষের জীবনধারা ও সভ্যতার সঙ্গে য়ুরোপীয় আদর্শের পলিটিক্সের মূল পার্থক্য কোথায়, তা আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবননীতির এই প্রবল বিরোধ কবিকে পীড়িত করেছে। তাই কবি তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "চিরদিন ভারতবর্ষে ও চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা, গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।···রাষ্ট্র প্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম তেমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।" 'পাশ্চাত্য রাজার শাসনে' এই দেশকে সবচেয়ে বড়ো আঘাত লেগেছে, পাশ্চাত্য পলিটিক্সের এই আঘাতে ভারতবর্ষের স্বরূপধর্মই বিপর্যস্ত হয়েছে।

রেনেসাঁসের যে মানবতন্ত্রী দৃষ্টি এক সময় নূতন জীবনরসের সন্ধান দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তারই উত্তরসাধক। এই অর্থে তিনি গ্যয়টে, তলস্তয় ও রোলাঁর জগতের অধিবাসী। তিনি আমাদের আত্মসচেতন ও রেনেসাঁস-সচেতন করে তুলেছেন। নিজের যুগের ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলি তাঁর সংবেদনশীল মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। সত্যসন্ধী শিল্পী ও মানবতন্ত্রী ভাবুক এই অসাধারণ রূপদক্ষের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে, তা সাধারণ রাজনীতিবিদ্‌দের দৃষ্টিতে ধরা পড়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন:

"There is nothing new or startling in the proposition that every civilisation creates an individual artistic style of its own, and if we are attempting to ascertain the limits of any given civilisation in any dimension, either spatial or

temporal, we find as matter of fact that the aesthetic is the surest as well as the subtlest...Art speaks in clearer accents than either Politics or Economics." [Study of History, Vol II]

রবীন্দ্রনাথের মহৎ শিল্পদৃষ্টি এই কথাই প্রমাণ করেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনা

যাঁদের সাহিত্যসাধনা প্রধানত প্রবন্ধের উপরেই নির্ভরশীল, তাঁদের খ্যাতিলাভের অন্তরায় একাধিক। প্রবন্ধ যদি একটু গবেষণাধর্মী হয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই, 'অ্যাকাডেমিক্' বিশেষণ দিয়ে তাকে অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত করে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। আবার এর বিপরীত ব্যাপারও কম ঘটে না। প্রবন্ধটির সাহিত্যিক গুণ ও রচনারীতির মনোহারিত্ব থাকলেও রক্ষা নেই—অধুনা বহুনিন্দিত 'রম্যরচনা' শব্দটি দিয়ে একে বিশেষিত করা হয়! কখনো কখনো এইসব লেখকদের 'জার্নালিজম' করার অপবাদও রটে! তা ছাড়া কথাসাহিত্যের গল্পরস এখানে নেই, তাই পাঠকও মুষ্টিমেয়। তাই প্রবন্ধ লেখকদের অধিকাংশই শ্রুতি ও স্মৃতিতে পর্যবসিত হন। শক্তিশালী প্রবন্ধ লেখকদেরই এই দশা! আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী পড়তে গিয়ে, প্রবন্ধকারদের এই দুর্ভাগ্যের কথাই আবার নূতনভাবে মনে জেগে উঠল। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে (১৯১৯) রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষাদীপ্ত রচনাবলী বিস্মৃতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। সম্ভবত, এর একটি প্রধান কারণ হল এই যে, তাঁর বেশীর ভাগ প্রবন্ধই দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত। কিন্তু রামেন্দ্র-রচনাবলীর যে কোনো শ্রদ্ধাবান পাঠকই স্বীকার করবেন যে, গদ্যরীতির প্রসাদগুণে ও সরসতায় রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত দুরূহ ও গবেষণাধর্মী বিষয়কেও সুখপাঠ্য ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যকৃতি আর একটি বিশেষ কারণেও স্মরণীয়। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের রূপ ও রীতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে রামেন্দ্রসুন্দর এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী যার এক কোটিতে আছে যুগন্ধর বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চেতনার স্বর্ণশস্য, আর এক কোটিতে আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির প্রসন্ন আশীর্বাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর অভিনব মানস-পিপাসা যেমন আখ্যায়িকাকাব্যে ও গীতিকাব্যে তার বিচিত্র স্বপ্নসাধ প্রসারিত করেছিল, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বুদ্ধিমার্জিত

অনুশীলন এই যুগের গদ্যকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল।. এই যুগের গদ্যরচয়িতাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে রামেন্দ্রসুন্দর ধন্য হয়েছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না ; বেনামিতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল ; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরু-মহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত প্রবন্ধ সাহিত্যের যে বিচিত্র অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা তারই সঙ্গে এক আত্মিক যোগসূত্রে আবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ প্রমুখ গদ্যলেখকেরা তাঁদের জীবনের এক একটি 'মিশন'কেই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বয় করে তাঁরা যে সারস্বত-সাধনার ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাকেই ঐশ্বর্যদীপ্ত করে তুলেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের বাঙালীরই শেষ বংশধর। তাই তাঁর কর্মে, চিন্তায় ও জীবনাদর্শে গত শতাব্দীর চিন্তানায়কদের হৃদয়োৎকণ্ঠাই স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' এর পত্র-সূচনায় লিখিয়াছিলেন ঃ 'ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নাই।' রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হয়েছিল।

---

১ অম্ল-মধুর ঃ ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩

তবু সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমযুগের প্রতিনিধি মনে করাও ঠিক হবে না। প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমযুগ ও রবীন্দ্র-যুগের মধ্যে এক সেতু রচনা করেছেন। বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধলেখকদের দৃষ্টি ছিল প্রধানত গবেষণামুখী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের চর্চা করে তাঁরা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিষয়নিষ্ঠা ও মননশীলতা এই যুগের প্রবন্ধের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনারীতির রমণীয়তা ও লাবণ্যের চেয়েও বক্তব্যের দিকেই ছিল এই যুগের প্রবন্ধকারদের অধিকতর প্রবণতা। রবীন্দ্রযুগে বাংলা প্রবন্ধের রূপ ও রীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। বক্তব্যকে হৃদয়ের বর্ণে রঞ্জিত করে তাকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করাই হল এ যুগের প্রবন্ধাবলীর মৌলিক ধর্ম। রবীন্দ্রযুগের প্রবন্ধাবলীতে পরিণততর গদ্যরীতির স্বাক্ষর বিদ্যমান।

শুধু কালানুক্রমিকতার দিক থেকেই নয়, মনোধর্মের দিক থেকেও প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর এই দুই পর্বের এক মহৎ সমন্বয় সাধক। বিশুদ্ধ প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে সম্ভবত আর কেউ এমন অবলীলাক্রমে এই দুটি পর্বের সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। দুঃসাধ্য গবেষণাকে যেমন তিনি নির্ধূম আলোক-রেখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, তেমনি রমণীয়তার নামে তিনি অর্থহীন কথার ফুলঝুরি বর্ষণ করেন নি। জীবনে ও চরিত্রে তিনি যে ভারসাম্যে অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন তাঁর সাহিত্যকর্মও সেই ভারসাম্যের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিকজীবন একই বিধাতার রচনা।

২

অদীর্ঘায়ু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবৈচিত্র্য কম নয়। প্রবন্ধগুলি তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন ও মননশীলতার বাহন। পাণ্ডিত্যের বহুমুখী বিস্তার ও গভীরতা যে কোনো দুরূহ বিষয়কেই অতি সহজে আয়ত্ত করেছে। তাঁর অন্তর্ভেদী ঋজুদৃষ্টি বিষয়ের নিগূঢ় অন্তস্থল থেকে সত্যকে আবিষ্কার করেছে। অথচ এই সুগভীর বিদ্যাবত্তা তাঁর হৃদয়কে শুষ্ক করে তোলে নি—সজীব ও সরস মনের স্পর্শে বরং বিদ্যার সঞ্চিত সম্পদ তাঁর ব্যক্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ

হয়ে উঠেছে; নব্য য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতীয় দর্শন, ব্যাকরণ-ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ের উপরেই যখন তাঁর সৃজনধর্মী মনের স্নিগ্ধজ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে, তা তখনই একটি সুকুমার পুষ্পস্তবকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাধৃত বহুমুখী পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঐক্যসূত্রটি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর মনোজীবন কেমন সুসঙ্গত ও পরিপাটি ভাবে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষার ফলেই তিনি নিতান্ত বাল্য-বয়সেই বিজ্ঞানের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। পদার্থবিদ্যায় ও রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিজ্ঞান শুধু তাঁর পাঠ্যাবস্থার প্রধান বিষয়ই ছিল না, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক হিসাবেই তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন। 'নবজীবন' পত্রিকায় তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশই বিজ্ঞানসম্পর্কিত। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে পরিবেষণ করতে চেয়েছিলেন।[২] মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি 'পপুলার সায়েন্স' রচনার পথকেই প্রশস্ত করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আগে বাংলা ভাষায় যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচিত হয় নি, এমন কথা নয়। ফেলিক্স কেরি থেকে শুরু করে আচার্য জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত কোনো কোনো লেখক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তিনি নানাভাবে আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া 'পপুলার সায়েন্স' শব্দটির শ্রেষ্ঠ লক্ষণসমূহ তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। একালে 'পপুলার সায়েন্স' শব্দটি শুনে কেউ কেউ নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন, কেউ কেউ এই জাতীয় রচনায় বিষয়ের মহিমা খর্ব হওয়ার আশঙ্কাও

২ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন: 'গত কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।'

করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে এই শ্রেণীর আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন বিষয়ের মর্যাদাকে কখনো লঘু করে নি, অথচ কত সহজে তিনি কত গভীর কথা বলেছেন। এর কারণ হল তাঁর সরস রচনারীতির অনায়াস-সাবলীলতা। বিদ্যাকে যেমন সহজে তিনি আয়ত্ত করেছেন, তেমনি সহজে তিনি পরিবেষণ করেছেন। বিদ্যা দুর্বহ বোঝা না হয়ে তাঁর অভিজাত মনের সহজাত অলঙ্কারে পরিণত হয়েছে। তাই তাঁর রচনা পড়ে কোনো সমালোচকের মনে পড়েছে আচার্য হাক্স্‌লির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলীর কথা।[৩]

রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার দ্বিতীয় স্তরে একটি গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরের প্রবন্ধাবলীতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন-বিজ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি নিপুণ বিশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'জিজ্ঞাসা'র 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিওলজির বা জীবনবিদ্যার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এম্ব্রায়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ত্ব স্বীকার করিবে কিনা, জানি না; কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীরতত্ত্বের আবিষ্কারে মার মহাশয়ের ততদূর ভয় পাইবার দরকার ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্যেরা সকলে স্বীকার করেন না।"

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাবত্তাকে যাচাই করে নিতে হলে ভারতীয় দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও শাস্ত্রাদির গভীরে প্রবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এই তুলনামূলক বিচার-পদ্ধতিকে পূর্ণতর করার জন্য বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় বিদ্যা তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আয়ত্ত

---

৩ 'সত্যনিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরলতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য হাক্স্‌লির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এগুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।' —অতুলচন্দ্র গুপ্ত: নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (দ্বিতীয় সং), পৃ: ৫৪

করেছিলেন।[৪] এই অধ্যয়নের ফল রামেন্দ্রসুন্দরের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি। প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি অবিমিশ্রভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—নব্য বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি মাতৃভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে লেখকের মৌলিক চিন্তা প্রখরতর হয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের চমকপ্রদ নৈপুণ্য বিস্মিত করে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু তাই বলে এ দুয়ের সমন্বয়ও সম্ভব নয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমার বিবেচনায় যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটি ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্তনশীল, উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোনদিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না ; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে। কাজেই আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় করিয়া আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।···প্রাচীন দার্শনিক মতের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রাচীন মতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গেলে ওরূপে সমন্বয় করিতে গেলে চলিবে না।"[৫]

জীবনের শেষদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তা-চেতনা ও ভাবসাধনা চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করে। এই তৃতীয় পর্যায়ের রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর মূলত দার্শনিক। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, শাস্ত্র-পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তিনি এক সৃষ্টিরহস্যভেদকারী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁর মৃত্যুর পরে 'বিচিত্র জগৎ' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তাঁর এই আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করতে

৪ 'বাঙ্গালার কোন এক বড় মনীষী লেখক একবার বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবু সায়েন্সেই খুব বড় পণ্ডিত, শাস্ত্রকথা তিনি কতটুকু জানেন? এইটুকু রামেন্দ্রের কানে যায়। তারপর সাত বৎসর কাল রামেন্দ্র যেরূপ অপূর্ব অধ্যবসায়ের সহিত বেদ-বেদান্ত, তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।'—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (২য় সং), পৃঃ ৯২

৫ 'পঞ্চভূত' ঃ 'জিজ্ঞাসা'।

পারেন নি। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ এবং পারমার্থিক জগতের সম্পর্ক কি, তা তিনি নিপুণ বিশ্লেষণ, সুমার্জিত বুদ্ধি ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তুলেছেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক প্রজ্ঞার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাহ্য জগতের সঙ্গে পারমার্থিক সত্যের সম্পর্ক নির্ণয় ও যোগসূত্র বিচারের প্রচেষ্টা দর্শনশাস্ত্রের এক সুপ্রাচীন অভিপ্রায়। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তাই তাঁর কাছে বাহ্য জগৎ ও পারমার্থিক সত্যের মাঝখানে এই বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগৎ এসে পড়েছে। তাই সমস্যাটি জটিলতর হয়ে উঠেছে। 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর এই দুরূহ সমস্যাটিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন।

'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'যজ্ঞকথা' প্রভৃতি পরিণত বয়সের প্রবন্ধ-সঙ্কলনগুলির মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়েই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে দার্শনিক প্রবন্ধাবলীতে। তাঁর সমৃদ্ধ ভাবজীবনের অভিপ্রায় সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেন্সারের একটি উক্তি মনে পড়ে: "Knowledge of the lowest kind is *un-unified* knowledge; Science is *partially-unified* knowledge; Philosophy is *completely unified* knowledge." রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়—এ ক্ষেত্রে দর্শন যেন বিজ্ঞানেরই প্রভাবিত পরিণতি। দর্শন-বিজ্ঞানের এই সেতুবন্ধন কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। চিন্তার মৌলিকতা ছাড়াও প্রবন্ধগুলির সরস বর্ণনাভঙ্গি ও লাবণ্যমণ্ডিত গদ্যরীতি সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক গভীরতাকে সাহিত্যের অমৃতরসে পরিণত করার দুর্লভ শিল্পকুশলতা তাঁর ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই তিনি অক্ষয় সম্পদ রেখে গিয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক মূল সত্যকে সহজ করে বলেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য করে তোলা সাধারণ শক্তির পরিচায়ক নয়। প্রথমত, বিষয়বস্তুর উপর অসাধারণ অধিকার থাকা চাই, কিন্তু দুরূহকে সরস ও সহজ করতে হলে ঐ অধিকারই যথেষ্ট নয়, রচনাশক্তির জাদু চাই। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় এই দ্বিবিধ শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দর য়ুরোপের খ্যাতনামা বিজ্ঞানসাধকদের মতামতই পরিবেষণ করেছেন। ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্‌ম্‌হোল্‌ট্‌স্‌, লাপ্লাস প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্যদের প্রদর্শিত পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের মতামতকে তিনি ঘরোয়া উপমা দিয়ে সহজ কথোপকথনের ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন:

"আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্যলোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূখণ্ডটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাড্‌স্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোম্‌রুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই!"[৬]

'প্রকৃতি' গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা আছে। একে 'পপুলার সায়েন্স' বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানই যে চরম সত্য নয়, এ সংশয়ও তাঁর মনে জেগেছে। এই গ্রন্থের জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্তি' প্রবন্ধ দুটিতে এই সংশয় তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রা স্মরণ করেও বিজ্ঞান চরম সত্যের সম্মুখীন করে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠাই তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) ভিত্তিভূমি। বিজ্ঞানকে সহজভাবে পরিবেষণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এমন কথা বলেছেন যা তাঁর গভীরাশ্রয়ী ভাবুকতারই পরিচয় দেয়। শুধু প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তই নয়, প্রকৃতির অপ্রত্যক্ষ ও অব্যক্ত রূপও তাঁর সম্মুখে এক অভূতপূর্ব রহস্যরসে মণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে:

---

৬ 'প্রলয়': 'প্রকৃতি'।

"আমি এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে, সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির চিত্রের খানিকটার উপর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া আছে; সেইটা আমাদের বর্তমানে প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোকে আধ আঁধারে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈষৎ অপরিস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্তমানে প্রত্যক্ষ নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটা দূরগত ও দর্শনাতীত; আর খানিকটা সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতি শ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন; ও আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়।"[৭]

রামেন্দ্রসুন্দরের গভীরাশ্রয়ী জিজ্ঞাসা তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে ক্রমশই অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। তাঁর শেষ দশবছরের রচনাবলীতে চিন্তার অধিকতর স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময় তিনি বৈদিক সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর অনুবাদ, 'যজ্ঞকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর পরিণততম চিন্তাশক্তির পরিচয় বহন করে।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটি তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব গোবিন্দসুন্দরকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গপত্রটির মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরাত্মা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে:

"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নিয়তির বিধানে আবর্তসঙ্কুল জগৎপ্রবাহের উপরি স্তরে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠে, বুঝিতে পারি; জগন্নিয়ন্তার কোন্ নিয়মে তাহা স্বকার্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বুদ্বুদের মত অন্তর্হিত হয়, তাহা বুঝিলাম না। ...জীবনদাতা পিপাসামাত্র সম্বল দিয়া জীবনের পথে প্রেরণ করিয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মূর্তিভেদ। ত্বৎপ্রদত্ত সম্বল ত্বদীয় চরণোপ্রান্তে উৎসর্গ করিলাম।"

'জিজ্ঞাসা'র প্রবন্ধগুলিকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাজগতের এক সন্ধিলগ্ন উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিজ্ঞান থেকে কেমনভাবে তিনি দর্শনের সীমায় পদক্ষেপ করেছেন, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থটিতে। 'উত্তাপের অপচয়', 'নিয়মের

---

৭ 'প্রকৃতির মূর্তি': 'প্রকৃতি'

রাজত্ব' জাতীয় প্রবন্ধে তিনি সহজ সুন্দরভাবে বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিকে পরিবেশন করেছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির একটি যেমন নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে, তেমনি দার্শনিক রহস্যজিজ্ঞাসাও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'সুখ না দুঃখ ?', 'সত্য', 'জগতের অস্তিত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি দর্শনের অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মতো দার্শনিক প্রবন্ধেও তিনি যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ বর্জন করে দুরূহ সমস্যার গ্রন্থিমোচন করার চেষ্টা করেছেন। 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি' প্রবন্ধ দুটিকে নন্দনতত্ত্বের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন, তিন দিক থেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। সৌন্দর্য বস্তুধর্ম না চিত্তধর্ম, নন্দনতত্ত্বের সেই নিগূঢ় বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের আগে বাংলা ভাষায় সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে এমন বিশ্লেষণী আলোচনা আর কেহই করেন নি। অথচ তাঁর আলোচনা যে কত অবলীলাকৃত ও স্বচ্ছন্দ-সুন্দর তা একটি উদাহরণ দিলেই পরিস্ফুট হবে :

"নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত নহি।"[৮]

'প্রতীত্যসমুৎপাদ', 'পঞ্চ ভূত' প্রভৃতি প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞান, দুইই জগৎরহস্য উদ্ঘাটন করতে চায়, কিন্তু তাদের পথ স্বতন্ত্র। তাই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন :

"বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগতিক রহস্যঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক

৮ 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব': 'জিজ্ঞাসা'

অভিব্যক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। দার্শনিক সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না।"[৯]

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তিক্রম, বিচারবুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। বিজ্ঞান তাঁকে যুক্তিবাদী করে তুলেছিল, আর দর্শন দিয়েছিল ভাবগভীরতা। এই দুয়ের দুর্লভ-সমন্বয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ রামেন্দ্রসুন্দর জগৎরহস্যের জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন। জ্ঞানপিপাসু রামেন্দ্রসুন্দর এইভাবেই চিন্তাজগতের লতাগুল্মশাখা-জটিল পথে অগ্রসর হয়েছেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। সামান্য আলো পেয়ে আরো দূরে এগিয়ে গিয়েছেন। যেখানে পথ একেবারেই মেলে না, সেখানেও বুদ্ধিদীপ্ত অনুমানের শিখাকে প্রদীপ্ত করতে ভোলেন নি। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই যে তাঁর প্রসন্নতা নিষ্প্রভ হয় নি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল তাঁর প্রসাদগুণসমন্বিত সুমার্জিত রচনারীতি। পাণ্ডিত্য ও সুগভীর বিদ্যাবত্তা যথোপযুক্ত রসদৃষ্টির অভাবে নীরস হয়ে উঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলিতে শিল্পীমনের অমৃত প্রসাদ বর্ষিত হয়েছে।

৪

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বঙ্গানুবাদ (১৯১১) রামেন্দ্রসুন্দরের প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ জীবনের এক মহৎ কীর্তি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ভারত-শাস্ত্র-পিটক নামে বৈদিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর উক্ত গ্রন্থমালা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর রামেন্দ্রসুন্দরকৃত অনুবাদ ঐ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। বহুদিন আগে মার্টিন হোগ ইংরেজীতে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অনুবাদ রামেন্দ্রসুন্দরের মনঃপূত হয় নি। তাই তিনি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। তিনি মূলত সায়নাচার্যের মতই গ্রহণ করেছেন। এই দুজ্ঞেয় বিষয় অনুবাদ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর শুধু ভাষান্তরিত করেই ক্ষান্ত হন নি, বিষয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করার জন্য দুঃসাধ্য সাধনা করেছিলেন। লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের স্বরূপ

৯ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ': 'জিজ্ঞাসা'

পরিস্ফুট করার জন্য তিনি প্রচুর পরিমাণ টীকা সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থের শেষে পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছেন। ভারতবর্ষের 'পুরাতনী বিদ্যা'র প্রতি তাঁর প্রীতি ও সশ্রদ্ধ মনোভাবই তাঁকে এই দুঃসাধ্য ব্রতপালনে উদ্বুদ্ধ করেছিল :

"বেদবিদ্যা অল্পজ্ঞকে ভয় করেন ; কিন্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। বেদবিদ্যায় আমি তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভারগ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। এই প্রাংশুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহু বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম।"[১০]

'কর্ম-কথা' (১৯১৩) একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি নানা সময় বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এই মহৎ উক্তিটিই তাঁর এই বিচ্ছিন্ন রচনাগুলিকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। এই সঙ্কলনটির মধ্যে সর্বশেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধের কথা অনেক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত উল্লেখ করেছেন' রামেন্দ্রসুন্দর সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক ডয়সেন তাঁর 'ফিলজফি অব্ দি উপনিষদস্' গ্রন্থের শেষভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ কল্পনা করেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতে গীতার মধ্যেই এই দুয়ের মূলগত ঐক্যের কথা বলা হয়েছে—এই সমন্বয়ের সাধনাই গীতার শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য।

'কর্ম-কথা'র কোনো কোনো প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে লেখক উক্ত গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে যে মন্তব্য করেছেন, তা

১০ 'নিবেদন' : 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'

বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের মূলে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তার উপরেও তিনি আলোকপাত করেছেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও খ্রীস্টান সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের বৈরাগ্যের মধ্যে যে অনেক ক্ষেত্রেই আত্মপরায়ণতা আছে এ কথা উল্লেখ করতেও তিনি বিস্মৃত হন নি। 'কর্ম-কথা'র 'নিবেদন' অংশে তিনি বলেছেন :

"ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যদ্দ্বারা মানুষে জীবনের কর্ম ভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের ধর্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেই জন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান দিয়াছেন।···বেদপন্থী সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে পাওয়া যায়।"

'কর্ম-কথা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর বেদপন্থী সমাজের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করেছেন যে, মানুষ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন না, কর্মত্যাগের কোনো অধিকার তাঁর নেই।

প্রজ্ঞাসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানগরিষ্ঠ সাধনার বিস্ময়কর নিদর্শন আছে তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪) গ্রন্থটিতে। রামেন্দ্রসুন্দর তখন অসুস্থ। রোগশয্যায় তিনি যে সমস্ত দুরূহ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত তা লিপিবদ্ধ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর বিপিনবিহারী বলেছিলেন :

"ভারতবর্ষ"র পুরাতন 'ফাইল' যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া তিনি সভ্য মানব-সমাজের অতীত ইতিহাসের গুপ্ত মর্মকথাটুকু বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জীবতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর, হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে হইবে, এই বাসনা তাঁহার ছিল ; কিন্তু মধ্যপথে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন।"[১১]

'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দরের বহুমুখী জ্ঞানসাধনা ও মননশীলতা বিচিত্র বিষয় আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত বয়সে জ্ঞানের বিভিন্ন

১১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' (২য় সং), পৃঃ ৭২

ধারা তাঁর মনে যে একটি আত্মস্থ ও অচঞ্চল মহাসমুদ্রের সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে জ্ঞানের কোনো একটি বিশেষ শাখাকে পৃথক করে দেখার উপায় ছিল না। তাই রোগশয্যায় যখন তিনি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেছেন তখনো বিশ্ববিদ্যা তাঁর কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠেছিল। রোগজর্জর দেহেও তাই তিনি বিশ্ববিদ্যার বিচিত্র তীর্থভূমি পরিক্রমা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘকাল ব্যাপী মন তৈরি করেছিলেন। বিদ্যার বিচিত্র রসকে গ্রহণ করার মতো মনের শোষণ-শক্তি তাঁর ছিল, অথচ বিনা বিচারে কোনো কিছু তিনি গ্রহণ করেন নি। বিজ্ঞান, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, তুলনামূলক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের রসায়নে 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পটভূমি রচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ দিকে প্রাচীন হিব্রুজাতির একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি ভারত ইতিহাসের এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। অনেক নূতন কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু সুলভ চাকচিক্যের দ্বারা চমক সৃষ্টি করতে চান নি।[১২] মানব সভ্যতার ইতিহাস যে তাঁর নখদর্পণে ছিল, এই গ্রন্থটি তারই পরিচয় দেয়।

৫

রামেন্দ্রসুন্দর স্বল্পায়ু ছিলেন। তা ছাড়া, শেষ জীবনে অপটু দেহের জন্য লেখা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর রচনার পরিধি খুব কম নয়, আবার বিষয়ের গুরুত্ব সেই পরিধিকেও অতিক্রম করেছিল। তাঁর মানস-প্রকৃতিই ছিল গভীর, বস্তুর নিগূঢ় রহস্য ভেদ করার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

১২ 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' পুস্তকে আপনার কথাগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। কথাগুলি নিরভিমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিশ্চল চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু তাহা নূতনত্বের চাকচিক্যরঞ্জিত নহে।'—

[—রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি। আশুতোষ বাজপেয়ী রচিত 'রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থের ২০৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত]

তাই যখন যে বিষয়ের উপর তিনি আলোকপাত করেছেন, তখনই তা সজীব হয়ে উঠেছে—বেদবিদ্যা থেকে আরম্ভ করে সমকালীন দেশ কাল কোনো বিষয়ই সেখানে বাদ পড়ে নি।

'চরিত কথা' (১৯১৩) গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধের নীচে চাপা পড়ে আছে। প্রকাশের পর থেকে এর কোনো সংস্করণও হয় নি। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থেও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার বিশিষ্টতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। 'চরিত-কথা'কে 'পোর্ট্রেয়িট' জাতীয় রচনার সঙ্কলন বলা যায়। বিভিন্ন সময় রচিত আট জন মনীষীর জীবনচরিত এখানে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। ইতিবৃত্তমূলক পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জীবনী থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে তিনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর জীবনালেখ্য রচনা করেছেন।

"চরিত-কথা'র 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরচরিতের উপর নূতন আলোকপাত করেছে। বিদ্যাসাগরচরিত নিয়ে অনেকেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়া মৌলিকতায় ও সাহিত্যগুণে আর কোনো প্রবন্ধ এর সমকক্ষ নয়। কয়েকটি মূলসূত্রের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরচরিতের অন্তরতম রূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। বিদ্যাসাগরচরিতের উন্নতোজ্জ্বল মূর্তি তিনি যেভাবে রচনা করেছেন, তার মৌলিকতা ও নিপুণতায় বিস্মিত হতে হয়:

"অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যা-শাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের

ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।”

‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মৌলিক অভিপ্রায়কে নির্দেশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসা কিরূপে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছে, তা তিনি বাক্‌পরিমিতি ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। যথার্থ কবিদৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন :

“সৌন্দর্যের প্রকারভেদ আছে ; গাছ-পালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথম শ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না ; সেটা দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের ও ধর্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই-একটা সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে ; এইজন্যই কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।”

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনের নাম জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই জীবনেরই কবি-ব্যাখ্যাতা। প্রবন্ধটির শেষ দিকে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ সম্পর্কে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, তা ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ব্যাখ্যার একটি নূতন সঙ্কেত, সন্দেহ নেই। প্রবন্ধকারের মতে ‘আনন্দমঠ’ ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’তে যুগধর্মের আবশ্যকতার কথাই নির্দেশ করা হয়েছে। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন :

“বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম প্রবর্তনের মূর্তি, তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপকের মূর্তি—ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্তি ; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি ; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি ; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্তি।”

‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে সাহিত্য ও ধর্মের সম্পর্ক আমাদের দেশে যে

অবিচ্ছেদ্য, সেই তত্ত্বটিকে' নির্ণয় করে লেখক সেই আলোকে মহর্ষির জীবনাদর্শকে বিচার করেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর'। সমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দেয়। এই সূত্রসংক্ষিপ্ত স্থমিতবাক্ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন্দ্রনাথের কবিমানস ও গদ্যরীতির মর্মরহস্যকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন, তা ভাবীকালের বলেন্দ্র-সমালোচকদের মূল্যবান পথনির্দেশ দিয়েছে। 'চরিত-কথা'র প্রবন্ধগুলির পিছনে সাময়িকতার তাগিদ ছিল, কিন্তু সাময়িকতার উর্ধ্বে আজ চিরন্তন রসসাহিত্য হিসাবেই এর সর্বজনস্বীকৃত আবেদন।

'নানা কথা' (১৯২৪) গ্রন্থটি রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজ ও সমকালীন রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সুকঠোর যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি ও সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ প্রবন্ধগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর বুদ্ধিধর্মী মনের তীক্ষ্ণতা প্রকাশিত হয়েছে। আবার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি। তিনি তাঁর নিজের দেশের পটভূমিকায় সমস্যা সমাধানের বাস্তব প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মূল্য আজো কমে নি। রামেন্দ্রসুন্দর কোনো সমকালীন সমস্যাকেই বৃহত্তর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাকে তিনি বৃহত্তর জীবনের পটভূমিকায় অখণ্ডভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই সঙ্কলনের অন্তর্গত 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধটিতে সাহিত্যসমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় মহাকাব্য সম্পর্কে এমন সুলিখিত প্রবন্ধ আর নেই।

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সারস্বত সাধনার প্রতি গভীর প্রীতিবোধ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায় ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাধ্যমে বাঙালীর সারস্বত সাধনাকে তিনি নবীন মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। এই সম্মিলনে পরিষদ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর যে রচনাটি পাঠ

করেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে :

"যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।…যেদিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সেদিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা পূর্ণ হয় নাই ; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।"[২৩]

রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ শুধু হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি তাকে নানাভাবে কর্মরূপ দিয়েছিলেন। তিনি হাতে-কলমে কাজ করার লোক ছিলেন। 'শব্দ-কথা' (১৯১৭) গ্রন্থটি থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একান্ত অভাব দেখে, তিনি সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও ও পরিভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিকে একত্রিত করে তিনি 'শব্দ-কথা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। 'শব্দ-কথা'র 'ধ্বনি বিচার' অধ্যায়টিতে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, সেই আলোচনাটি রামেন্দ্রসুন্দরকে 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। রামেন্দ্রসুন্দর শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনির মতো বিষয়কেও সরস করে তুলেছেন। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলি তিনি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে সাজিয়েছেন। তিনি 'মুখবন্ধে' বলেছেন : "…প্রত্যেক ধ্বনির একটি নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত।" রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে রামেন্দ্রসুন্দর ধ্বনির একটি বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ধ্বনির তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করে তিনি এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ মানুষও সহজেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বাংলা ব্যাকরণ, পরিভাষা সম্পর্কিত আলোচনাতেও

২৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' (৭০) পৃ ৫৮

তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বন্ করেছেন। 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধ পড়ে গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

"ধ্বনি-বিচার" পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম।" [১৪]

'শব্দ-কথা' গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা নূতনভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। সাহিত্যের এই বৈজ্ঞানিক ও নিতান্ত টেকনিক্যাল দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই জাতীয় বিষয়কে রামেন্দ্রসুন্দর শুধু সহজ করেই তোলেন নি, একে সুখপাঠ্যও করে তুলেছেন। এইখানেই সব চেয়ে বড় বিস্ময়। পণ্ডিতেরা এই জাতীয় ধ্বনির তেমন মূল্য দেন নি, কিন্তু কবিরা তাঁদের কাব্যে এই সমস্ত উপকরণ সাদরে গ্রহণ করেছেন। 'শব্দ-কথা' গ্রন্থের 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একটি সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন। শব্দতত্ত্ব, পরিভাষা, ও ব্যাকরণের এক-একটি দুরূহ বিষয়কে তিনি যেন গল্প করে বলেছেন—বলার ভঙ্গি যেমন সহজ, তেমনি অবলীলাকৃত।

৬

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'নানা কথা' বাদ দিলে আর তিনখানি গ্রন্থেই তাঁর সর্বশেষ চিন্তার পরিণততম রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) ও 'জগৎ-কথা' (১৯২৬) —রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাজগতের একটি সামগ্রিক ও সুপরিণত রূপ প্রকাশ করেছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনটি সূত্র অবলম্বন করে তাঁর চিন্তাপ্রণালী

১৪ 'রামেন্দ্রসুন্দর' ঃ আশুতোষ বাজপেয়ী, পৃ ২০৬

বহুশাখায়িত বিস্তার লাভ করেছিল। এই তিনটি সূত্র হল : বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদবিদ্যা। জীবনের প্রথমলগ্নে 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা' ও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর অনুবাদের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে এই তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে। 'জগৎ-কথা' গ্রন্থটির কিয়দংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর চার বছর পর জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'জগৎ-কথা' বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ; প্রধানত পদার্থবিদ্যাই এখানে আলোচিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্কলন। কিন্তু 'প্রকৃতি' ও 'জগৎ-কথা'র মধ্যে পার্থক্য আছে। 'প্রকৃতি'-তে তিনি বিজ্ঞানের নানা শাখা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু 'জগৎ-কথা'য় তিনি মূলত পদার্থবিদ্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া, পরবর্তী গ্রন্থটির আলোচনা পদ্ধতিও গভীরতর। প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিকের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে বিজ্ঞানকে দেখেছেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে—সেখানে দর্শনের স্থান অনেকখানি।

'জগৎ-কথা'র প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর ব'লেছেন : 'জগৎ-কথা' অর্থাৎ জড় জগতের কথা।' কিন্তু 'জড়জগৎ' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন। 'জগৎ-কথা' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই সঙ্কলন, কিন্তু দর্শনের পাকা ভিত্তির উপর বিজ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশের মধ্যেই দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় :

"জড় শব্দটি আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা চেতন নহে, তাহাকে জড় বলিত। জগতে এমন এক জন কেহ আছেন, তিনিই 'আমি'; আর যাহা কিছু আছে তিনিই অর্থাৎ সেই 'আমি'ই তাহার জ্ঞাতা। আমি জ্ঞাতা আর সমস্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। চন্দ্র, সূর্য, ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু-কর্ণাদি অবয়বও আমার জ্ঞানের বিষয়; এমন কি, আবার অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, যাহার সাহায্যে আমি চন্দ্র-সূর্যের ও ইট-কাঠের তত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, যদ্দ্বারা মন কর্তৃক সমাহৃত সেই তত্ত্বকে পরিপাক করিয়া আমি কাজে লাগাই,

সেই মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত আমার জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্রমতে কেবল আমিই একমাত্র চেতন পদার্থ। অতএব চন্দ্র-সূর্য, ইট-কাঠ হইতে আমার মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই জড় পদার্থ।" [১৫]

'জগৎ-কথা'য় দার্শনিক দৃষ্টির প্রভাব যতই থাকুক না কেন স্বরূপত গ্রন্থটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্কলন। কিন্তু 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থটিতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত সমন্বয় ঘটেছে। ১৩২৩—২৪ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেনের তত্ত্বাবধানে প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক ও বাঙ্ময় জগতের কথা আলোচনা করে তিনি প্রাণময় জগতে এসে প্রবেশ করেছেন। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি প্রাণকে স্বীকার করে প্রাণের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করেছেন। প্রাণের বৈচিত্র্য, অজস্রতা ও দ্বন্দ্বাভিনয়ের একটি জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন। খুব সংক্ষেপে তিনি প্রাণলীলার যে বর্ণনা করেছেন, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি উজ্জ্বল :

'প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে বাড়াইতেছে, আর অজস্রভাবে অপব্যয় করিতেছে।...ইহাকে খেলামাত্র বলিতে পারি। আর কোন নাম দেওয়া চলে না। এই খেলা খেলিবার জন্য প্রাণী জ্ঞানার্জন করিয়াছে। কিরূপে করিল, জানি না। জ্ঞান প্রাণের ঊর্ধ্ব প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। জ্ঞানবান প্রাণীর সম্মুখে বাহ্যজগৎ প্রসারিত,—জ্ঞানহীন প্রাণীর নিকটে কোনরূপ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই, বাহ্য জগতের কোন অর্থই নাই। এই জ্ঞান—রূপাদি পঞ্চকের জ্ঞান এবং তাহারও উপরে বিরোধের জ্ঞান। বিরোধের জ্ঞানই বেদনার জ্ঞান। রূপাদি পঞ্চক নহিলেও জ্ঞানবান প্রাণীর প্রাণযাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু এই বেদনা-জ্ঞান না থাকিলে চলিতে পারে না।' [১৬]

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর অনুবাদ করে তিনি বৈদিক সাহিত্যভূমিতে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন। কিন্তু শুধু অনুবাদ ও অনুসন্ধান করেই তিনি পরিতৃপ্ত হননি, বৈদিক সাহিত্যের নিগূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার স্বরূপ নির্ণয় করতে

১৫ 'জড় জগৎ' : 'জগৎ-কথা'

১৬ 'চঞ্চল জগৎ' : 'বিচিত্র জগৎ'

চেয়েছেন। বাংলা ভাষায় বেদবিদ্যার রহস্যকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নির্দেশক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি অতিক্রম করে তিনি বেদের কর্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডে এসে পৌঁছেছিলেন। বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃততর আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অকালমৃত্যু বাংলা সাহিত্যকে এই অমূল্য রত্ন থেকে বঞ্চিত করেছে।

যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন ও প্রীতি সাধনের দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরে, কোনো কিছু অর্পণ করে দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। এই স্তরে দেবতাকে সামান্য জিনিস দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। তৃতীয় স্তরে স্বার্থত্যাগই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ত্যাগই যজ্ঞ। 'যজ্ঞ-কথা'য় যে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কর্ম-কথা' গ্রন্থে তারই সূচনা লক্ষ্য করা যায়। 'যজ্ঞ-কথা' গ্রন্থের বাংলাভাষায় কোনো দোসর নেই। বেদপন্থী ভারতবর্ষের এক অন্তরঙ্গ ও মহিমা সুগম্ভীর মূর্তিই এখানে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পাণ্ডিত্য ও রসিকতার পার্বতী পরমেশ্বর একাত্মতা এখানে এক বিস্ময়কর ধ্রুপদী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'যজ্ঞ-কথা'র উপসংহারে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবদৃষ্টি বৈদিক ভারতের এক জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক সৃষ্টি করেছে। বেদপন্থী ভারতভূমির গৌরবগাথা শেষবারের মতো যেন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে:

'ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্রবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্ধ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্যন্ত অর্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে

বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।…চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন;—কেবল স্থূলদেহের স্থূল অন্ন বিলাইয়া তিনি তৃপ্ত হন নাই, যখনই তিনি আপনার যজ্ঞভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই তিনি ইড়ারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশ-বিদেশে বিচরণ করিয়াছেন। জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণার ধারায় দেশ-বিদেশকে ধৌত করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছেন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের এই গভীর হৃদয়াবেগমণ্ডিত উক্তির মধ্য দিয়ে শুধু প্রাচীন ভারতের একটি ভাবরূপই উদ্ঘাটিত হয় নি; ইড়া-সরস্বতী-গায়ত্রী-স্বাহা-সাবিত্রী-অদিতি-সতীরূপিণী মহামাতৃমূর্তিরও বন্দনামন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। এই মাতৃমূর্তি পরিণত হয়েছেন দেশজননীরূপে—এই মূর্তিই 'দশপ্রহরণধারিণী' ও 'কমলদলবিহারিণী'। বলাবাহুল্য বৈদিক ভারতের যজ্ঞকথার মধ্য দিয়ে তিনি দেশের মাটিকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। মাতৃবৎসল সন্তানের এ এক অভিনব কাব্যমন্ত্রপাঠ। বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ ও দার্শনিকের ভাবগভীরতা অতিক্রম করে রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মূলীভূত সত্তাকেই হৃদয়াবেগমণ্ডিত প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর এখানে কবি।

৭

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তিনি শুধু বাংলা-সাহিত্যের একজন কীর্তিমান প্রবন্ধকারই নন, তাঁর গদ্যরচনাগুলি বাদ দিলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অনেকখানিই বাদ পড়ে। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশিষ্ট। বাংলাসাহিত্যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ খুব বেশী নেই। দার্শনিক প্রবন্ধের দিকে রচনাপ্রাচুর্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই রামেন্দ্রসুন্দরকে অতিক্রম করেছেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় আর কেউ সম্ভবত রচনাপ্রাচুর্যের দিক থেকেও তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। সাহিত্যের যে দিকে বেশী

লোকের যাতায়াত নেই, জনপ্রিয়তার পথ যেখানে রুদ্ধপ্রায়, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর তরুণ প্রতিভাকে একদা সেই জনবিরল ও খ্যাতিবিরল পথেই পরিচালিত করেছিলেন। এইখানেই সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি। দুরূহ বিষয়কে নিয়ে তিনি দুরূহতম সাধনা করেছেন। তবু সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সারস্বত সত্তা শুধু বিষয়গৌরবের উপরেই নির্ভরশীল নয়। তার পঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকীতে সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অভিনন্দনপত্রে লিখেছিলেন: "তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্যপ্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সুতীক্ষ্ণ মন্তব্যটি সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিচার। স্বল্পায়ু রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেই জ্ঞানকে তিনি অলঙ্কারে পরিণত করতে পেরেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তাই বিষয় যত গুরুই হোক না কেন, তিনি অনায়াসে তাহা রসসম্পদে পরিণত করেছেন। অধ্যয়ন ও চিন্তালব্ধ সামগ্রী তাঁর চিত্ততলে যে রস সঞ্চার করেছিল, তাই তিনি তাঁর সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ গদ্যরীতির দ্বারা রূপ দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার এই বৈশিষ্ট্য তখনকার কালেও কোনো সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

"পুস্তকখানি ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের লেখা, কিন্তু লেখক তাঁহার পাণ্ডিত্য এরূপ সরলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উহা পাঠকালে পাঠককে কোনোরূপ বেগ পাইতে হয় না!···পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে নানা নূতন কথা শিখিবেন, অথচ সে সকল তত্ত্বের সমাবেশ এমন অবলীলাক্রমে হইয়াছে যে পাঠক কখনই গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যচ্ছটায় অভিভূত হইয়া পড়িবেন না।·· রামেন্দ্রবাবুর পুস্তকখানিতে চিন্তাশীলতার বহুদিনের খোরাক সংগৃহীত আছে, উহাতে জ্ঞানকে উন্মেষিত, পুষ্ট ও সম্পূর্ণ সতর্কভাবে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত বহুবিধ সম্ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার

ভাষা দার্শনিকের মত সহজ কিন্তু কবির মত রসাল এবং সমগ্র পুস্তকখানিতে সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষামোদী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলায় দার্শনিক গ্রন্থ খুব অল্প, এই পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের ভাষার গৌরব বিশেষভাবে সংবর্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।"[১৭]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মহাশক্তি' নামক প্রবন্ধটিই রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা।[১৮] উক্ত পত্রিকায় তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সেই প্রথম বয়সের রচনা সম্পর্কে একাধিকবার যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর গদ্যরীতির অন্তঃ-প্রকৃতি বিচারে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

"...আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাতন বান্ধবের পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ পড়িতাম, পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত।[১৯] অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত বলেছেন:

"কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাংলায় প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—'প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় লেগেছিল। ক্রমশ দেখলাম যে আমি যে সব কথা বলতে চাই, তা ও ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হল।"

এই দুটি স্বীকৃতি থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা উচ্ছ্বাস ফেনিল, আবেগবহুল ও বর্ণময়। কিন্তু এ

১৭ বাংলা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী: 'ভারতী', আশ্বিন ১৩১১

১৮ 'নবজীবন': পৌষ ১২৯১

১৯ 'অম্ল-মধুর': 'ভারতী', বৈশাখ ১৩২৩

২০ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ ৭৮

ভাষায় বক্তব্য আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে এ ভাষা নিজের প্রসাধনরচনায় তৎপর। অতিকথনের প্রগল্‌ভতা, বিশেষণবাহুল্য ও ফেনস্ফীত ভাবোচ্ছ্বাস কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির কয়েকটি বিশিষ্ট দুর্লক্ষণ। কিন্তু উচ্ছ্বাসপ্রবণ অপরিণতবুদ্ধি তরুণ মনের উপর এ ভাষা যে কিছুকাল প্রভাব বিস্তার করবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কালীপ্রসন্নের কাব্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্যরীতি তাই তরুণ রামেন্দ্রসুন্দরকেও মুগ্ধ করেছিল। 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র তাঁকে এই 'মোহপাশ' থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের এই স্নেহানুকূল্য ছাড়াও এই মোহবন্ধন ছিন্ন করার প্রকৃত শক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল।

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল যুক্তিবাদের দীক্ষা। স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা, বিশ্লেষণের নিপুণতা তাঁর সুকর্ষিত মনের ভিত্তিমূল রচনা করেছিল। তাই অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি কালীপ্রসন্নের মেদবহুল অতিচিত্রিত ভাষার মোহপাশবন্ধন ছিন্ন করতে পেরেছিলেন। কারণ সে ভাষা ছিল তাঁর মনোধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তাঁর বক্তব্যের উপযুক্ত ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বেশীদিন তাঁকে অনুসন্ধান করতে হয় নি—অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষার সন্ধান পেয়েছিলেন।

প্রথম দিকের সামান্য ক'টি রচনা ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে কোথাও অপরিণতির চিহ্ন নেই। কারণ তিনি তাঁর মনকে অত্যন্ত দ্রুত রচনা করেছিলেন। অনেকের জীবনেই দেখা যায় যে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁরা নিজেদের ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মনের গঠনই ছিল অন্যরকম, মনের দিক থেকে তিনি খুব দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্য-জীবনের হাতেখড়ি বঙ্কিমপর্বেই। তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি সংশোধন করেছেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির সঙ্গে বঙ্কিমপর্বের খ্যাতনামা গদ্যশিল্পীদের পার্থক্য কম নয়। এই গদ্যরচয়িতাদের রচনাদর্শ তাঁর সামনে থাকলেও তিনি যে সেখানেই নিবদ্ধ থাকেন নি, তার প্রমাণও আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বেও

বাংলাভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করা হয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পূর্বসূরীদের চেয়েও অনেক সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর গদ্যের সাবলীলভঙ্গি, সহজ মসৃণতা ও সৌকুমার্য যে এই অভিনব প্রকাশরীতির অনেকখানি, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

৮

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যার বিচিত্র শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও উগ্র পাণ্ডিত্য তাঁর রসিকতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচন প্রাচীন-সভ্যতা সম্পর্কিত গবেষণা, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান—সমস্ত কিছুই সাহিত্য-গুণসমন্বিত হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী তাঁর অপূর্ব ভারসাম্যময় সুকর্ষিত গদ্যরীতি। 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থের প্রথমেই তিনি একদা যে 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি'র কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার সুমহান দীপ্তিতেই তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যগুণ-সমন্বিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁর পাণ্ডিত্যকে অতিক্রম করে অভিনব শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে।

বিজ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর আলোচনাকে যতদূর সম্ভব সহজ করেছেন। অতি সাধারণ ঘরোয়া উপমা, হাস্যরস প্রভৃতি তাঁর বাগ্‌ভঙ্গিকে সরস করে তুলেছে। কৌতূকোজ্জ্বল দৃষ্টি ও সহজ কথোপকথনের রীতি বিষয়ের দুরূহতাকে সরস করে তুলেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের মধ্যে এই জাতীয় বাক্যের অজস্র উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়ঃ

(ক) "আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্যলোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্তে আইরিশ হোমরুল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই!" ['প্রলয়' ঃ 'প্রকৃতি']

(খ) "প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না ; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী ; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল ; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায় ; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল।" ['নিয়মের রাজত্ব' ঃ 'জিজ্ঞাসা']

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে সুখপাঠ্য করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কখনো প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে পরিচিত উপমা সন্নিবেশ করেছেন, কখনো হাস্যপরিহাসের জ্যোতিতে বক্তব্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে পরিবেশন করার জন্য তিনি বস্তুর প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অনেক সময় তিনি যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা মনেই হয় না।—একটির পর একটি করে তিনি জটিলতার জাল মুক্ত করেছেন। কিন্তু এমন সহজে জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন যে, মনে হয় না সেখানে কোনো প্রয়াস আছে। মনে হয় যেন তিনি কোনো তরুণ শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধটি পড়লেই তার নমুনা পাওয়া যায়।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকহাস্য মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে রমণীয় করে তুলেছে। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে তিনি মাঝে মাঝে শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য তাঁর প্রসন্ন চিত্তের অনুকূল না হলেও যে কয়েকটি জায়গায় তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন, তার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কঠিন দীপ্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্য পরিস্ফুট হবে ঃ

"ষাটি বৎসর পূর্বে এ দেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশমাসের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে কতকগুলি শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান প্রসব

করিলেন ; এবং অকস্মাৎ দেশমধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কেহ আশা করিলেন, ভারতমাতা অচিরেই হিমাচলের উচ্চতম শিখরে উন্নীতা হইবেন : কেহ আশঙ্কা করিলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।" [ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম : 'নানা কথা']

ইংরেজি শিক্ষার আতিশয্য দোষ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর যে অম্লমধুর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন, তার তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়। 'শ্মশ্রুগুম্ফধারী সুপক্ক সন্তান' বাক্যাংশটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। একটি সুপ্রযুক্ত উপমা যে কিরূপে একটি বক্তব্যকে সহাস্যসুন্দর করে তোলে তার উদাহরণও বিরল নয় :

(ক) "বস্তুতঃ ত্রিশকোটি মনুষ্যের সমবায়ে গঠিত একটি সমগ্র জাতি ইউলিসিসের দৃষ্ট লোটাস-ঈটারগণের মত নেশার ঘোরে ঝিম ধরিয়া বসিয়া আছে ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা প্রকাণ্ড ফক্কিকার ভাবিয়া নিশ্চিত মনে যন্তবিয্য সাজিয়া বসিয়া আছে, এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর অন্যত্র বিরল।" [সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার : 'নানা কথা']

(খ) "আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন, এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হর ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল' সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে বাংলা সাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদল কমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমল চয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।" [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'চরিত-কথা']

রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে যে শুধু দুরূহ বিষয়বস্তুর সহাস্যসুন্দর মধুর মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই নয়, ভাষার বলিষ্ঠতা ও ক্লাসিক্যাল সংহতি-গুণে এই রীতি এক এক সময় মহিমা-সুগভীর হয়ে উঠেছে। ভূতত্ত্ববিদ লায়ালকে অনুসরণ করে তিনি হিমালয়োৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা যেমন জীবন্ত, তেমনি কল্পনাসমৃদ্ধ :

"পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার তুহিনমণ্ডিত সূর্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররবে

প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।…শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।" ['মহাকাব্যের লক্ষণ' : 'নানা কথা']

বিশালকায় হিমাচলের উৎপত্তি-বিবরণটিকে রামেন্দ্রসুন্দর শব্দপেশল ভাষায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এই ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনাশক্তি। তাই অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলেছেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের আসন্ন মৃত্যুর কালোছায়ার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সমন্বিত হয়ে যে ধ্বংস-করাল পটভূমিকার সৃষ্টি করেছিল, রামেন্দ্রসুন্দর চিত্র-ধর্মী ভাষায় ও কল্পনার ঐশ্বর্যে তাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন :

"যখন দর্পের অবতার কুরুকুলপতি দুর্যোধন পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বান্ধবহীন, অনুচরহীন হইয়া বিকলাঙ্গ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হ্রদের তটভূমির একপ্রান্তে ধুলিলুণ্ঠিত হইতেছিল, যখন মাংসাশী শৃগাল কুক্কুর মাংসলোভে হর্ষের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছিল ও তখনও তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাবৃত্ত হইতেছিল, যখন নরমাংসভোজনে পূর্ণোদর গৃধ্রকুল উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনেতার প্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেইদিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষুব্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, যখন সেই মহাসাগরের পৃষ্ঠের উপর নিবিড় অন্ধকার ঘনায়মান হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, যখন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর অষ্টাদশ-দিনব্যাপী উন্মত্ত রণকোলাহল মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরবতায় শ্রান্তিলাভ করিয়াছে, সেই সময়ে পাণ্ডবশিবিরে করালী মহাকালীর ভীমমূর্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মহানিশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সুপ্ত মানবের মরণকোলাহল নিশীথিনীর নীরবতা বিদীর্ণ করিল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে দীপ্ত করিয়া অশ্বত্থামার মুক্ত কৃপাণ পরিশ্রান্ত সুখসুপ্ত অসহায় পাণ্ডব সৈনিকগণের, পাণ্ডব-বান্ধবগণের ও পাণ্ডব-পুত্রগণের কণ্ঠ হইতে রক্তস্রোত ঢালিতে লাগিল।" ['ধর্মের জয়' : 'কর্ম-কথা']

উদ্ধৃত অংশটি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির চূড়ান্ত সিদ্ধির পরিচয়

পাওয়া যায়। সহজ সাবলীল প্রবাহ মহিমান্বিত কল্পনার আলোকে বিচিত্রিত। ভাস্কর্য-সুঠাম শব্দবিন্যাস ও মর্মর-মসৃণ বাক্যাংশগুলি এই গদ্যরীতির ঐশ্বর্যকে বর্ধিত করেছে। অতীত ও অপ্রত্যক্ষকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তুলতে হলে যে জাতীয় বর্ণনাশক্তির প্রয়োজন, এখানে তা মোটেই অনুপস্থিত নয়। হৃদয়াবেগ এখানে গতির সঞ্চার করেছে, কিন্তু এই আবেগ আতিশয্যে পরিণত হয় নি। কালীপ্রসন্ন যেখানে হৃদয়াবেগের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, বলেন্দ্রনাথ যেখানে চিত্রাতিশয্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে ভারসাম্য ভ্রষ্ট হয়েছেন, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর সেখানে তাঁর পরিমাণবোধ ও ভারসাম্য কোথায়ও হারান নি। 'জিজ্ঞাসা'র 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' প্রবন্ধটির স্টাইল এক অদ্ভুত ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত।

সমকালীন দুজন গদ্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির তুলনা করলে শেষোক্ত লেখকের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে তাঁর কবিহৃদয়ের আবেগস্পন্দন জড়িত আছে। তাঁর চিত্রধর্মী ও বর্ণাঢ্য গদ্যরীতির মনোহারিত্বের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, এই রীতি ঠিক সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল নয়। প্রাচীন কাব্যকলা ও চিত্র ভাস্কর্য আলোচনারই উপযুক্ত এই ভাষা। বলেন্দ্রনাথের 'কোণারক' যেমন এক অতীতযুগের নির্জন পরিত্যক্ত পাষাণস্মৃতি, তেমনি তাঁর ভাষাও যেন স্মৃতিমন্দিরে সংরক্ষিত অতীতযুগের এক মহিমান্বিত শিল্পকীর্তি। যেন বর্তমান কালের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। বর্ণ ও বর্ণনার আতিশয্য এখানে আছে। এ ভাষা প্রাত্যহিকের বাহন নয়, অসাধারণ স্মৃতিচিত্রময় অনুভূতিই এর আরোহী।

প্রমথ চৌধুরী বাংলাগদ্যের অসাধারণ স্টাইলিস্ট হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর গদ্যস্টাইলেও আতিশয্যদোষের অভাব নেই। তিনিও তাঁর কতকগুলি ম্যানারিজম্ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ভাষাকে তির্যক-গতি করার জন্য অনেক সময় তা জটিল ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির সবচেয়ে বড় গুণ এর ভারসাম্যতা। কোথায়ও তেমন চমক-সৃষ্টির চেষ্টা নেই, বক্তব্যকে অতিক্রম করে কোথায়ও ভাষা বা ভঙ্গি

অকারণ-প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে নি। সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাকে বর্জন করে ভাষা যেমন সহজ, তেমনি পরিচ্ছন্ন; কিন্তু গাম্ভীর্যে ও আভিজাত্যে বিশিষ্ট। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতি ভারী হয়েও অচল নয়। সাধুভাষার বহিরাবরণের অন্তরালে আছে চলতি গদ্যের সচল মেজাজ। রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু চলতি ভাষায় লেখা এই একমাত্র রচনা থেকেই তাঁর এই ভাষায় লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ কথকতা ও রূপকথার ভঙ্গিকে তিনি এখানে আয়ত্ত করেছেন।

বাংলা গদ্যশিল্পীদের ইতিহাসে রামেন্দ্রসুন্দর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রবন্ধসাহিত্যের স্বর্ণযুগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর গদ্যরীতি পূর্ববর্তী কোনো লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতির পার্থক্য অনেকখানি। বঙ্কিমী রীতিকে রামেন্দ্রসুন্দর আরো সহজ ও সুন্দর করেছিলেন। প্রবন্ধকার হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর পূর্ণতর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে গদ্য-রীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তার সব কটি স্তরই সমান নয়। বক্তব্যকে গৌণ করে রবীন্দ্রনাথের সম্রাজ্ঞী-ভাষা অনেক সময় তার নিজস্ব কলাকৌশল দেখিয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষার যত রমণীয়তাই থাক না কেন, তা বক্তব্যকে অতিক্রম করে কখনো নিজস্ব মহিমা দেখায় নি। বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ, স্বচ্ছন্দ গতি, প্রসাদগুণ ও অপূর্ব ভারসাম্য রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিকে শিল্পকর্মে মণ্ডিত করেছে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ-সুন্দর শুভ্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রসন্নজ্যোতি তাঁর এই গদ্যরীতিকে অসামান্য ও অননুকরণীয় করে তুলেছে। তাঁর প্রসন্ন-মধুর সহাস্য-সুন্দর ব্যক্তিত্বেরই শিল্পরূপ তাঁর বিচিত্রবিষয়াশ্রিত প্রবন্ধাবলী।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িকদের মধ্যে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য—প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। এই তিনজন লেখকেরই খ্যাতি বিষয়-বিস্তারের জন্য নয়, তাঁদের খ্যাতি বাংলা গদ্যরীতির অভিনব-কর্ষণার উপরেই নির্ভরশীল। এখানে মননশীলতা, মৌলিক চিন্তা প্রভৃতি গুণের অভাব নেই, কিন্তু এইটুকুই তাঁদের রচনা সম্পর্কে শেষ কথা নয়, এমন কি সম্ভবত প্রধান কথাও নয়। বাংলা গদ্যরীতির কর্ষণার ক্ষেত্রে এই তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী বাংলা-গদ্য রচনার ক্ষেত্রে অনন্য—নূতন ধরণের মিতবাক-পদ্ধতি, কথ্য ভাষায় ঋজু-সংহত দীপ্তি, পরিচ্ছন্নতা ও তীক্ষ্ণধার ব্যঙ্গ-রসিকতা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তব্য অপেক্ষাও বলার রীতিই সেখানে বড়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনারও একটি নিজস্ব রূপ আছে—সে রীতি যেন স্টীলের কলমের পক্ষে সম্ভব নয়, সে রীতি রঙের ও রেখার। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সঙ্গে এই দুইজন কৃতকর্মা গদ্যলেখকের পার্থক্য প্রচুর। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক এ কথা বলা চলে না, বলেন্দ্রনাথের রচনারীতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গদ্যরচনারীতির অনেকখানি অনুগত—যদিও তাঁহারও কতকগুলি নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল। প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনই দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁদের রচনারীতির একটি সুপরিণত আদর্শ চোখে পড়ে—তাছাড়া গদ্যরীতির একটি দীর্ঘকালসাপেক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র স্তরপরম্পরা এই দুই খ্যাতকীর্তি গদ্যলেখকের রচনায় সুপরিস্ফুট। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন না, কিন্তু মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সেই অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিণতির কয়েকটি বড় বড় ধাপ অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিক্রম করেছিলেন। ঊনত্রিশ বছরের প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের কথা চিন্তারও বাইরে—অথচ এই স্বল্পকালের মধ্যেই কবিতা ও গদ্যের উভয়বিধ ক্ষেত্রেই বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা ও বিশিষ্ট স্টাইলের একটি প্রৌঢ়ত্ব সুস্পষ্ট-গোচর। বলেন্দ্র-প্রতিভার এই সহজ-প্রৌঢ়ত্ব প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এক সময় বলেছিলেন ঃ "বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ের দুর্লভ

অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষের দিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

ইংরেজীতে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে—'Style is the man himself' —এই উক্তিটির প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু একথা যথার্থ যে একটি স্টাইলের অধিকারী হওয়া সহজ নয়—কারণ স্টাইল কথাটির মধ্যেই রচয়িতার ব্যক্তিত্বটি সুমুদ্রিত। স্টাইলের ভিত্তিমূলে ব্যক্তিত্বের কঠিন শিলাস্তর, এবং সেইখানেই যথার্থ প্রাণশক্তি। আবার অন্যদিকে বক্তব্যের সঙ্গেও স্টাইলের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বক্তব্য ও বলার রীতি এই দুয়ের অদ্বৈত-সম্পর্কের কথাও শ্রেষ্ঠ স্টাইল প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্টাইল ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীন। এইখানেই শ্রেষ্ঠ স্টাইলের যথার্থ পরিচয় চিহ্ন: "Style in this absolute sense is a complete fusion of the personal and the universal." বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির স্তর তিনটি। বালক বয়সের গদ্যরচনাগুলিতে অশরীরী বাসনা-কুহেলিকার বর্ণগন্ধ-ঘন আস্তরণ ভেদ করে ব্যক্তিত্ব-দ্যোতনার কোনো অবকাশ ছিল না, ভাষার বাঁধুনি কখনও অনায়ত্ত, একটু বেশীমাত্রায় 'সেন্টিমেন্ট্যাল'। এই স্তরের অধিকাংশ রচনাই ষোলো বছরের মধ্যে লেখা। 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থটির মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের প্রকাশ। গ্রন্থটিতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ললিতকলার সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে সর্বপ্রথম একটি বিশিষ্ট স্টাইল চোখে পড়ে—রচয়িতার ব্যক্তিত্বের ছাপ এখানে সুস্পষ্ট,—হৃদয়ের অনেকখানি অংশই যেন ধরা দিয়েছে। বলেন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। তাঁর স্টাইলের সর্বোচ্চ স্তর স্বল্পায়ু—কিন্তু এই অংশেই complete fusion of the personal and universal-এর যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, সেটুকুরও মূল্য কম নয়। কারণ 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থেই বলেন্দ্রনাথের স্টাইলের সর্বোচ্চ স্তরের সূত্রপাত, কিন্তু বলেন্দ্র-সুলভ রচনা-রীতির চরমোৎকর্ষ খুব বেশী রচনায় নেই—অন্তত, সত্যেন্দ্রনাথের পরমায়ুটুকু পেলেও সম্ভবত তিনি তাঁর গদ্যরীতির সর্বোচ্চ সিদ্ধিলাভ করতে পারতেন।

বলেন্দ্রনাথের প্রায় সব রচনাই 'বালক,' 'ভারতী ও বালক' এবং 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা আলোচনার পক্ষে এই

পত্রিকাত্রয়ীর পটভূমিকা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। বিশেষত এই পর্বে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে এক সৌন্দর্যের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। 'ভারতী-সাধনা' পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সমূহের বৈশিষ্ট্য নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে 'সবুজপত্র'-পূর্ববর্তীযুগের গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ অধ্যায় এই পর্বে। এই পর্বের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় গদ্যরচনাকে পাশাপাশি রাখলেই বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার প্রেরণা ও সিদ্ধির ইতিহাস আলোচনা করা সহজসাধ্য হবে। 'রাজসিংহ' (১৩০০), 'মেঘদূত' (১২৯৮), 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা' (১৩০৮), 'পঞ্চভূতের ডায়েরী' (১৩০১), 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২), 'নিশীথে' (১৩০১) প্রভৃতি গদ্যরচনাগুলি বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার আদর্শ হিসেবে মনে করা অসঙ্গত হবেনা। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেককাল পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলেও, এর কিছু কিছু রচনা বলেন্দ্রনাথের জীবিত কালে লিখিত। বলেন্দ্রনাথের স্বল্পপ্রসারী জীবনের সাহিত্য-সাধনা ছাড়া দুটি বৃহত্তর কর্মযোগের কথা আছে ঃ প্রথমটি 'আর্যসমাজ' ও 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর মিলনপ্রচেষ্টায় পাঞ্জাব যাত্রা ; দ্বিতীয়টি, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের উদ্যোগ। দ্বিতীয়টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। জীবনের শেষ পাঁচ-ছ বছর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি নিগূঢ় আত্মিক যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নদী' কাব্যটি বলেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল (১৮৯৯) রবীন্দ্র-জীবনের পক্ষে একটি কর্ম-চঞ্চল প্রহর। প্লেগ-আতঙ্কিত কলকাতায় ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতায় দুর্গতদের জন্য সাহায্য-তহবিল, সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করা, অন্ধকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য সাহায্য-তহবিল সৃষ্টি করা প্রভৃতি কর্ম-চঞ্চল বৃহত্তর আদর্শ-উন্মাদনার দিনে ঐ বছরের বাইশে আগষ্ট বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো, এবং—"The business enterprises run ill. Rabindranath winds up the jute-business, taking upon himself the entire financial liabilities, which take him years to repay"—সুতরাং

A Tagore Chronicle : Visva Bharati, Quarterly, May—Oct, 1941.

বলেন্দ্রনাথ শেষ ক'বছর ব্যবহারিক ও আত্মিক যোগসূত্রে রবীন্দ্রমানসের নিকটতম প্রতিবেশী হয়েছিলেন। সাবলীল অথচ সহজ গদ্যরীতি, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ, বিদেশী শিক্ষা-মোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীর প্রকৃত দীক্ষাগুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মনোধর্মের দিক থেকে বোধহয় রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকট-সহচর।

২

গদ্য ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই বলেন্দ্রনাথের পারদর্শিতা ছিল, কিন্তু গদ্য রচনাগুলিই তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় সাহিত্যসৃষ্টি, এখানেই যেন তাঁর প্রতিভার পূর্ণতর অভিব্যক্তি। তাঁর গদ্যরচনাগুলির পরিধি ও বিষয়-বিস্তারও কম নয়। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর কল্প-মধুকরীর অনায়াস-সঞ্চরণ লক্ষণীয়। তাঁর সমগ্র গদ্যরচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) শিল্প-সাহিত্য সমালোচনা, (খ) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, (গ) ঐতিহাসিক-স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ, (ঘ) সামাজিক প্রবন্ধ, (ঙ) আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম-সম্পর্কিত প্রবন্ধ। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা, তার রচনাবলীর প্রায় অর্ধাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার একটি প্রধান অংশই সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কাব্য-নাটক সমূহের আলোচনা, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি মূল্যবান আলোচনাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্য ছাড়া চিত্র-সমালোচনাও তাঁর প্রচুর—সম্ভবত বলেন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক চিত্র-সমালোচক। তাঁর মনোজীবনের সঙ্গে এই জাতীয় সমালোচনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ণ-দীপ্ত বর্ণনা ও চিত্রচারণা বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই হিসেবে তাঁর 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪), 'গদ্যগ্রন্থ', 'মাধবিকা' (১৮৯৬) ও 'শ্রাবণী' (১৮৯৭) কাব্যগ্রন্থদ্বয় থেকে পূর্ণতর। 'চিত্র ও কাব্য' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও বলেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মিতা, রঙ ও রেখার বর্ণাঢ্যতা, সুচিক্কণ কাব্যধর্মী

বাণী-বিন্যাস ও সৌন্দর্য-চেতনা প্রভৃতি তাঁর গদ্যরীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনার মধ্যেই সুচিহ্নিত। 'উত্তরচরিত', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা','কাব্যে প্রকৃতি', 'পশুপ্রীতি', 'মৃচ্ছকটিক', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মেঘদূত' 'রত্নাবলী', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি কবি ও কাব্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ উদার রসবোধ ও বিচার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ও প্রবন্ধকার সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু রচনায় পুরাতনী কবিপ্রজ্ঞার আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই দুই বিশিষ্ট পর্বের মধ্যে আলোচনার পার্থক্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা ভূদেবের আলোচনা অপেক্ষাকৃত বস্তুনিষ্ঠ ও বিষয়মুখী—আলোচ্যগ্রন্থ বা কবিচরিতই এখানে মুখ্য অবলম্বিত বিষয়। বঙ্কিমের সমালোচনার ভাষা ও উপন্যাসের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে; সমালোচনার ভাষা তীক্ষ্ণাগ্র, নৈয়ায়িক বিশ্লেষণে যুক্তিনিষ্ঠ—রসবোধ ও পাণ্ডিত্যের সংগমতীর্থ। উপন্যাসের ভাষার লালিত্য, নমনীয়তা ও কাব্যাচরণ এখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত কাব্য-নাটক আলোচনার ধারা স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনির্ভর—তার বিষয়মুখীনতা একমুখনিয়ন্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা আত্মনিষ্ঠ, অনেকখানিই যেন তাঁর নিভৃত-চারী কবিমনের রচনা—প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ অনেকটা ইম্‌প্রেশানিস্ট। বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' ও 'শকুন্তলা' সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যের মূলতত্ত্বের সমীপবর্তী হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে আলোচনা করতে গিয়ে রসস্পন্দনের রূপ-রেখার নূতন একটি রূপ সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন কবি-মনীষা কবির রসমন্থর বাসনালোকে যে মৃদুস্পন্দী আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে তারই রূপময় কবিভাষ্য রচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রপন্থী।

'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাসের খণ্ডচিত্র ও তার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মননশীল আলোচনা করেছেন: "এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক

সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ বিরাটত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব করা হয়।" 'প্রাচীন সাহিত্য'তে রবীন্দ্রনাথও 'কাদম্বরী চিত্র' সমালোচনায় কালিদাসের শ্লোকসমূহের বিচ্ছিন্নতা অথচ মুক্তানিটোল সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। ব্রাড্‌লি সাহেব কালিদাসের এই খণ্ড চিত্রসমষ্টিকে 'বিউটিফুল' বলতেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে 'সাব্লাইম' বলতেন না।[২] কালিদাস ও ভবভূতি প্রতিভার তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "ভবভূতি যেখানে একটি মাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।" কালিদাস ও ভবভূতির এই তুলনাটি যেন খণ্ডিত, সমগ্রতার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনাটি অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী: "কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিক শোভাধারণ করিয়া বসে।... ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্র করেন না। যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটি স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের মতো শুধু বসিয়া বসিয়া তুলি ঘষেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটি কথায় এমন একটু রস ঢেলিয়া দেন যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।"

বলেন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে কালিদাসের প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনাই করেছেন। 'ঋতুসংহার' কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা, এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। বলেন্দ্রনাথ 'ঋতুসংহার'-এর সঙ্গে 'মেঘদূত'-এর বিশ্বপ্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি

২ The Sublime - Oxford lectures on poetry—A. C. Bradley.

দিয়েছেন : "কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? 'মেঘদূত'ও তো আদিরসপ্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনাও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। 'মেঘদূত'-এ মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্যজগতেরই প্রাধান্য।" বলেন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' আলোচনাটিতে কোন মননশীলতার পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ ও 'মেঘদূত' সম্পর্কিত প্রৌঢ় মন্তব্যগুলির তুলনায় বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি নিতান্ত কাঁচা হাতে লেখা বলে মনে হয়। প্রায় সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটি (১৮৯০) রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের 'মেঘদূত'কে অপূর্ব কবিব্যাখ্যা দিয়েছেন—তাই কালিদাসের কাব্যে যা বিরহ-বিলাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা-ই সূচীতীক্ষ্ণ বিরহ-ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত হয়েছে—কবি এই কাব্যের মধ্যে পেয়েছেন নিখিল মানবের চিরন্তন বিরহ।[৩]

'মালবিকাগ্নিমিত্র' আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—প্রবন্ধের শেষদিকে নাটকখানির রচয়িতা ও কালসমস্যা সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের মধ্যে চকিতে একবার এবং 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে প্রকৃতি ও মানবের প্রীতিমুগ্ধতার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ভবভূতি-প্রতিভার মূল্যমান দিক্ নির্দেশ করেছেন, কিন্তু কোথাও বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ রসজ্ঞ ব্যাখ্যাতার পরিচয় দিয়েছেন। নানা কারণে এই আলোচনাটি অন্যান্য আলোচনা থেকে স্বতন্ত্র। 'উত্তরচরিত'-এর কোমল সুকুমার স্নিগ্ধ নম্র বিগলিত করুণার মূল উৎসটি এই তরুণ সমালোচক তুলে ধরেছেন। 'উত্তরচরিত'-এর ভাষা ও শব্দবিন্যাস নিয়ে বলেন্দ্রনাথ একটি নূতন রসলোক সৃষ্টি করেছেন—প্রবহমান শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে সমালোচক তাঁর আবেগস্পন্দিত কবিকণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিত'-এর

৩ "সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে,
মানব সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।" ('মেঘদূত' : 'মানসী')

আলোচনাটি বিশ্লেষণাত্মক ও বিতর্কমূলক—মাঝে মাঝে অবশ্য রসসৃষ্টির প্রয়াসও আছে—বলেন্দ্রনাথ এখানে জাগ্রতবুদ্ধি বিশ্লেষণ-নির্ভর সমালোচক নন,—তিনি যেন স্বপ্ন-তন্ময়, আবিষ্টচিত্ত কবি। বলেন্দ্রনাথের 'মৃচ্ছকটিক' ও 'রত্নাবলী' সমালোচনা গতানুগতিক। এই দুটি গ্রন্থ সমালোচনায় কোনো অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ নেই। 'মৃচ্ছকটিক' সমালোচনাটির প্রথম দুই অনুচ্ছেদে সামান্য একটু সমাজচিত্রের আভাস আছে, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো তত্ত্ব-নিরূপণ করতে বসেন নি! ভূদেবের দৃষ্টি একটু নীতি-নির্দিষ্ট, বলেন্দ্রনাথ সেখানে সহজ সৌন্দর্যসাধক।

৩

শুধু সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনাই নয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি ও কাব্য সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথের রচনার পরিধি কম নয়। 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী', 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস', 'কেতকাদাস', 'ক্ষেমানন্দ', 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য', 'রামপ্রসাদের গান', 'বাঙলাসাহিত্যের দেবতা', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'ভারতচন্দ্র রায়', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথের 'জয়দেব' প্রবন্ধে দুটি মূল্যবান মীমাংসা আছে: প্রথমটি জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জয়দেব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করা; দ্বিতীয়টি কাব্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কিত আলোচনা। বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে জয়দেব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ মননিষ্ঠ সিদ্ধান্ত করেছেন: "এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।"—প্রেমের ভাবরূপ বিশ্লেষণে বলেন্দ্রনাথ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জয়দেবের ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার আলোচনাটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান মীমাংসার ইঙ্গিত বহন করে: "গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্নগঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ

নিষ্প্রয়োজন। আবরণের'কথা সেখানে মনেই আসে না। কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্তগৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্তির সর্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয়ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটি সচেতন উদ্দেশ্য নিহিত করে।"—এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই : "যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এস্থলে শারীরিক ভোগ আসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না. চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth."[৪]

'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' রচনাটি একটি তুলনামূলক আলোচনা। রচনাটির স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু কোন মৌলিক বক্তব্য নেই। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' আলোচনায় প্রচলিত প্রথাবদ্ধতাকে তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। এর দুবছর পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতির রাধা' প্রবন্ধটির[৫] সঙ্গে তুলনা করলেই বলেন্দ্রনাথের সীমা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত অধিকাংশ সমালোচনাতেই বলেন্দ্রনাথ তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এই শ্রেণীর সমালোচনা যেন বলেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র নয়। কৃত্তিবাস, কাশীদাস. মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোনো মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেন নি,—এমন কি বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর তুলনামূলক আলোচনাতেও এমন কিছু মনীষার পরিচয় দেন নি। এই জাতীয় আলোচনাগুলির অধিকাংশই সরস কাহিনী বিবৃতি মাত্র,—আলোচনা অংশ অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য একথাও

৪ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' : 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ)

৫ 'বিদ্যাপতির রাধা' : 'আধুনিক সাহিত্য' (১২৯৮)

সত্য যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত এই সমস্ত আলোচনায় বলেন্দ্রনাথের সম্মুখে তখনও বিশেষ কোন স্বীকৃত আদর্শ ছিল না। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনাগুলি পূর্ণতর। এই দুই আলোচনার গদ্যরীতিও স্বতন্ত্র। সংস্কৃত কাব্য সমালোচনায় যে গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে তার ধ্বনিগৌরব, চিত্রধর্মিতা ও শব্দ-বিন্যাসের মধ্যেই পুরাতন পৃথিবীর আস্বাদন-বৈচিত্র্য বিদ্যমান; কিন্তু বাংলা সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনার ভাষা ঘরোয়া ও আটপৌরে, মাঝে মাঝে বৈঠকী রসিকতার আমেজ মেশানো। বোধহয় সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের একটি নিবিড় আত্মিক যোগও ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্রসমৃদ্ধ মেদমন্থর বিচিত্র কারুখচিত ভাষা একদা-জীবিত জীবনচর্যার চির-সহচর। সেদিন আর নেই, কিন্তু পুরাতন বাক্-বৈদগ্ধ্য অপ্সরীর স্খলিত বসনের মতো আজো দরিদ্র পৃথিবীর বুকে লুণ্ঠিত,—অতীতরূপমুগ্ধ রূপদক্ষ বলেন্দ্রনাথ তা-ই যেন সাগ্রহে কুড়িয়ে এনেছেন—তাই সে ভাষার গরিমার শেষ নেই! বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে যেন সেই জীবনেরই পৌরাধিকার লাভ করেন: "প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন, নূপুরনিক্বণ সহিত অশোকতরুতে মৃদু পাদতাড়ন, কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী, ললিত কলা বিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা, কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যায় যে শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; শ্লোকের পর শ্লোক কেবলই চিত্রবিন্যাস।"—কালিদাসের কাব্য-প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের ভাষাও যেন 'অজ বিলাপ'-এর আলস-মন্থর মাধুর্যে একটি চিত্রস্থির গরিমায় রূপান্তরিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনাগুলিতে উচ্চাঙ্গের মননশীলতাও বিদ্যমান।

সমালোচনার কতকগুলি সূত্র বা নীতি সম্পর্কেও বলেন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। 'ইংরেজী বনাম বাঙলা', 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল', 'জীবন-ট্র্যাজেডি', 'স্বভাব ও সাহিত্য', 'স্মৃতি ও কবিতা' প্রভৃতি রচনায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। 'ইংরাজী বনাম বাঙলা' প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ ইংরাজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক-সূত্রটি বিচার করে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন,

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারই যে প্রাদেশিক সাহিত্যের সমুন্নতির কারণ, একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন। 'কবি ও সেন্টিমেণ্ট্যাল' প্রবন্ধটি স্বল্পবাক্, কিন্তু চিন্তা-প্রখরতায় দীপ্ত।—কাব্যবিচারে সেন্টিমেণ্ট্যালকে অনেক সময় কবি বলে ভ্রম হয়। বলেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ ভাষায় যে স্বল্পাক্ষর মন্তব্যটি করেছেন তা অপূর্ব: "সত্যের সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের সম্বন্ধ অল্পই। কবি সত্য সত্য অনুভব করিয়া বলেন এইজন্য তাঁহার কথায় এত গুরুত্ব। সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের ভাব অনুভবও অনেকটা কাল্পনিক। এইজন্য তাহা নির্জীব অনর্থপ্রস্থ মাত্র। কল্পনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবিতা হয় না। কল্পনাও যখন কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন রোগের উৎপত্তি সন্দেহ নাই।"[৬] 'স্বভাব ও সাহিত্য' প্রবন্ধটির বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়—পরস্পর বিরোধী মন্তব্যও আছে। একবার বলেছেন: "সাহিত্য স্বভাব ছাড়িয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না।" আবার বলেছেন: "স্বভাবের সর্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি।" প্রথম মন্তব্যটি বিতর্কমূলক। বর্তমানযুগে নানাকারণে এই মতটি অচল—প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্যটি আপাত বিরোধী। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যে 'স্মৃতি ও কবিতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলিক চিন্তা ও ভাব-গভীরতার দিক থেকে যে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাওয়া যায় এই প্রবন্ধটিতে। এখানে তিনি কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তথাকথিত পাণ্ডিত্যকণ্টকিত 'অ্যাকাডেমিক' প্রবন্ধের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। কাব্যরসিক ও শিল্পী বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধিই রচনাটিকে রমণীয় করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে কবির সামগ্রিক দৃষ্টির পার্থক্যের কথা দিয়েই তিনি শুরু করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি সূত্রাকারে যা বলেছেন, তার মধ্যে অনেক ভাবনার খোরাক আছে। সূত্রগুলিকে সাজালে মোটামুটি এই রকম দাঁড়ায়:

(ক) 'স্মৃতির মন্দিরেই কবিতার প্রতিষ্ঠা' (খ) 'চিত্রে বস্তুর ছায়া

৬। "সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপরে দখল রাখা চাই।"—'সৌন্দর্যবোধ': 'সাহিত্য'—রবীন্দ্রনাথ।

থাকে, কবিতায় ছায়াও থাকে না—যাহা থাকে, আবছায়া।' (গ) 'বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবির কাজ।' (ঘ) 'কবির মনে স্মৃতিই প্রথম কবিতা রচনা করে।' (ঙ) 'উচ্ছ্বাসকে আপন অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাষা ব্যক্ত করা যায়।' (চ) 'কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে।'

স্মৃতির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করাই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সূত্র ধরে কবি কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গভীর বিষয় আলোচনা করেছেন। বাস্তব থেকে কবি উপাদান সংগ্রহ করেন, কিন্তু ওই বস্তু-অংশই কবিতা নয়, বস্তু যখন স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়, তখনি কাব্যের অভিব্যক্তি ঘটে। হৃদয় যখন ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে, তখন সেই চাঞ্চল্যের মধ্যে কবিতার জন্ম সম্ভব নয়। হৃদয়ের সেই উদ্বেলতা সংযত হয়ে যখন একটি বিশেষ রসমূর্তি ধারণ করে তখনি কবিতার জন্ম হয়। অসংযত উচ্ছ্বাস যখন স্মৃতিরসে পরিণত হয়ে ভাব-স্থির পরিস্রুত রূপ পরিগ্রহ করে, একমাত্র তখনি কাব্যের অভিব্যক্তি হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন: 'Poetry takes its origin from emotion recollected into tranquility. বলেন্দ্রনাথ-বর্ণিত স্মৃতি'র মধ্যে এই 'tranquility'-র ভাবটি পরিস্ফুট। প্রথম শ্রেণীর কবিকল্পনার মধ্যে গভীর সংযম থাকে। অনিয়ন্ত্রিত অসংযত কল্পনার দ্বারা কখনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। উচ্চতর সৃজনী কল্পনার মধ্যে এক গভীর ধ্যানশীলতা থাকে।

স্মৃতির আর একটি প্রসঙ্গও বলেন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন: "বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ তাহা হৃদয়ে তেমন মিশাইতে পারে না।" বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ভাবসৃষ্টির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে, তাই ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে যখন তা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে তখনি কাব্যের অভিব্যক্তি ঘটে। বলেন্দ্রনাথ স্মৃতির কথা বলেছেন বটে, কিন্তু স্মৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তা যে কিরূপে কাব্যে পরিণত হয়, সে কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। অলঙ্কারানুমোদিত 'রসাত্মক বাক্য' সংজ্ঞাটিকেও তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নি। মনে হয় এই সংজ্ঞাটিকে তিনি সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। রস সম্পর্কে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অনেক গভীরে প্রবেশ করেছেন, বলেন্দ্রনাথ সেখানে তাঁর

বক্তব্যের একটি সুপরিণত রূপ লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের এই সূত্র-সংক্ষিপ্ত রচনাটির মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না, এর এক-একটি মন্তব্য চমৎকৃত করে।

৪

বলেন্দ্রনাথের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য কম নয়। তাঁর সমালোচনা শুধু সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তিনি ললিতকলার সমালোচনাতেও সূক্ষ্ম রসবোধ ও নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'রবিবর্মা', 'হিন্দুদেবদেবীর চিত্র', 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'দেয়ালের ছবি', 'রঙ ও ভাব' প্রভৃতি রচনাগুলি কলা-সমালোচকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বিচারের পরিচয় বহন করে। 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ দেবদেবীর চিত্রে মানবীয় জীবন-ব্যঞ্জনার অনুসন্ধান করেছেন—সুগভীর মর্ত্যপ্রীতির রসমুগ্ধ এই রূপতন্ময় সৌন্দর্যসাধক বলেছেন: "এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য —পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুই অনুরূপ চিত্র-সূচিত হইয়াছে।" 'রঙ ও ভাব' রচনাটিতে অযথা কথা-বিস্তার নেই —বাক্-পরিমিতি ও বর্ণনা-সংযমে রচনাটি পরিচ্ছন্ন। এখানে রঙ ও ভাবের নিগূঢ়-সম্পর্কের আলোচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের কবিমন পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপশিখায় রূপলক্ষ্মীকে আরতি করেছে সত্য, কিন্তু তাঁর বর্ণ-চেতনা ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নয়। শ্রেষ্ঠ চিত্রের বর্ণ বহিরাশ্রয়ী তুলির লিখনমাত্র নয়, সে রঙ একপ্রকার ভাবের রঙ—সেখানে শিল্পীর রঙ-ফলানোর জন্য কোনো পৃথক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না।[৭] বলেন্দ্রনাথের রীতি একটু স্বতন্ত্র,—তিনি

৭ 'কাদম্বরী চিত্র': 'প্রাচীন সাহিত্য'—রবীন্দ্রনাথ।

ভাবকেই বর্ণ-নির্ভর করেন, বর্ণকে ভাব-নির্ভর নয়। এখানে তিনি রঙ-কেই সত্য মনে করে সেই অনুযায়ী ভাবকে রূপান্তরিত করেছেন—তবে বলেন্দ্রনাথের রঙের এক প্রকার ভাবচ্ছবি আছে—সেই ভাবচ্ছবিটি যেন রঙেরই অশরীরী লাবণ্য।[৮] এই প্রবন্ধটিতে প্রত্যেকটি রঙেরই ভাবরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন বলেন্দ্রনাথ। 'দেয়ালের ছবি' ও 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। 'দেয়ালের ছবি' (১২৯৮) রচনাটির যেন পূর্ণরূপ সাত বছর পরে রচিত 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' (১৩০৫) প্রবন্ধটি। কিন্তু অতি তরুণ বয়সেই কল্প-পৃথিবীর মায়াস্বপ্নের বিভোরতা এই তরুণ সৌন্দর্য-সাধকের চোখে রূপের কাজল পরিয়ে দিয়েছিল—স্বপ্নমুগ্ধ এই চিত্র-পৃথিবীর রূপের তীর্থে দুর্লভের সন্ধান করে ফিরেছেন: "এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহদের সুখদুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই।"

'দিল্লীর চিত্রশালিকা' বলেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। বলেন্দ্রনাথের আভিজাত্যমণ্ডিত কারুখচিত গদ্যরীতির বাদশাহী-বিলাস অতীত পৃথিবীর ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। বলেন্দ্রনাথের মধ্যে এক অতীতচারী রোম্যাণ্টিক কবিমন ছিল,—ইন্দ্রিয়-সচেতন রূপানুভূতি ছিল।—প্রাচীন প্রাচ্য চিত্রকলার বর্ণনায় সেই দূরাভিসারী কবি-মন এক লুপ্ত পৃথিবীর বর্ণগন্ধঘন স্বপ্ন ঘনিয়ে তুলেছে। বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনের আড়ালে রূপময় ভারতবর্ষের কত ছবি, ছবির পর ছবি—আর চিত্রধর্মী পেলব-মসৃণ ভাষাতেই তার অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যা ও কথাবিস্তার,—কথার রসে নূতন কথা ছবি হয়ে ভেসে উঠেছে। তার সঙ্গে অতীতের ঐশ্বর্যদীপ্ত বিলুপ্তনগরীর স্মৃতি-সৌরভ-ধূপের লঘুপক্ষ বিস্তার—বলেন্দ্রনাথ ছবির কথা বলতে গিয়ে ছবি এঁকেছেন—আর, লাক্ষারঞ্জিত ছাদের নীচে যে সোনারপ্রদীপ থেকে লঘুস্নিগ্ধ গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তারই চারপাশে

[৮] "কোন কিছুর হৃদ্গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গি দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠা বসা চলা ফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়লো ভাব, তবে তো পেলাম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা।"—'ভাব', 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'—অবনীন্দ্রনাথ।

স্বপ্নমুগ্ধ পতঙ্গের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন।—জনমানবহীন মহৎ রূপের কারাগারে রূপতন্ময় বলেন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য যেন পথ হারিয়েছেন : "লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্রবর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদহর্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আদ্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্যময় স্বর্ণদীপাধারে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ এক প্রকার লঘুস্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।"[৯] রাজকীয় বর্ণনার উপযুক্ত এই কারুখচিত রাজকীয় গদ্য! 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' একটি অবলম্বন মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছবিগুলিকে অবলম্বন করে, রোম্যাণ্টিক বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সৌধে মানসিক অভিসার। বহুকাল পূর্বের লুপ্ত জীবনচর্যার যে কয়েকটি স্থিরচিত্র চিত্রশালায় সংগৃহীত হয়েছে, তাকেই বলেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তাপে বিগলিত করে জীবনরস-সমৃদ্ধ করেছেন—তরুণ সৌন্দর্যসাধকের অন্তর্জীবনের লঘুস্পর্শ-বর্ণমায়ায় তাই ঘুমন্ত সৌন্দর্যের যেন শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে। বলেন্দ্রনাথ চিত্র-আলোচনায় ভারতীয় শিল্পের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। অতীত ভারতের রূপময় আত্মা তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত। অবনীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় যে প্রয়াস ও সিদ্ধির কাহিনী, বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় যেন তারই আভাস পাওয়া যায়। 'রবিবর্মা' সম্পর্কিত একাধিক রচনার মধ্যে সমকালীন শিল্পধারার মননশীল আলোচনা আছে। রবিবর্মার চিত্রের দেশীয় ও ঘরোয়া আবেদন বলেন্দ্রনাথের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি ঘরোয়া দৃষ্টি ও গৃহপরায়ণ কল্যাণ-সুন্দর জীবনবোধ বলেন্দ্রনাথের রচনার চিরসহচর হয়েছে। অপেক্ষাকৃত পরিণত রচনাগুলির[১০] মধ্যে বলেন্দ্রনাথের এই কল্যাণ-পরিণাম সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ লক্ষ্য করা যায়।

বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্র-সমালোচনাই শ্রেষ্ঠ—বাংলা সাহিত্যের কোনো আলোচনাতেই যেন তিনি সেই পর্যায়ের কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এর যথার্থ কারণ কি? কবিধর্মের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রের একটি যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের

৯ 'ক্ষুধিত পাষাণ' ('গল্পগুচ্ছ'—২য় খণ্ড)-এর গদ্যরীতি দ্রষ্টব্য।

১০ 'শ্রীহস্ত', 'শুভদৃষ্টি', 'লক্ষ্মীশ্রী', 'কল্যাণীমূর্তি'—প্রভৃতি রচনাগুলি দ্রষ্টব্য।

ধ্বনিগৌরব, বর্ণময় বর্ণনা ও চিত্রধর্মিতার কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, —চিত্রের সঙ্গে এর যোগাযোগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বলেন্দ্রনাথ সেই চিত্রধর্মী রীতির গদ্যলেখক। সুতরাং চিত্রধর্মী সংস্কৃত কাব্য ও চিত্র—এই দুয়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বহিরাশ্রয়ী নয়, আত্মিক। সেইকালের একটি বিমুগ্ধ শিল্পদৃষ্টি যেন এই অনভিজাত যুগে মাত্র কদিনের জন্য অভিশপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু তখনও সেই রসাবেশ যেন সম্পূর্ণ কাটে নি। বলেন্দ্রনাথের ছত্রে ছত্রে তারই পরিচয়। বলেন্দ্রনাথ সমালোচকের কর্তব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে যেন অজ্ঞাতসারে নিজের কথাই বলেছেন: "সকল সমালোচনার মধ্যে বিশ্লেষণ সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটির মধ্যে আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠে।"[১১] বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা সৃষ্টিমূলক। সাহিত্য ও শিল্প অবলম্বন করে বাসনালোকের স্বর্ণমেঘস্তর যেন নূতন মোহে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে। এইজন্য আধুনিক সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সমালোচনাকে 'সমালোচনার শিল্প'[১২] বলেছেন। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা বিশ্লেষণ-ধর্মী। তাই সমস্তখণ্ডকে এক করে সৌন্দর্য-নির্যাস ও সুকুমার রসবোধ সেখানে বড় হয়ে উঠেছে।

বিশ্লেষণী সমালোচনা মূলতঃ বুদ্ধি-নির্ভর; কিন্তু সৃষ্টিমূলক সমালোচনা এক ধরণের সৃষ্টি। 'দুষ্মন্ত', 'যশোদা' প্রভৃতি চরিত্র-চিত্র এক প্রকার নবসৃষ্টি। সাহিত্য ও চিত্রের এক প্রকার আস্বাদনরস আছে—সেই রস পাঠকচিত্তের বাসনালোকে যে মৃদু স্পন্দন জাগায়—তারই ফলে একটি নূতন রূপলোক ফুটে ওঠে; বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা তাই। এইজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনায় সচেতন জাগ্রত-বুদ্ধি অনুপস্থিত; বর্ণগন্ধশব্দ-মন্থর কল্পজগতের সুখাবেশ-মগ্ন আবিষ্ট অনুভবই তাঁর অধিকাংশ সমালোচনার নিয়ন্ত্রী। সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌন্দর্যসাধক বলেন্দ্রনাথের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। কারণ বলেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ নন্দন-বিলাসী লেখক—বোধহয়

১১ 'স্বভাব ও সাহিত্য' : 'ভারতী ও বালক', অগ্রহায়ণ, ১২৯৬।

১২ 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' : 'বাংলার লেখক'—প্রমথনাথ বিশী।

সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে বড় সীমা। রবীন্দ্রনাথও এক সময় এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন—'কড়ি ও কোমল' থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত কাব্যসাহিত্যের মূলসুর ইন্দ্রিয়-সচেতন সুখচারী বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত সৌন্দর্যের নন্দন-মায়াস্বপ্ন; কিন্তু পরিণত-মানসে এই সৌন্দর্যের বাসর তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি—নূতন সত্যের দিগন্ত অনুসন্ধান করতে হয়েছে—তাই বার বার কবিকণ্ঠে দ্বিধার আর্তনাদ। এই হিসেবে বলেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য-সাধক হয়েও পূর্ণ নন। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে কোনো কোনো লেখক তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় গদ্যশিল্পী মনে করেছিলেন।[১৩] এই মত সমকালীন সমালোচকের আতিশয্য-রঞ্জিত উচ্ছ্বাস মাত্র। কারণ বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ মোহগ্রস্ত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনায় মোহ থাকলেও তিনি অনায়াসে মোহোত্তীর্ণও হয়েছেন। কীট্সের সৌন্দর্যসম্ভোগ যত বড় হোক, শেক্সপীয়রের অনাসক্ত সত্যদৃষ্টি থেকে বহুদূরে, তুলনায় এই বোধ পুরাতন জগতাশ্রয়ী একটি খণ্ড পৃথিবীর দ্বৈপায়ন-স্বপ্নচারণা মাত্র। বলেন্দ্রনাথের জগৎ 'ইস্থেটিক্সের' জগৎ,—সুন্দর হলেও মহৎ নয়, তিনি "good artist" কিন্তু "great artist" নন—এইখানেই তাঁর প্রতিভার নির্ধারিত সীমা।

৫

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সম্পর্কে রসিক সমালোচক তাঁর মুগ্ধমনের নিবেদন জানিয়েছেন: "বলিব কি, ঘরের দরজা খুলিয়া পরম বন্ধুর মত হাতে ধরিয়া যে জগতে আমাদের টানিয়া আনিলেন বলেন্দ্রনাথ সেখানে বর্ণবিচিত্র শোভাযাত্রা কখনও ফুরায় না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসে ললিতে ইমনে কেদারায় বাহারে বেহাগে অনুক্ষণ কোন্ সানাই বাজিয়া চলিয়াছে?…অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষীভূত আর অপরিচিতকে পরিচিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক অণুবীক্ষণ

১৩ "বসুমতীর যে লেখক যে বলিয়াছেন, "বলেন্দ্র সুলেখক…তেমন শব্দ-লালিত্য, ভাবমাধুর্য অলঙ্কারের সামঞ্জস্য অনেক সময়ে খুল্লতাত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ"—ইহা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়।"—'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর': প্রিয়নাথ সেন।

ও দূরবীক্ষণ দুই যেন ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয়।[১৪] সংযত সাহিত্য ও চিত্রসমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের রচনার এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত সমালোচনা বলেন্দ্রনাথের চিত্ররীতির প্রথম ধাপ এবং এই রীতির পরিণতি ঐতিহাসিক স্মৃতিমূলক অথবা ইতিহাস-রসাশ্রিত প্রবন্ধাবলীতে। এই শ্রেণীর রচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়ঃ 'কণারক', 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'বারাণসী' প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করেছে। প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার একটি পার্থক্য আছে। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তথ্যসন্নিবেশের মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্যের সমীপবর্তী হওয়ার প্রয়াস সুপ্রকট—সেখানে তথ্য ও যুক্তির সমান্তরাল গতি—নির্ধারিত এলাকার বাইরে তার যাত্রা নিষিদ্ধ। এই জাতীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রধানত গবেষণার সততাই কাম্য—বস্তুর গৌরবই তার শ্রেষ্ঠ গৌরব। কিন্তু রসস্রষ্টার কাছে ইতিহাসের বস্তু-অংশ গৌণ। বস্তু ছাড়া ইতিহাসের আর একটি দিক আছে—সেদিক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-রসের দিক। স্রষ্টার আপন কালের সঙ্গে যে ব্যবধান আছে, সেই অংশটুকু ভাব ও ভাবনার আস্বাদনে পরম রমণীয় করে তোলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই কালগত ব্যবধানকে বলেছেন—"চিত্ত বিস্ফারক দূরত্ব"[১৫]—ইতিহাস-নির্ভর রোমান্স রসের মর্মমূলে এই দূরত্বেরই কলধ্বনি। বলেন্দ্রনাথ ইতিহাসের বস্তু-অংশকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস-রসকে গ্রহণ করেছেন। উড়িষ্যার ঐতিহ্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বলেন্দ্রনাথের মনে একটি গভীর প্রভাব মুদ্রিত করেছিল। বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পীমন অতীত উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে ভাবচ্ছটার বর্ণ-বিচিত্র কলাপ বিস্তার করেছে—বাসনায় ও বেদনায় সে রূপ তুলনাহীন।

---

১৪ 'চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' : কানাই সামন্ত—'শনিবারের চিঠি', মাঘ, ১৩৬০।

১৫ 'ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহার শৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি ও করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ('ঐতিহাসিক উপন্যাস' : 'সাহিত্য')

'খণ্ডগিরি' প্রবন্ধটিতে অতীত স্মৃতির মনোরম পর্যালোচনার সঙ্গে প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্মজীবনের একটি স্বল্পপরিসর পরিচয় রেখা আছে—বক্তব্যকে একটি কথায় সূত্রান্বিত করা হয়েছে: "খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্মযুগের সমাধি।"—এই চারুশিল্প-রচিত গুহার চারিদিকে কত মুখর ইতিহাস—বিগত দিনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গম্ভীরনাদী ত্রিশরণ-মন্ত্রোচ্চারণ, গিরিপ্রাঙ্গণে সান্ধ্যঘণ্টার নিনাদ—গুহায় গুহায় গন্ধধূপের উৎসব—সেদিনের মুখরশৈলশিখর চোখের সামনে জেগে ওঠে। ভারতবর্ষের ধর্মজাগরণ ও শিল্পবৈভবের নিদর্শন এই খণ্ডগিরি। প্রায় দশ বছর আগে তীর্থগামী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও ভারত-ঐতিহ্য ও ভারত-শিল্পের এই বিচিত্রভূমি অপরূপ বলে বোধ হয়েছিল—সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রও আবেগ-অধীর হয়ে বলেছিলেন: "...চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মতো হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?"[১৬] বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আবেগের তীব্রতা না থাকিলেও বলেন্দ্রনাথের প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি প্রগাঢ়, এই শ্রেণীর রচনাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্থল। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' প্রবন্ধটিরও মূল সুর প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্পপ্রয়াস ও ধর্মজীবনের ঐক্য। শিল্পরীতির গ্রীকপ্রভাব ও হিন্দুপ্রভাব বৌদ্ধকে কিভাবে কঠোর নীতিচর্চা থেকে শিল্পকলার ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল, তারই মনোরম আলোচনা। মন্দিরের দেশ উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় পথে দাঁড়িয়ে বলেন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির ভাবলোকে একটি রমণীয় স্মৃতিদৃশ্য জেগে ওঠে: "সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরষোত্তমের দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনো ছায়াসুপ্ত,

১৬ প্রথম খণ্ড—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: সীতারাম।

কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।" 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রবন্ধে উড়িষ্যার বিগত দিনের কথা আলোচনা করতে বসে লেখক একটি সঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বর্তমানের হৃতগৌরব উড়িষ্যার সঙ্গে ঐশ্বর্যময় প্রাচীন উড়িষ্যার তুলনা দিতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের কথাই বেদনার ভাষায় রূপ পেয়েছে। প্রাচীন উড়িষ্যার প্রসাধনকলা, জীবনচর্যা, ধর্মজীবন প্রভৃতির স্বল্পায়ত এক একটি ছবি ফুটেছে। বলেন্দ্রনাথের এই 'ভারত পন্থা' মহিমোজ্জ্বল—দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার প্রান্তে দাঁড়িয়ে মন্দিরময় উড়িষ্যার পরিত্যক্ত জীর্ণ মঠ-মন্দিরের দিকে চেয়ে সেই গৌরবান্বিত অতীতের কথা মনে হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমিকতার সঙ্গে অতীতমুগ্ধ রোম্যান্টিকতার বেদনা মিশে আছে। মাঝে মাঝে স্মৃতিরোমাঞ্চিত উজ্জয়িনীর ভাবনামুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। 'বারাণসী' প্রবন্ধটির মধ্যেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা আছে—বারাণসীর ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার পতন-অভ্যুদয়ের গভীর সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধটিতে একটু তথ্যালোচনার প্রাধান্য থাকার জন্য এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রবন্ধের মতো রসোত্তীর্ণ হয় নি।

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে 'কণারক' প্রবন্ধটিই সর্বশ্রেষ্ঠ – বলেন্দ্রনাথের যে ক'টি রচনায় তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্য ও গদ্যরীতি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে এই প্রবন্ধটি তার অন্যতম। একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় অবলম্বন করে বলেন্দ্রনাথের মণি-মাণিক্যদীপ্ত ভাষা ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। কণারকের পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপে কোনো এক বিলুপ্তকীর্তির মায়াজাল বিস্তৃত। লেখক সেই মায়া-জালের মাঝখানে জড়িয়ে পড়েছেন—কোনো এক পুরাতন উপকথার নির্জন মহিমাতটে তাঁর তৃষাতুর দৃষ্টি মৌন-ব্যথায় স্তম্ভিত হয়ে আছে।—কিন্তু সেই উদাসীন বেদনাই বা কী অপরূপ: "কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।"—একটি বিলীয়মান গরিমার বিস্ময়কর চিত্র। বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেন্দ্রনাথের এই রচনাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "মন্দির"

প্রবন্ধটির তুলনা করেছেন।[১৭] অবশ্য রচনা দুটির মধ্যে অনেকখানি ভাবগত সাদৃশ্য আছে—একটি কণারকের মন্দির, আর একটি ভুবনেশ্বরের মন্দির। ভুবনেশ্বরের প্রস্তরপুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ অতীত ইতিহাসের স্তম্ভিত মূর্তি দেখেছেন: "যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নব জীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্র বৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে।"[১৮] কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনাটির সুরধর্মিতা ও শাব্দিক ইন্দ্রজাল যে মায়াময় স্বপ্নরাজ্যের ইঙ্গিত দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি 'উড়িষ্যা-সম্পর্কিত' অন্য দুটি রচনার সমকক্ষ হলেও, 'কণারক' রচনাটির মূল্য স্বতন্ত্র। 'কণারক' ও 'মন্দির'—এ দুয়ের মিল নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী। 'কণারক' সেই প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার ঘিরে যে বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাসের ছায়া হৃদয়াবেগের স্পন্দনে আলোড়িত 'মন্দির' প্রবন্ধে সেই জাতীয় দীর্ঘ-বিসর্পী ব্যঞ্জনা কোথায়? এই ব্যঞ্জনাটুকুই এর প্রাণ। অন্ততঃ এই রচনাটিতে বলেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃব্যের অনুরূপ রচনাকে অতিক্রম করেছেন।

৬

বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রবন্ধকে বিশুদ্ধ বর্ণনামূলক রচনা বলা চলে। 'আষাঢ় ও শ্রাবণ', 'শরৎ ও বসন্ত', 'বোম্বাইয়ের রাজপথ,' 'লাহোরের বর্ণনা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে বর্ণনাই মুখ্য, তা সে কোনো জায়গার বর্ণনাই হোক, অথবা কোনো প্রকৃতির বর্ণনাই হোক। বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনাতেও বিষয়বস্তুর এমন কিছু অসাধারণত্ব নেই, কিন্তু অতি সামান্য বিষয়কে নিয়েই বলেন্দ্রনাথের স্পর্শ-সচেতন মন শততন্ত্রী বীণার মতো ঝঙ্কার তোলে। প্রত্যেকটি বস্তু-অংশ যখন নূতন দেখায় ও নূতন ভাবনায়

১৭ 'বাংলা সাহিত্যের একদিক': শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

১৮ 'মন্দির': 'ভারতবর্ষ'।

রসায়িত হয়ে ওঠে, তখন নূতন এক একটি ভাবচ্ছবিতে পরিণত হয়। এর কোনোটি বা ল্যাণ্ডস্কেপ, কোনোটি বা রেখাচিত্র, কোনোটি আবার হয়তো বহুবর্ণরঞ্জিত স্থিরচিত্র। সবটুকু মিলে এক বিস্ময়কর কবিদৃষ্টি রচনাগুলির নেপথ্যরাগিণী। এখানেও বলেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে। 'বোম্বাইয়ের রাজপথ' রচনাটি কয়েকটি চলমান ছবির শোভাযাত্রা—লেখক নিপুণতার সঙ্গে সেই ছবিগুলি তুলে নিয়েছেন। বোম্বাইয়ের ভৌগলিক পরিমিতিকে অতিক্রম করে যে দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হয়েছে তা একজাতীয় ভাবরূপ—বলেন্দ্রনাথের কবিমনের পক্ষে প্রাচীন কণারক অথবা দূরকালের উজ্জয়িনীর কোনো প্রয়োজন নেই, আধুনিক বোম্বাই বা লাহোরই তাঁর ভাবচ্ছবি রচনার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি কলকাতা ও বোম্বাই শহরের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন ও বোম্বাইয়ের তুলনায় কলকাতার বর্ণ-দৈন্যের কথা বলেছেন, তা পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় বর্ণনার কথা মনে পড়বে।[১৯] কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনাটির বৈশিষ্ট্য অন্যত্র—অত্যন্ত প্রাত্যহিক ও কাছের জিনিসকে নিয়েই তাঁর কল্পনার ভ্রমরী কলগুঞ্জন করে ওঠে। আধুনিক বোম্বাই শহরকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা অতীতকালের বিলুপ্ত নগরীর ভগ্নস্তূপ-দেখা দৃষ্টির চেয়ে কেনো অংশে কম রমণীয় নয়—সর্বত্র মোহবিজড়িত একটি স্বপ্নাবেশ : "সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাই-পুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একটি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামলিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেল-তরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবন মধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে।"—'লাহোরের বর্ণনা' একটি অসমাপ্ত রচনা। আর্যসমাজের কর্মোপলক্ষে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল—'লাহোরের বর্ণনা' রচনাটি তারই ফল। রচনাটি অসমাপ্ত—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বর্তমান লাহোরের মধ্যে লেখক দেখেছেন 'আরব্যমরীচিকার ছায়া'। বাগ্‌দাদের অসংখ্য বিস্মৃত দিনের কথা তাঁর

১৯ 'বোম্বাই শহর' : 'পথের সঞ্চয়'।

মনে পড়েছে। পাঞ্জাবের বসন্ত বর্ণনার স্বল্পায়ত চিত্রটি বর্ণ-গন্ধ স্পর্শাতুরতা ও মদির বিশ্ব-প্রকৃতির অবারিত প্রাচুর্য-রূপ-সমৃদ্ধ: "বেগবান পবন তাহার বাহন, সূর্য তাহার রথচক্র, এবং রৌদ্রোজ্জ্বল বসন-প্রান্তে শুভ্র বিকশিত নাসপাতির ফুল এবং তাহার রেণুপাটল দোধূয়মান উত্তরীয়চ্ছন্দে নেবুমঞ্জরীর সৌরভ।"—বিশ্বপ্রকৃতির এই সহজ 'পারসোনিফিকেশ্যান' সংস্কৃত কাব্য-রসিকের কাছে বিচিত্র নয়।

কালিদাসের 'ঋতুসংহার'-এর পাঠকের কাছে এ চিত্র এমন কিছু নূতন নয়। সংস্কৃত কাব্যসমালোচক বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় কবিদেরই পন্থানুসারী।

বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা 'পার্সোনাল এসে'-জাতীয়। বর্তমানকালে এই শ্রেণীর রচনার ক্রমপরিণতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে। ঋতুবর্ণনামূলক রচনাগুলির মধ্যেও ব্যক্তিগত সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এখানে রচনারীতির একটি বিশিষ্ট সমন্বয় লক্ষণীয়। একদিকে চিত্ররীতি ও আর একদিকে সঙ্গীতরীতি কোথাও এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখা দেয় নি। 'আষাঢ় ও শ্রাবণ' রচনাটিতে আত্মভাবমুগ্ধ কবিহৃদয় খুব সহজেই আষাঢ় ও শ্রাবণের অন্তঃপ্রকৃতির পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছে। কাব্যবর্ণিত এই দুটি মাসের বর্ণনায় লেখকের মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি-মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি উদ্ধবদাসের দুটি পদের তুলনা দিয়ে লেখক রসিক সমালোচকের ভূমিকাও নিয়েছেন: "আষাঢ়ের দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে—কোথায় আশা, কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মতো সে-ও যদি আসে। শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।"—'শরৎ ও বসন্ত'-ও এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু এই রচনাটিতে সঙ্গীত-রীতিটি গৌণ। কাব্যবর্ণিত শরৎ ও বসন্তের চিত্র ঘিরে একটি ভাবচ্ছবির অপরূপত্বের প্রকাশ—ভাবচ্ছবির প্রকাশের জন্য যে দৃষ্টিনিপুণ কবিমনের প্রয়োজন বলেন্দ্রনাথের সেই ক্ষমতা ছিল, তাই প্রচলিত কতকগুলি কবি-প্রসিদ্ধির সঙ্কলনে পর্যবসিত হয় নি। ঋতু-আশ্রয়ী ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলির মধ্যে

'শ্রাবণের বারিধারা' রচনাটি শ্রেষ্ঠ। কবির কল্পবৃত্তি যেন শ্রাবণ-ধারার মতোই বিগলিত।—শ্রাবণের নিবিড় ধারাবর্ষণে, আলোছায়ার অস্পষ্টতায় যে আবেশ ঘনিয়ে ওঠে তারই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের হৃদয়ের একটি ঘনিষ্ঠতা আছে। বলেন্দ্রনাথের ভাবাবিষ্ট মনের নিকটতম প্রতিবেশী শ্রাবণ—তাই শ্রাবণের গহন-গভীরে ছায়াচ্ছন্নপ্রায় কবিমন অবগাহনের আনন্দে উতলা হয়ে উঠে: "তুমি শুধু ঝরিয়া যাও—তোমার ঝরঝরে বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন কাব্য রচিত হোক। আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।"—এ যেন সেই কবি-বর্ণিত "তোমার রূপে মরুক ডুবে, আমার দুটি আঁখির তারা।"—ব্যক্তিগত প্রবন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে আপন রসানন্দটুকুর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

'ঊষা ও সন্ধ্যা', 'গোধূলি ও সন্ধ্যা', 'সন্ধ্যা', 'ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গা' প্রভৃতি রচনায় বলেন্দ্রনাথের ভাবুকতা, কল্পনাশক্তি ও গীতিধর্ম প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির উপযুক্ত। কাব্যের ক্ষেত্রে বলেন্দ্র-প্রতিভার সমগ্রতা নেই, অনেক অপরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান—কিন্তু গদ্যে রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিতে বলেন্দ্রনাথের কবিশক্তির পূর্ণতা আছে। রচনাগুলি স্বল্পায়ত, এক একটি স্ফটিক-দ্যুতি ভাব-বিন্দুর মতো—রচয়িতার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি-পুরুষের স্পষ্ট প্রতিফলনে উদ্ভাসিত। সেই ভাব-বিন্দুটুকুকে কবির হৃদয়-শিহরণ একটু আলোড়িত করে—মৃদু-স্পন্দনের বিস্তার একটু সুখাবেশ-স্নিগ্ধ লীলা-লাবণ্য জাগিয়ে তোলে—সেইটুকুই এই জাতীয় রচনার প্রাণ।

'চন্দ্রপুরের হাট', 'বনপ্রান্ত', 'পুলের ধারে', 'পুরাতন চিঠি', 'জানালার ধারে', প্রভৃতি রচনা বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও আত্মনিষ্ঠ রচনা। প্রথম তিনটি রচনায় কিছু অপরিণতির চিহ্ন আছে—কিন্তু আত্মনিষ্ঠ স্বগত-ভাষণের সঙ্গে পরিতৃপ্তির আমেজটুকু সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত। কোন কোনো সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের বড় লক্ষণ তার অন্তরঙ্গভাষণ।[২০] খুব অল্প বয়স থেকেই বলেন্দ্রনাথ এই আর্টে সিদ্ধকাম। 'চন্দ্রপুরের হাট' এবং 'বনপ্রান্ত'—রচনা দুটি পল্লীগ্রামের সহজ সুন্দর রেখাঙ্কন বিস্তৃত

২০। "Most of us think of the ideal essay as a kind of private rather than of public talk",—Robert Lynd.

চিত্রপট এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু এখানে শুধু পল্লীপ্রকৃতিই নেই, পল্লীর মানুষের সমস্যা-বিরল জীবনটুকুও আছে। এই দুটি রচনায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মধ্যপথ অবলম্বন করা হয়েছে—ভাষা ঘরোয়া, অথচ বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির সহজ-স্নিগ্ধতা অলক্ষ্যগোচর নয়। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীর মানুষের এই দৃশ্যসৌন্দর্যকে একটু দূর থেকে অলস ভাবদৃষ্টির সাহায্যে গেঁথে তুলেছেন। বলেন্দ্রনাথের এই সহজ অরুগ্ন অথচ অতিতুচ্ছ জীবনের আকর্ষণ চকিতে এক একবার বিভূতিভূষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'জানালার ধারে' ও 'পুরাতন চিঠি'। এখানে বক্তব্য সামান্যই, প্রায় কিছু নেই বল্‌লেই হয়—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতিতে যৎসামান্যই অসামান্য হয়ে ওঠে। ছোট্ট একটু ঘর, আসবাবপত্রও সামান্যই, সামনের ডেস্কে লেখার সরঞ্জাম—চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে অলসভাবে শুধু চেয়ে দেখা—কোলের ওপর অস্পষ্ট চন্দ্রালোক। বাহিরের পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিস্মৃত হয়ে এই নির্জন-নিভৃতে আপনার মনে শুধু খেলা করা: "আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হইনা, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানব-হৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"—ইংরেজ কবি বর্ণিত "Sad music of the humanity" বলেন্দ্রনাথের কাছে অনায়াস-আয়ত্ত—এত গভীর তাঁর অনুভবশক্তি! 'পুরাতন চিঠি' রচনাটি ব্যক্তি-বলেন্দ্রনাথের শেষ আবরণটুকুও উন্মোচিত করেছে—আমাদের কাছের মানুষ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছেন যেন। 'পুরাতন চিঠি'র এক জাতীয় রস আছে—সে রস পুরাতনের রসও বটে, আবার পত্রলেখকের হৃদয়ের রসও বটে। 'পুরাতন চিঠি'র কালির ঈষৎ ম্লান রেখার বহু স্নেহ-সখ্যের নিদর্শন আছে। চিঠিগুলির প্রতি অপরিসীম মায়া ও স্নেহানুগত্য রচনাটির মধ্যে স্বতোৎসারিত—এই চিঠিগুলি কর্মবিরল মুহূর্তের নিভৃত আস্বাদনকে পরিতৃপ্ত করে। চিঠির মধ্যে ব্যক্তিত্বের আস্বাদন আছে—সেই বন্ধু-ব্যক্তিত্ব-মুগ্ধ একটি বিরল ভাবুকতা এই সংক্ষিপ্ত রচনাটির মধ্যে বিস্তৃত। বলেন্দ্রনাথের স্মৃতি-চেতন মনের পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক স্মৃতি পরিবেশনের মধ্যে আছে, কিন্তু সে পরিচয় স্মৃতিচারণার রাজপথ, গরিমাময় ঐতিহাসিক পথ

'পুরাতন চিঠি' প্রবন্ধটির স্মৃতিরসের জন্য কোনো গৌরব-মুখর ইতিহাসের প্রয়োজন নেই, বন্ধুজনের পুরাতন চিঠির বিবর্ণ পাতাগুলিই যথেষ্ট। এগুলি যেন স্মৃতির প্রায়ান্ধকার গলিপথ। কিন্তু তার মূল্যও কি কম? বন্ধুর এক-টুকরো পেন্সিলে আঁকা স্বহস্ত-অঙ্কিত অর্ধসমাপ্ত ছবি—সব কিছু তুচ্ছ আজ অসামান্য গৌরবে উদ্ভাসিত: "আমি বর্তমানশ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তি লাভ করিতে আসি। চুপি চুপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধি-মন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত।"—বলেন্দ্রনাথের সময়ে বাংলাসাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনার প্রথম যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না,—কিন্তু সেই সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে সুপরিণত রূপ চোখে পড়ে তা বিস্ময়কর।

৭

বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলির একটি বিশিষ্ট সুর আছে। এই সুর বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ বললেও হয়। স্বদেশ ও স্বদেশাত্মার যে উপলব্ধি তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী ঐতিহ্যপ্রীতির মধ্যে সঞ্চারিত, তাই আমাদের গৃহাঙ্গন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেও একটি কল্যাণ-সুন্দর জীবনাদর্শের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা শুধু ইতিহাসের দুর্গ প্রাচীরের আড়ালেই নিজেকে নিঃশেষিত করেনি, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার উপরেও তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে। আমাদের গৃহজীবনের আড়ালে, আচার-আচরণে, উৎসবে-লৌকিকতায়, রূপসজ্জায়-প্রসাধনে যে শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণরূপ ফুটে উঠেছে তাকেই তিনি তুলে ধরেছেন। বাঙালী গৃহস্থজীবনের কল্যাণস্নিগ্ধ মাধুর্যের যে একটি বিশেষ দিক আছে, বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টি তাকে বিব্রত করে নি। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে স্বাদেশিকতার যে দীক্ষা—তা শুধু বাইরের একটি যুগোচিত আচরণমাত্র নয়, তাঁর প্রত্যক্ষনিষ্ঠ উপলব্ধিও বটে—এইখানেই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের সমন্বয় হয়েছে। তাঁর সামাজিক রচনাগুলি থেকে তারই

প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আচার' প্রবন্ধ, 'পারিবারিক প্রবন্ধ,' 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাঙালীকে এই বিষয় সর্বপ্রথম সচেতন হতে বলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই বলেছেন: "বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের নহে, সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই: কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।[২১] —বলেন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রৌঢ় ফলশ্রুতির দিকেই রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের সচেতন করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে একটি উপদেশাত্মক ও নৈতিক দিক আছে—তাঁর বক্তব্য মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের ভাষা শিল্পীর নয়, নীতিবাদীর। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনায় কোনো উপদেশ অথবা নৈতিক শাসন নেই—তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়েই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনকে দেখেছেন। এই কারণে তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

'প্রাচ্য প্রসাধনকলা', 'নিমন্ত্রণসভা', 'শ্রীহস্ত', 'শুভদৃষ্টি', 'কল্যাণীমূর্তি', 'শুভ উৎসব', 'শিব-সুন্দর' প্রভৃতি রচনায় আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটি নম্র-সুন্দর মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে, আবার সৌন্দর্যের কল্যাণ-পরিণামের আদর্শও ধরা দিয়েছে। 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' প্রবন্ধে প্রাচ্য প্রসাধনের বৈশিষ্ট্য একটি বক্তব্যেই পরিস্ফুট হয়েছে: "প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্যভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।" —প্রাচ্য প্রসাধনকলার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সংযোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর—বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য থেকে রমণীয় রূপসজ্জা চয়ন করে নূতন একটি রূপ ফুটিয়ে

২১ বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (১৯০৭, আগষ্ট) ভূমিকা।

তুলেছেন, ভাষার ঐশ্বর্যে ও শব্দের ইন্দ্রজালে একটি স্বতন্ত্র রূপরচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য ও বর্ণ-পরিবর্তন প্রাচ্যনারীর প্রসাধনকলার রূপবৈচিত্র্যের মূল কারণ: "ঋতুতে ঋতুতে তরুলতা-পুষ্প-পল্লবে যেমন বিচিত্র রাগ-সঞ্চারে নব নব চাঞ্চল্য অনুভূত হয়, আমাদের স্ত্রীনিকুঞ্জেও সেইরূপ যেন কখনও নীলাম্বরীতে, কখনও কুসুম্ভরক্তবস্ত্রে, কখনও বাসন্তী বসনাঞ্চলে প্রকৃতির সেই অন্তরের পুলকরশ্মি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"—আমাদের সামাজিক উৎসব, সম্মেলন প্রভৃতির মধ্যে একটি ভাবাত্মক দিক ছিল। প্রসার ও ঔদার্যের দিক ছিল। বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণের দিক বড় হয়ে উঠেছিল। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সেদিনও কোন ভাঙন ধরে নি—অতিথির জন্য তার দ্বার ছিল অবারিত। তাই সেদিনের উৎসবে-নিমন্ত্রণে-লৌকিকতায় হৃদয়ের ভাগই অকুণ্ঠ হয়ে উঠেছে। একটি সুভদ্রসৌজন্য ও বিনয়-নম্রভাব তার মধ্য দিয়ে পরম রমণীয় মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। তাই বর্তমান-জীবনযাত্রার 'অফিসী' ছাঁচকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তিনি বাঙলাদেশের কল্যাণী গৃহ-বধূদের সম্বোধন করে বলেছেন: "হে গৃহিণি, তোমার তকতকে গৃহপ্রাঙ্গণে পুরাতন দিনের মতো আমাদিগকে আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"—আমাদের ব্রত-পার্বণ ও অনুষ্ঠান-সমূহের কল্যাণশ্রী তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রা ও গার্হস্থ্যচর্যায় যে স্নিগ্ধতা ছিল, তাকেই বার বার স্মরণ করেছেন—এইভাবে আমাদের অনুকরণ-বিলাসী বহির্মুখীদৃষ্টিকে পরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। অবশ্য আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্কোচন ও ভাঙনের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন নি। পুরোনো দিন যখন ফিরবে না তখন নূতন কালে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নূতন কাঠামোর ইঙ্গিত তাঁর রচনায় নেই। কিন্তু দেশ, জাতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ও জাতীয় আদর্শের প্রতি প্রীতিবোধ বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাকে একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে—যা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট।

বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার অধিকাংশই তাঁর জীবনের শেষ দিকে লেখা। এই সময় বলেন্দ্রনাথের নন্দন-স্বপ্ন একটি একটি বৃহত্তর পরিণতির দিকে চলেছিল। প্রথম দিকের সংস্কৃত-কাব্য-সমালোচনা প্রভৃতিতে এক জাতীয় নন্দনতত্ত্ব-বিলাসিতা ও কলা-কৈবল্যবাদের লক্ষণ ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখচারী সৌন্দর্যমুগ্ধতা একটি অপরিণত বাসনার মতোই আত্ম-বিহ্বল হয়ে উঠেছে—যেন রক্তিম সফেন-মদিরা। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত মন সেই রূপের রঙমহলেই পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। তাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চাকে সম্ভবত অপূর্ণ বলে বোধ হয়েছিল—তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে শুভবোধ, কল্যাণী শক্তিকেও অনুভব করতে হয়েছে। 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের কল্যাণ-পরিণাম সৌন্দর্যবোধের সুপরিণত আদর্শের কথা উচ্চারিত হয়েছে : "আমাদের মনে সৌন্দর্যের সহিত তাহার উপমা দিয়ে থাকি···।" সৌন্দর্যের পরিণতি প্রশান্ত-মধুর কল্যাণে, মঙ্গল ও শুভ বোধের দীপ্তিতে। সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হওয়াতে পারিবারিক ও গৃহজীবনের প্রাঙ্গণে তাকে সহজেই পাওয়া যায়। ভারত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এও একটি বড় দান—আমাদের গৃহজীবন ও সমাজজীবনকে কল্যাণে, পুণ্যে, সৌন্দর্যে রমণীয় করে তোলা হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের সুন্দর সুধারূপিনী—'সুধাপাত্র' ও 'বিষভাণ্ডে'র দ্বন্দ্ব তাঁর কবিচরিতে নেই।[২২] সৌন্দর্যের লক্ষ্মীসত্তাই তাঁর উপজীব্য, উর্বশীর অপ্সর-বিলাসকে তিনি দেখতে পান নি। 'বলাকা' কাব্যের 'দুই নারী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে পরিচয় দিয়েছেন! আবার বলেন্দ্রনাথ কীট্স-ধর্মী হয়েও কীট্স নন—কীট্সের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যেই সিদ্ধি। কিন্তু তিনি এক সময় সৌন্দর্যের ওপরে আরো কিছু চেয়েছিলেন। সে চাওয়া বোদ্‌লেয়ারের মতো বিষপুষ্পের অনুসন্ধান নয়, আপাত অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের লীলাচিত্রণ নয়, সে চাওয়া

---

২২ বলেন্দ্রনাথ নিজেই একটি কবিতায় বলেছেন :

আমি নহি নীলকণ্ঠ, নাহিক সে ক্ষুধা
নিতে পারি যাতে বিষে সুধা সম করি',
হে সুন্দরি, তাই সদা ডরি মনে মনে
কি জানি গরল উঠে অমৃত মন্থনে!
—'আশঙ্কা' : "মাধবিকা"।

সুন্দরেরই বিশ্বাস-মুগ্ধ অনুসরণ—যার আর এক নাম কল্যাণ। বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধি ও সীমা এখানেই।

৮

বলেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে কজন গদ্য-শিল্পী বাংলা গদ্যকে শিল্প-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছিলেন, বলেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকেও বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বলেছেন: "এই রচনাভঙ্গীই আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল; এমন যত্নে গাঁথা শব্দের মালা তাহার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল; শিক্ষানবিশী অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু শব্দগুলিকে বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে মানাইবে ভাল তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিগরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উৎসমূল অনুসন্ধান করতে হলে দুটি সূত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রথমটি হলো রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। রবীন্দ্র-জীবনের বিশেষ একটি পর্বে যে-জাতীয় গদ্যরীতি উৎকর্ষলাভ করেছিল, তার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রভৃতি সঙ্কলনের অনেকগুলি রচনার সঙ্গেই বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার গভীর যোগ অনুভব করা যায়। ভাষার প্রসাধনকলা, অলঙ্কৃত বাগ্‌বৈভব, সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলির মন্থর পদবিক্ষেপ, মহিমা-সুগম্ভীর অভিজাতশ্রী, আবেগদীপ্ত কাব্যধর্মিতা বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম। সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব আরো স্পষ্ট। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত পর্যন্তও

অনুসরণ করা হয়েছে। অবশ্য, সুদীর্ঘ কবি-জীবনের মধ্যে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির বিচিত্র অনুসন্ধান চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির অনুসরণ করলে তার নানা স্তর চোখে পড়বে। রূপ-রীতি ও আঙ্গিকের বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবাহ অগ্রসর হয়েছে। কবি বারবার তাঁর সৃষ্টিকে অতিক্রম করেছেন। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকীয় গদ্যরীতিই মোটামুটি আদর্শ ছিল। এই কাঠামোর উপরেই তিনি যত্নে ও কৌশলে এক শিল্প-সুষমামণ্ডিত গদ্যরীতি গড়ে তুলেছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির দ্বিতীয় উৎস সংস্কৃত সাহিত্য। তাঁর গদ্যরচনার একটি প্রধান অংশের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃত-সাহিত্যের সমালোচনাগুলি বাদ দিলেও নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিদগ্ধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে মূলের ভাষা ও শব্দ-বিন্যাসকে তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তৎসম শব্দ-সমন্বিত সমাসবদ্ধ বাক্যাংশগুলি বর্ণনামুখ্য ও চিত্রধর্মী গদ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় দণ্ডকারণ্যের আরণ্যক সৌন্দর্যের ভীষণ-রমণীয় চিত্র উদ্‌ঘাটনে বলেন্দ্রনাথের চিত্র-নৈপুণ্য মুখর হয়ে উঠেছে ঃ

"কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ দৃশ্য ; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর ঝরঝর-মুখরিত ; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্যন্ত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্বলোকলোমহর্ষক—এখানকার গিরিগহ্বরসকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কুজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জনধ্বনিত, কোথাও বা গভীরগর্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত-অগ্নি ; কোথাও গর্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।"

মূলের শব্দ-বিন্যাস, ভাষা ও ভাবকে পর্যন্ত আত্মসাৎ করে বলেন্দ্রনাথ যেন এক একটি রমণীয় শব্দ-চিত্র এঁকেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে বলেন্দ্রনাথ উক্ত ভাষার শব্দ-বিন্যাস ও বাঁধুনিকে যত্নের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন। ভাষাকে অনেকখানি মেজে-ঘষে পালিশও

করেছিলেন। তাঁর স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য-জীবনের মধ্যে ভাষাচর্চার তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বলেন্দ্রনাথের শব্দচয়ন-দক্ষতা-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন বলেছেন: "তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনিই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাঙ্গালা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।" শব্দচয়ন-নৈপুণ্যের এই অবাধ অধিকারও সংস্কৃত সাহিত্যের দান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধটিতে 'কাদম্বরী'-কাব্যের চিত্রধর্মিতার কথা বলতে গিয়ে তাকে 'চিত্রশালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা সম্পর্কে একই উপমা প্রয়োগ করা যায়। 'মৃচ্ছকটিক' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন।" সংস্কৃত কাব্য-নাটক-আখ্যায়িকার চিত্রধর্মিতা বলেন্দ্রনাথের মানস-জীবনেও যেন সংক্রামিত হয়েছিল। এই ছবিগুলির সঙ্গে তিনি তাঁর হৃদয়ের অংশটুকু যোগ করে দিয়েছেন। তাই ছবিগুলি তাঁর বিদগ্ধ মনের অন্তরঙ্গস্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'ক্লাসিক্যাল', 'রোম্যাণ্টিক' প্রভৃতি পর্ব বিভাগের কোনো প্রচেষ্টা হয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের মোটামুটি একটি চরিত্র-লক্ষণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, গদ্যরীতির যে ক্লাসিক্যাল রূপ দানা বাঁধার চেষ্টা করেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তা ক্রমশই 'রোম্যাণ্টিক' হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে ক্লাসিক রীতির স্পষ্টতা, ঋজুতা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণদক্ষতা শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরও মূলত গদ্যরীতির ক্লাসিকমার্গেরই পথিক। যদিও তাঁর রচনায় অনেক সময়েই ক্লাসিক্যাল ও রোম্যাণ্টিক রীতির সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে, তবুও মনোধর্মের দিক থেকে তিনি প্রথমোক্ত রসেরই সাধক। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। তিনি রবীন্দ্রানুসারী রোম্যাণ্টিক ভাবনার কবি। তাঁর 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কাব্যদ্বয়ে কবিকল্পনার এই বিশিষ্ট সাধনাই জয়যুক্ত হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ব্যক্তিহৃদয়ের বাসনা-বেদনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য ও চিত্র সমালোচনায় এই ব্যক্তিগত সুরের প্রভাবে অনেক সময়

বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে ক'টি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেখানে বুদ্ধিদীপ্ত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ একেবারেই চোখে পড়ে না। স্বভাবসিদ্ধ সাবলীল ভাষায় তিনি সংক্ষেপে আখ্যায়িকা-অংশ বিবৃত করে নিজের ধারণাগুলি প্রকাশ করেন। সমাজ-সম্পর্কিত প্রবন্ধের মধ্যেও সমাজ-বিশ্লেষণ ও সামাজিক সমস্যার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেয়েও তাঁর 'শিবসুন্দর'-ভাবাদর্শটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। সৌন্দর্যের কল্যাণ-রমণীয় আদর্শটিকেই তিনি সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের রচনার মূল স্বর সৌন্দর্য। সমাজ সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও তাঁর এই বিশিষ্ট ভাবাদর্শই প্রাধান্য লাভ করেছে।

বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনাই 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' জাতীয়। কোথায়ও তুচ্ছ বিষয় ঘিরে তাঁর কল্পনা-সমৃদ্ধ মন বিচিত্র লীলায় বিলসিত, আবার কোথায়ও বা সামান্য কোনো উপলক্ষ্য নিয়ে তাঁর ভাববৃত্তিগুলি লঘুস্বচ্ছ মেঘখণ্ডের মতো স্বচ্ছন্দবিহারী। বলেন্দ্রনাথের মনটিই এমন যে অন্তর্গূঢ় ভাবলোকে প্রবেশ করতে তার কোনো উপলক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। 'জানলার ধারে' রচনাটির কোনো বস্তু বা উপকরণ নেই, কিন্তু মুগ্ধ মনের বিভোরতা আছে ঃ

"আমি কেবলি জানলার ধারে বসিয়া দেখি, আর অনুভব করি। রজত-প্লাবিত নীল আকাশ, জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠিতা নীল নিশীথিনী, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ব্যাপিয়া এক অনন্ত জ্যোৎস্নালোক, আমার এই ঘরে শুধু চঞ্চল আলোকবিস্তারের পার্শ্বে সুখসুপ্ত নিভৃত ছায়া। সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় তাঁর মগ্নমনের নিভৃত ভাবনার যে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে, তা বিস্ময়কর। আবার তাঁর গদ্যরীতি নিভূর্ষণ নয়। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, অলঙ্কারের দীপ্তিতে, বর্ণনার ঘনবদ্ধতায় ও কল্পনার ইন্দ্রজালে তাঁর গদ্য

বহুদিনবিস্মৃত এক একটি যুগের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে। তাই বলেন্দ্রনাথের গদ্য ঐতিহাসিক স্মৃতিরচনায় নিপুণ, কারণ অতীতকে অবলম্বন করে কল্পনাবিস্তারের সুবিস্তীর্ণ অবকাশ পাওয়া যায়। বলেন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ অবকাশকে কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত করেছেন। রাজকুমারীর বিবাহ-আয়োজনের নিতান্ত আনুষঙ্গিক যারা—সেই রক্ষী ও নর্তকীরাও বলেন্দ্রনাথের কল্পনা-উৎসব থেকে বাদ পড়ে নি:

"দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিবর্গ—আসমানী গোলাপী শ্বেত পীত হরিদ্বর্ণের আজানুতলবিলম্বিত বসনোপরি সোনালী জরীর কটিবন্ধে নিবদ্ধ গাঢ় বেগুনী মখমলের ছোরার খাপ, স্কন্ধে সুবর্ণমণ্ডিত চারুদণ্ড, এবং তাম্বুল রাগরক্ত অধরে সচেতন পদমর্যাদার ঈষৎ স্মিতভাব। এবং এই সুরঞ্জিত দৃশ্যপটে পার্শ্ববর্তিনী নর্তকীদিগের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিঘূর্ণিত ও বিচ্ছুরিত জরীর পাড়ের ঢাকাই মুসলিনের গিলা করা পেশোয়াজের মধ্য হইতে ঈষদ্ব্যক্ত বিবিধবর্ণের চুড়ীদার পায়জামা ও পিনদ্ধ কঞ্চুলিকানিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনকযৌবনমোহ সঞ্চারিত হইয়া যেন বসন্তমদোন্মত্ত বুলবুলের গীতমুখরিত সিরাজপুরীর একখানি সুন্দর মরীচিকা রচনা করিয়াছে।"

উদ্ধৃত অংশটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিতপাষাণ' গল্পের অনুরূপ অংশটির কথা মনে পড়বে। ভাবে, ভঙ্গিতে বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি যে রবীন্দ্রগদ্যের কতখানি অনুগত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও স্বক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ও একক। ঐ যুগে কোনো কোনো লেখক রবীন্দ্রগদ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মতো এই বিশিষ্ট গদ্যরীতির মর্মবাণী আর কেউ তেমনভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। অথচ বলেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের ছায়া মনে করলেও ভুল হবে। রবীন্দ্রানুসারী গদ্যলেখক হয়েও তাঁর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নি। দীর্ঘকাল অনুশীলন করার সুযোগ হলে হয়তো এই রীতি আরও পরিমার্জিত হতে পারত, হৃদয়াবেগের প্রাথমিক জোয়ার কেটে গেলে হয়তো তাঁর গদ্যরীতি অনেকখানি বাহুল্যবর্জিত ও তীক্ষ্ণ হতে পারত! বলেন্দ্রনাথের পাঠকের মনে চিরকালই এই অপূর্ণ-সম্ভাবনার বেদনা জেগে থাকবে। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিকে আজ কেউ অনুসরণ করে না, অন্তত অদূর ভবিষ্যতে কেউ করবে বলে মনে হয় না। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

তাই আজ এক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের মতো বাংলা সাহিত্যের নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারীর অভাবে সে পথও আজ রুদ্ধপ্রায়। কিন্তু আজও যদি কোনো কৌতূহলী পথিক পথশ্রম উপেক্ষা করে সেই পাষাণ-প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়ায়, তা হলে প্রাচীন যুগের এই স্থাপত্যকীর্তি তাকে বিস্মিত করবে। পাষাণ-সোপান অতিক্রম করে যদি একবার সে ভিতরে প্রবেশ করে, তা হলে শিল্পনিপুণ ভাস্কর্য ও দেয়ালচিত্রের রেখাবিন্যাস তার মুগ্ধদৃষ্টিকে অভিভূত করবে—হয়তো এক বিস্মৃতপ্রায় তরুণ কবির অর্ধসমাপ্ত সঙ্গীতের পাষাণস্তম্ভিত সুর তাকে বেদনায় ব্যথিত করবে!

গল্পকার পরশুরাম

আপাতদৃষ্টিতে রাজশেখর বসু ও পরশুরাম দুই বিপরীত কোটির মানুষ। রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' অভিধানের সংকলয়িতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষা ও বানান সমিতি'র উদ্যোক্তা, 'রামায়ণ-মহাভারত-মেঘদূতে'র অনুবাদক, মননশীল প্রবন্ধকার; আর পরশুরাম হলেন অসাধারণ হাস্যরসিক: গণ্ডেরিরাম বাট্‌পারিয়া, লালিমা পাল (পুং), কেদার চাটুজ্যে, জটাধর বক্‌শী, বিরিঞ্চিবাবা, তারিণী কোবরেজ প্রভৃতি অসংখ্যচরিত্রের অসামান্য স্রষ্টা। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ঐক্য আছে তাই হলো রাজশেখরের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের উৎসমূল। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র, রসায়ন তাঁর অর্জিত বিদ্যা, কিন্তু তাঁর অবাধ ছাড়পত্র রসের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। রস ও রসায়নের ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক যাঁরা রক্ষণশীলতার সঙ্গে মেনে থাকেন, তাঁদের যুক্তিবুদ্ধি সবই বিভ্রান্ত হয়ে যায় এই অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভার সামনে দাঁড়িয়ে। পরশুরামের 'গড্ডলিকা' পড়ে তেমনি চমক লেগেছিল সেদিনের জ্ঞানীগুণী অনেকেরই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষীও বাদ পড়েন নি। পরশুরামের 'গড্ডলিকা' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রিয় শিষ্যটির সাহিত্যিক খ্যাতিতে শংকিত হয়েছিলেন—বুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় তাঁর তৈরী এই রাসায়নিকটি হাতছাড়া হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে অভিযোগ করে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য:

'সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্যসম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর-পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে আমি বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো

কার্যে বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও একজন 'কেষ্ট-বিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।'

এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আমার মনের কথা যদি বলেন— আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হই নি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে। এখন কিন্তু ভাবছি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিক হাটে হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব।...যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র এই মানুষটি একেবারেই 'কেমিক্যাল গোল্ড' নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।'

বৈজ্ঞানিক ও কবির এই মতানৈক্য পরশুরামের প্রতিভার স্বরূপ-ধর্মটিতেই অভ্রান্ত প্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র আশংকা করেছিলেন তাঁর তৈরী বৈজ্ঞানিক বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে গেলেন, আর রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন 'জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিক হাটে হারিয়ে গিয়েছেন।' পরশুরাম প্রমাণ করেছেন যে বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়ের আশংকাই অমূলক। সত্যি কথা বলতে গেলে, সাহিত্য ও বিজ্ঞান কোনো ক্ষেত্রেই তিনি স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন, কোথাও কোনো বিরোধ ঘটে নি, তাঁর রসকে রসায়ন বলেও কেউ ভুল করেন নি। বৈজ্ঞানিকের আশংকা ও কবির অভিযোগকে অতিক্রম করে পরশুরামের তীক্ষ্ণধার কুঠার অঘটনঘটনপটীয়সীর লীলাকে আর একবার বিদ্যুৎ-বহ্নিশিখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

পরশুরাম বিজ্ঞানের ছাত্র ও রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন, এটুকু হলো তাঁর নিতান্ত বাইরের পরিচয়। এর চেয়েও বড়ো কথা হলো তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী। বৈজ্ঞানিক মনের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ হলো অনাসক্তি। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নিতান্ত দুর্লভ বললেই হয়। পরশুরাম জীবনের অজস্র বৈচিত্র্যকে দেখেছেন অনাসক্ত মোহমুক্ত দৃষ্টিতে, তেমনি মোহমুক্ত দৃষ্টিতে করেছেন বিচার

ও বিশ্লেষণ। ভাবের অস্পষ্ট কুয়াসা ও চিন্তার অস্বচ্ছতায় কোথাও তাঁর সত্যসন্ধানী ঋজু ও নির্মল দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। তাই পরিণত বয়সে যখন তিনি কলম ধরলেন, তখনই পাকাহাতের লেখা লিখতে পারলেন। কারণ তার আগেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের পাকাপোক্ত ভিত্তি তৈরী হয়েছিল, ভারসাম্য হারানোর কোনো সম্ভাবনা সেখানে ছিল না। তাঁর শেষ জন্মদিনে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

'বাঙলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প ; সে কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা-মিস্ত্রী আধা-কেরাণী। অভিধান তৈরী ও পরিভাষা, বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ। আর 'রামায়ণ', 'মহাভারত' কেরাণীর কাজ। হাল্কা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় যাকে বলা হয় 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' তার মধ্যে আমার রচনার স্থান হয় নি।'

উক্তিটির মধ্যে বিনয় থাকলেও, সত্যও অনুপস্থিত নয়। তাঁর মনের গঠনটি যে বৈজ্ঞানিক সে বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর 'লাইনোটাইপ' নিয়ে গবেষণা ও বানান-পরিভাষা সম্পর্কিত চিন্তার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকের অতন্দ্র সাধনাই জয়যুক্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মনের আর একটি বিশেষত্ব হলো পরিমিতিবোধ। 'রামায়ণ-মহাভারতে'র সারানুবাদে তিনি সে পরিচয় ভালোভাবেই দিয়েছেন। কোথায় সংক্ষেপ করতে হবে, কতটুকু বাদ দিতে হবে, কোথায় সবটুকুই রাখতে হবে—এই বিচারে তিনি অসাধারণ সামঞ্জস্য-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকাব্যের বিপুলায়তন বৈচিত্র্যমণ্ডিত কাহিনী থেকে সারাংশটুকু উদ্ধার করা সহজ নয়। রাজশেখর এই মহৎ কাজ করেছেন কত সহজ ও কত সুন্দরভাবে। বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্যবোধই তাঁর এই সারানুবাদকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। তাঁর এই দুটি মহৎ কাজকে নতুন সৃষ্টি বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হবে না।

বৈজ্ঞানিক রাজশেখর যখন হাস্যরসিক পরশুরাম হয়েছেন, তখনো তাঁর মনের কাঠামোর বিন্দুতম পরিবর্তন ঘটে নি। যে অনাসক্ত মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি লাইনো-টাইপের গবেষণা করেছেন, বানান-পরিভাষার বিষয় চিন্তা করেছেন, 'রামায়ণ-মহাভারতে'র সারানুবাদ করেছেন, সেই দৃষ্টিই তাঁর

চিন্তাধারাগুলিকে উচ্চতর আর্টে পরিণত করেছে। বৈজ্ঞানিক অনাসক্তি ও মোহমুক্ত দৃষ্টিই তাঁকে সিদ্ধ-হাস্যরসিক করে তুলেছে। আকস্মিক 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে'র ঢালুপথ দিয়ে যখন তাঁর গল্পের প্রবাহ শেষতম ধাপে এসে উপস্থিত হয়, তখন তাঁর মজলিশের শ্রোতারা সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েন, কিন্তু কথকের মুখে হাসি নেই—তিনি তেমনি নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী বাঙালীকে নানাভাবে হাসিয়েছেন, কিন্তু নিজে হেসেছেন কদাচিৎ। পরশুরামের হাস্যরস নানাবয়সের নরনারীকে বিচলিত ও বেপরোয়া করে তুলেছে, কিন্তু এর কেন্দ্রে যিনি বসে আছেন তিনি সুভদ্র, সংযত ও সুগম্ভীর। রাজশেখর ও পরশুরামের দ্বৈতব্যক্তিত্বের বিচিত্রলীলা তাঁর গল্পগুলিকে অসাধারণ শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। বিজ্ঞানবুদ্ধির অভিনব উদ্ভাবনে রসজগতের এক একটি অনাবিষ্কৃত উৎস বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর 'ক্লাসিক' ছোটগল্পগুলি দ্বৈতব্যক্তিত্বের লীলাস্পন্দনে অপরূপ—রাজশেখর ও পরশুরাম এখানে 'পার্বতী-পরমেশ্বর' একাত্মতায় অচলপ্রতিষ্ঠ।

২

পরশুরামের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিদীপ্ত কুঠার বাংলাসাহিত্যে এক নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে। বুদ্ধির অসাধারণ দীপ্তি, নতুন আবিষ্ক্রিয়ার চাতুর্য ও অভিজাত সুভদ্র শালীনতাবোধ পরশুরামের হাস্যরসকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করেছে। 'উইট্', 'ফান্', 'স্যাটায়ার্' ও উদ্ভটরসের বিচিত্রমিশ্রণে এই হাস্যরস বিচিত্রিত। অথচ অযাচিত উপদেষ্টা ও সংস্কারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন নি। 'লোকরহস্যে'র বঙ্কিমের হাতের চাবুকও এখানে নেই, হুতোমের মতো সামাজিক জীবনের নকশা রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। পরশুরামের হাস্যরস সৃষ্টির সাফল্যের মূল কারণ হলো এ হাসি উদ্দেশ্যমূলক নয়, 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' পরিবেষণ করাই এই হাসির একমাত্র লক্ষ্য। অবশ্য, শেষ জীবনের কোনো কোনো গল্পে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। বলাবাহুল্য, সেই সব ক্ষেত্রে গল্পগুলির শিল্পমূল্যও তেমন নয়। মানবজীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অসংগতির কৌতুককর চিত্রণ তাঁর গল্পগুলির প্রাণ,

সংস্কারকসুলভ নীতিবাচনের প্রয়াস সেখানে অনুপস্থিত। পরশুরাম সুভদ্র সংযত হয়েও উপদেষ্টা নন, সমাজ জীবনের নানা অসংগতি দেখেও সমাজ-সংস্কারক নন, সবচেয়ে বড়ো কথা রাজশেখরের বিচিত্রমুখী পাণ্ডিত্য পরশুরামের এলাকায় প্রবেশ করে পাণ্ডিত্যের উপদ্রব শুরু করে নি, অথবা এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে হাস্যরস কোথাও বিপন্ন হয়ে ওঠে নি—এমনি করেই মনীষী রাজশেখর ও হাস্যরসিক পরশুরাম অক্ষতদেহে বেঁচে আছেন।

উদ্ভট পরিবেশ ও বিচিত্র সংস্থানসৃষ্টি পরশুরামের গল্পগুলির প্রাণ—তাঁর অধিকাংশ গল্পকেই একপ্রকার Comedy of Circumstances বলা যায়। ঘটনা সাজানো ও প্লটরচনার কৌশল হাস্যরসকে বহুক্ষেত্রে অনিবার্য করে তুলেছে। আমাদের এই প্রথাবদ্ধ ও অতিনিবদ্ধ জীবনের মধ্যে যে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান আছে, লেখক তাঁর বিচিত্র ঘটনাবিন্যাসে তারই এক একটি রুদ্ধদ্বারকে যখন উদ্‌ঘাটিত করেন, তখন তার বিস্ময়কর সজীবতায় ও কৌতুককর অসংগতিতে চমক লাগে। পরিবেশ-সৃষ্টির অসাধারণ চাতুর্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে নাটকীয় চমৎকারিত্ব—'ক্লাইম্যাক্স' ও 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে'র বিপরীত দোলায় তাঁর প্রতিটি গল্প স্পন্দিত। পরশুরামের চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। এক বিশ্লেষণ-নিপুণ ও পর্যবেক্ষণ-তৎপর দ্বিতীয় বিধাতার কাছে মানবচরিত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংগতি এক মুহূর্তেই ধরা পড়ে। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, কেদার চাটুজ্যে, বিরিঞ্চি বাবা, খল্লিদং স্বামী, জটাধর বক্‌শী, জিগীষা দেবী, খুলনার তারিণী কোবরেজ, ধন্নমামা, সরলাক্ষ হোম—এমনি বিচিত্র ও উদ্বায়ুগ্রস্ত মানুষের কৌতুককর সন্নিবেশে পরশুরামের গল্পগুলি বিচিত্র মানুষের মিলনতীর্থ। এরা সকলেই আমাদের কাছের মানুষ, একটু রঙ চড়িয়ে লেখক যখন তাদের আমাদের সামনে তুলে ধরেন তখন তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্বের অদ্ভুতরস প্রবল হাস্যবেগের সঞ্চার করে।

এক অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনা পরশুরামের হাস্যরসকে নিজস্ব মহিমা দিয়েছে। লেখকের জীবিতকালেই তাঁর এক একটি উক্তি স্মরণীয় প্রৌঢ়োক্তিতে পরিণত হওয়া কুশলী শিল্পীর পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। পরশুরামের বহু উক্তিই আজ 'ক্লাসিকে' পরিণত হয়েছে—অথচ

এগুলো সংগত ও অসংগত কথার বিচিত্র গ্রন্থন নয়, এর মধ্যে আছে মননিনষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনা। যত উদ্ভটই শোনাক না কেন, উক্তিগুলির মধ্যে জীবনের অভ্রান্ত সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। শব্দের খেলা ও অর্থের বিচিত্র কৌশল তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু জীবন-সমালোচনার অভ্রান্ত বিশ্লেষণও সেখানে অনুপস্থিত নয়। তাই পরশুরামের বহু আপাত-উদ্ভট বাগ্‌বিন্যাসও প্রৌঢ়োক্তিতে পরিণত হয়েছে। 'গন্ধমাদন-বৈঠক', 'ঠোঁটের সিন্দুর অক্ষয় হোক', 'ডবলডিমের রাধাবল্লভী আর মুর্গির ফ্রেঞ্চ মালপো', 'হয়, কিন্তু Zানতি পার না', 'বেনারসী বল্কল', 'সব বন্ধকী তমসুক দাদা' 'কাইজারী গোঁফ', 'ডিরেকটর অফ মংকি ডিপোর্টেশন'—প্রভৃতি উক্তি বিচিত্র উপাদানজাত কিন্তু অর্থহীন নয়—এই প্রৌঢ়োক্তিগুলির মধ্যে সমকালীন জীবন, সমাজ ও লোকচরিত্র সমালোচনার অভ্রান্ত স্বাক্ষর আছে।

পরশুরামের হাস্যরসের মাধ্যম ছোটগল্প। অতিকথন ও পুনরুক্তি দোষ হাস্যরসসৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরশুরাম এই দুটি দুর্লক্ষণকে সযত্নে পরিহার করেছেন। বাক্‌চাতুর্য, সূক্ষ্মচতুর বুদ্ধির চকিতদীপ্তি, আবেগহীন স্পষ্টোচ্চারিত তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ছোটগল্পের দ্রুতসঞ্চারী গতিবেগকে অধিকতর নাটকীয় করে তুলেছে—অনেকগুলি ছোটগল্প একাংকিকার লক্ষণাক্রান্ত। সত্যমিথ্যার নিপুণ গ্রন্থনে মানবীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন লেখক। রসের দরবারেও লেখক রাসায়নিক—সত্যমিথ্যার মিশ্রণ তাই এমন স্বাভাবিক ও সহজ। মিথ্যাকথার আর্টকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে কিছু কিছু সত্য কথাও বলতে হয়। এমনি করেই তিনি সত্যমিথ্যার জাল বুনে চলেন।

পরশুরামের হাস্যরস আধুনিক রুচি ও মনন নিয়ে সমৃদ্ধিলাভ করেছে। তাঁর ন'খানি গল্প-সংকলনের মধ্যে হাস্যরসের নানাবৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। কতকগুলি গল্প পুরাণ নিয়ে লেখা হয়েছে। এই গল্পগুলিতে পুরাণকে অবলম্বন করে লঘুরসের মাধ্যমে আধুনিক জীবন সমালোচনা করেছেন। 'হনুমানের স্বপ্ন', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'রেবতীর বরলাভ', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'তিন বিধাতা', 'গন্ধমাদনবৈঠক' 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' —প্রভৃতি গল্পে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাল্যবন্ধন হাস্যরসসৃষ্টির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, 'রামায়ণ-মহাভারতে'র অনুবাদক

রাজশেখরের পুরাণের প্রতিটি অলি-গলি নখদর্পণে।—তাই এই সব ক্ষেত্রে পরশুরামের অবাধ প্রবেশাধিকার—আবার আধুনিক জগতের জটিল সমস্যা ও জটিলতর লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা—এই দুয়ের উদ্ভট মিশ্রণ তাঁর অনেকগুলি গল্পের মৌলিক উপকরণ; পরশুরামের হাতে দেব-দেবী, মুনিঋষিদের চূড়ান্ত দুর্গতি হয়েছে—তাঁদের আর কৌলীন্য নেই। আধুনিক জগতের রাজপথে এসে তাঁরাও কৌতূহলী জনতার পাশে দাঁড়ান, আবার কখনও নিজেরাও জাগতিক জালে জড়িয়ে পড়েন।

ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি, ঘুন ব্যবসায়ী বুদ্ধি, ভাবপ্রবণতার আতিশয্য, অশিক্ষিত-পটুত্ব, আত্মীয়তোষণ নীতি, রক্ষণশীল জাতির আচরণ, আধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচার প্রভৃতি নানাপ্রকার অসংগতি পরশুরামের হাস্যরসকে উপাদেয় করে তুলেছে। এই সব বিষয় নিয়ে ক্লান্তিকর ও হা-হুতাশপূর্ণ বক্তৃতা না দিয়ে পরশুরাম তার কতকগুলো কৌতুককর অসংগতি ও সকলের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন রস আবিষ্কার করেন। সাধারণ জীবনের মধ্যে উদ্ভট আতিশয্যের গোপন রন্ধ্রপথগুলি পরশুরামের নখদর্পণে—তাই তাঁর হাস্যরস এত স্বতঃস্ফূর্ত ও অবলীলাকৃত। বিজ্ঞানবুদ্ধি পরশুরাম অনাসক্ত শিল্পী, সকলের অসংগতি ভাঙিয়ে তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেন, কিন্তু নিজে কোথাও ধরা দেন না। এই অনাসক্ত বস্তুলীনতা তাঁকে রসিক সভায় অনন্যস্থান নির্দেশ করেছে।

৩

ন'খানি গল্পসংগ্রহে প্রায় একশোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। পরশুরামের এই গল্পগুলিতে আঙ্গিক ও উপকরণের বৈচিত্র্য কম নয়। তিনি নানাজাতীয় পাত্রে নানা আস্বাদনের রস পরিবেষণ করেছেন। 'ফান্' থেকে আরম্ভ করে 'স্যাটায়ার্' পর্যন্ত হাস্যরসের বিবিধপর্যায়, চরিত্র-বৈচিত্র্যে প্লট সাজানোর কৌশলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিছক কৌতুকরস সৃষ্টিতেও পরশুরাম অদ্বিতীয়। গড্ডলিকার 'চিকিৎসা সংকট', 'লম্বকর্ণ', কজ্জলীর 'স্বয়ংবরা', ধুস্তুরী মায়ার 'রটন্তীকুমার', নীলতারার 'জয়হরির জেব্রা', আনন্দীবাঈ-এর 'আনন্দবাঈ',

'বটেশ্বরের অবদান', 'চিঠিবাজি', চমৎকুমারীর 'যশোমতী' প্রভৃতি গল্পগুলিতে নির্দোষ কৌতুক ও রঙ্গরস অনাবিল ধারায় উৎসারিত হয়েছে।

'চিকিৎসা-সংকট' বিশুদ্ধ কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠগল্প। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নন্দবাবু ব্যক্তিত্বহীন, নিরীহ গোবেচারী, সর্বোপরি তিনি মৃতদার। লেখক চরিত্রটির এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। ট্রাম থেকে পড়ে যাওয়ার সুযোগকে তার সুচতুর বন্ধুবান্ধবেরা এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে, ঘটনাচক্রে এক বিচিত্র চিকিৎসা-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে অতিরঞ্জিত চিত্রণের নিপুণ প্রয়াস আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যার উপরে লেখক একটি অতিরঞ্জিত কাহিনীর জাল বুনেছেন, এ কথা বলা যায় না। চিকিৎসকদের বিচিত্র চরিত্র ও উদ্ভট ব্যবস্থাপত্রগুলির মধ্যে গভীর সত্য আছে। নানা মুনির নানা মত কিভাবে চিকিৎসা বিভ্রাট সৃষ্টি করে তার একটি কৌতুককর চিত্র পাওয়া যায়। ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাচক্রের কৌতুককর সন্নিবেশে গল্পটি শিল্পসমুজ্জ্বল।

'লম্বকর্ণ' গল্পে বিশুদ্ধ কৌতুকরসের সঙ্গে রঙ্গের সমন্বয় ঘটেছে। ছোটগল্প হিসেবে গল্পটির বাঁধুনি একটু শিথিল—পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনাই দীর্ঘতর। মূল গল্পের সঙ্গে বিচিত্র প্রসঙ্গের গ্রন্থনই গল্পটির সরসতার অন্যতম কারণ। বংশলোচনের দাম্পত্যকলহ, সান্ধ্যবৈঠকের নিয়মিত সভ্যদের বিচিত্রচর্চা, পাঁঠাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্যকলহের জটিলতা সৃষ্টি, পাঁঠার নির্বাসন, চাটুজ্যের পাঁঠা ব্যাঘ্রে পরিণত হওয়ার অপূর্ব কাহিনী, ব্যাণ্ড-মাষ্টার লাটুবাবুর দুর্ভাগ্য, ঝড়বৃষ্টিতে বংশলোচনের দুরবস্থা ও লম্বকর্ণের মাধ্যমে তার উদ্ধার লাভ, সর্বশেষে রায়বাহাদুরের দাম্পত্যকলহের মিলন-মধুর উপসংহার—এই কৌতুককর ঘটনা-পরম্পরাই হাস্যরসের উদ্রেক করে। তবে পাঁঠার ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনীটি সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে, সন্দেহ নেই।

'স্বয়ম্বরা' গল্পটির কথক সুবিখ্যাত কেদার চাটুজ্যে। সত্যমিথ্যার জাল বোনার কাজে চাটুজ্যে মশাইয়ের দক্ষতার তুলনা নেই। বংশলোচনবাবুর সান্ধ্য আড্ডার অনুকূল পরিবেশটিকে গল্পটির ভূমিকা হিসেবে যোগ করে দেওয়া হয়েছে, ট্রেন-কামরায় দুটি মদ্যপ সাহেব ও একজন লঘুচিত্ত মেমের কৌতুককর

প্রেমকাহিনী গল্পটির ভিত্তি রচনা করেছে। গল্পটির উপসংহার এই কাহিনীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভূমিকা ও উপসংহার না থাকলে গল্পটি যেন ঠিকমতো জমতোই না। আধুনিক প্রেমের লঘুচপল ও অসংগত দিককেই তিনি কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

'কচিসংসদ' গল্পটিতে কচিসংসদ ও তার বিচিত্রধরণের সভ্যদের পরিকল্পনার মধ্যে লেখকের চমৎকার মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কচিসংসদের সদস্যদের নামকরণ ও সাজসজ্জা হস্যোদ্রেক করে। কিন্তু গল্পটির গঠনরীতির মধ্যে শিথিলতা আছে। কেষ্টর সঙ্গে পদ্মর বিবাহকাহিনীর সঙ্গে কচিসংসদ-বৃত্তান্ত যেন ঠিক খাপ খায় নি। কেষ্টর বিবাহঘটিত কৌতুককর কাহিনীই আসলে গল্পটির মূল কাহিনী, মাঝখানে কচিসংসদের উপকাহিনী সংযুক্ত হয়ে মূল গল্পটিকেই যেন দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। শুধু ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ছাড়া কচিসংসদ-বৃত্তান্ত মূল গল্পের পক্ষে অপরিহার্য নয়। তবে এই ব্যঙ্গচিত্রটির যে একটি নিজস্ব মূল্য আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যও পৌরুষবিধ্বংসী বেতসবৃত্তিকেই লেখক তির্যকদৃষ্টির সাহায্যে রূপায়িত করেছেন।

'দক্ষিণরায়' গল্পটির কথকও চাটুজ্যে মশাই। চাটুজ্যে মশাইয়ের অধিকাংশ গল্পের মতো এই গল্পেও তর্ক-বিতর্কমূলক একটি ভূমিকা আছে। কিন্তু মূলগল্পটি আসলে একটি উদ্ভট, অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক কাহিনী। ব্যাঘ্রদেবতার কল্যাণে বকুলাল দত্তের ভাগ্য পরিবর্তন ও সর্বশেষে ব্যাঘ্রে পরিণত হওয়ার উদ্ভট কাহিনী একেবারে অবাস্তব। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য কাহিনীও নিপুণ কথক চাটুজ্যে মশাইয়ের বর্ণনার গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য এই কৌতুককর গল্পটি নিতান্ত গালগল্পই। 'ধুস্তুরী মায়া' (ধুস্তুরীমায়া) গল্পটিও গালগল্প পর্যায়ের। লেখক নিজেই গল্পটির প্রকৃতি নির্দেশ করে বলেছেন 'দুই বুড়োর রূপকথা'। উদ্ধব পাল ও জগবন্ধু গাঙ্গুলী এই দুই বন্ধুর অলৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে লেখক জীবনের এক গভীর সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন। যৌবনের জন্য যে দীর্ঘশ্বাস ও গভীর অনুশোচনা ব্যক্তিজীবনে, শিল্পে-সাহিত্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, পয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ উদ্ধব পালের নবযৌবনলাভ করার করুণ কামনার মধ্যে মানবহৃদয়ের সেই

চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত হয়েছে। একটু অসংগত শোনালেও উদ্ধব বার্ধক্যের জন্য যে ভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে গভীর সত্য আছে। বার্ধক্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখালে জগবন্ধু গভীর বেদনায় উত্তর দিল: 'থামলে কেন বলে যাও না। মেয়েরা সব দাদু জ্যাঠা মেসো বলে, বুড়োদের দিকে আড়চোখে তাকায় না, আমরা যেন ইট পাথর গরু ছাগল।' বৃদ্ধের এই যৌবনকামনাকে এক আজগুবি কাহিনীর মধ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীও ঠিক রূপকথার বিহঙ্গদম্পতি নয়, রূপকথার কল্পজগৎ তাদের বিচরণক্ষেত্র নয়, তারাও এই সূর্যালোকিত পরিচিত জগতের অধিবাসী, আধুনিক পৃথিবীর খবরাখবর তাদের সম্পূর্ণরূপেই অধিগত। রাজকুমারী স্পন্দছন্দার আখ্যায়িকাংশটি কাহিনীর মধ্যমণি। আপাতদৃষ্টিতে 'ধুস্তুরীমায়া' আজগুবি কাহিনী, কিন্তু আড়ালে কঠিন সত্যের মেরুদণ্ড আছে।

'রটন্তীকুমার' (ধুস্তুরীমায়া) একটি নির্দোষ ও নিটোল গল্প। রটন্তীকুমার-চরিত্রের সরলতা ও অনভিজ্ঞতাই গল্পটির মূল আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত মানিকের মায়ের ছল-চাতুরী তার সরলতার কাছে পরাজিত হয়েছে। পরশুরামের ছোটগল্পে রটন্তীকুমারই শ্রেষ্ঠ কিশোর-চরিত্র। কিশোরকে তিনি কিশোরই রেখেছেন, তাকে ক্যারিকেচারে অতিরঞ্জিত করে পাকিয়ে তোলা হয় নি। 'জয়হরির জেব্রা' (নীলতারা) গল্পটির কৌতুককর সংস্থান শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক উপসংহারে পরিণত হয়েছে। জয়হরির জেব্রাই শেষ পর্যন্ত বেতসী চাকলাদারের দর্পচূর্ণ করেছে ও জয়হরি বেতসীর মিলনের পথকে সুগম করে দিয়েছে। 'আনন্দবাঈ' (আনন্দীবাঈ) গল্পে শেঠ বিক্রমদাসের ত্রিধাবিভক্ত দাম্পত্যজীবনের জটিল সমস্যা এক প্রবল 'অ্যাণ্টিক্লাইমাক্সে'র আঘাতে হাস্যকর পরিণতি লাভ করেছে। আইনে যার সমাধান হলো না, আনন্দীবাঈয়ের দশগাছা চুড়ির আঘাতে তার অনায়াসে সমাধান হলো। মুম্বইবালী রাজহংসী ও কলকাত্তাবালী বলাকার চরিত্র পরিকল্পনায় লেখকের কলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বটেশ্বরের অবদান' (আনন্দীবাঈ) সঞ্জীব ডাক্তার ও তার স্ত্রী অনিলার ষড়যন্ত্র ঔপন্যাসিক বটেশ্বরের গল্পের মোড় ফিরিয়ে দিল। গল্পটির কৌতুককর 'সিচুয়েশ্যান্' নির্দোষ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। 'চিঠিবাজি' গল্পটিও বিশুদ্ধ কৌতুকরসের। সুকান্ত ও সুনন্দার পত্রবিনিময় দুজনের

মিলনকে ত্বরান্বিত করেছে। স্মিতহাস্যের সঙ্গে মিষ্টিমধুর রোমান্সের সমন্বয় ঘটেছে।

৪

পরশুরামের অনেকগুলি গল্পের কেন্দ্রমূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সামাজিক জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। পরশুরামের কুঠার সেখানে তীব্রদ্যুতিতে ঝলসে উঠেছে। সমাজজীবনে মিথ্যাচার, ব্যবসায়ীর অসাধুতা ধর্মের নামে ভণ্ডামি, আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে নানা জোচ্চুরি, ভাব-বিলাসিতার আতিশয্য, দেশপ্রেমের নামে আত্মতোষণ প্রভৃতিকে তিনি সুকৌশলে আঘাত করেছেন। জীবনের ক্ষেত্রে যেখানেই তিনি বাড়াবাড়ি দেখেছেন, সেইখানেই তাঁর কুঠার নির্মম বিদ্রূপে তীব্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অথচ কোথাও উদ্দেশ্য সুপ্রকট হয়ে শিল্পকর্মে বিঘ্ন ঘটায় নি, আক্রমণের নির্মমতা কৌতুককটাক্ষের অন্তরালে সুকৌশলে আত্মগোপন করেছে।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' (গড্ডলিকা) গল্পটি পরশুরামের সর্বপ্রথম রসরচনা। 'লিমিটেড্ কোম্পানি'র মধ্যে যে কতবড় জোচ্চুরি লুকিয়ে থাকে তিনি তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। কারবারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্যামবাবুর চরিত্রে ব্যবসায়গত অসাধুতার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামির সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে। গণ্ডেরিরাম বাট্পারিয়া পরশুরামের অসাধারণ সৃষ্টি। বাংলাসাহিত্যের এই অদ্বিতীয় ধড়িবাজ চরিত্রটি রচয়িতার অনন্যসাধারণ কলাকুশলতার পরিচয় দেয়। গণ্ডেরিরাম নিজের সুবিধানুযায়ী পাপ পুণ্য, সুনীতি-দুর্নীতির মানদণ্ড রচনা করেছে, তারও পাপ-পুণ্যের বোধ আছে, কিন্তু সে-বোধ নিতান্তই সুবিধাবাদীর জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘিয়ের জোচ্চুরি ব্যবসায় পাপ হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে এই জোচ্চোর ব্যবসায়ীটি যে উত্তর দিয়েছিল তা বাংলাসাহিত্যে 'ক্লাসিক' হয়ে থাকবে :

"গণ্ডেরি। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরসমে। হাঁমি ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি—হনুমানজী কিরিয়া। হামি তো সির্ফ মহাজন আছি,

—রুপয়া দে কর্ খালাস। 'সুদ্ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সাভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি তুস্‌রা ধনীসে লিবে। পাঁপ হোবে তো শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি ?"

গল্পটির উপসংহারে জোচ্চোর অংশীদারেরা তাদের সব দুষ্কর্মের বোঝা তিনকড়িবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের হাত পরিষ্কার করেছে। লিমিটেড্ কোম্পানির আড়ালে অসাধুতা ও ভণ্ডামির উৎসকে তিনি নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কিন্তু হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহটি কোথাও অবরুদ্ধ হয় নি।

'বিরিঞ্চিবাবা' (কজ্জলী) গল্পটিতে ধর্মসম্পর্কিত ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ধর্মসম্পর্কিত দুর্বলতা ও গুরুবাদের আতিশয্য আমাদের দেশে নতুন বিষয় নয়। কিন্তু পরশুরাম এই পুরাতন বিষয়টির মধ্যেই এরূপ অভিনবত্ব সঞ্চারিত করেছেন যাতে গল্পটির মধ্যে সজীবতার আস্বাদন অনুভব করা যায়। মূলগল্পের যে দীর্ঘ ভূমিকা আছে, তা গল্পটির পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয়। চৌদ্দনম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসে নিতাইয়ের ধর্মান্ধতাকে কেন্দ্র করে নিবারণ-পরমার্থ-নিতাই-সত্যব্রতর তর্কবিতর্ক জমে ওঠে। বিরিঞ্চিবাবার শিষ্যপ্রতারণার কৌশলটি ছিল অভিনব। কালকে তিনি অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি অনাদি পুরুষ ; জগৎশেঠের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তুলসীদাসকে তিনি প্রবৃত্তিমার্গের দীক্ষা দিয়ে মানসিংহে রূপান্তরিত করেছিলেন, যীশুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, তিনি চন্দ্রসূর্য নিয়ন্ত্রণের অধীশ্বর। এই মহাধড়িবাজ ভণ্ড গুরুটি মিথ্যাভাষণের সম্রাট—বৈবস্বতের প্রসঙ্গেও সমান মুখর :

'বৈবস্বত বললে—মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি ?—চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। আমি বললুম—ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনেধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্রসূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।'

বিরিঞ্চিবাবার 'কালস্তম্ভে'র কাহিনী অতিরঞ্জিত ও অবিশ্বাস্য। তবুও তাঁর এই অতিরঞ্জিত কাহিনীগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। গণেশমামা, মিষ্টার সেন, বছিরুদ্দিন, ছোট মহারাজ, কেবলানন্দ প্রভৃতি চরিত্র পরিবেশটিকে

হাস্যমুখর করে তুলেছে। বিরিঞ্চিবাবার ভণ্ডামি চূর্ণ করতে গিয়ে যে ষড়যন্ত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তার ফাঁকে সত্যব্রত ও বুঁচকীর প্রেম জমে উঠেছে। ভণ্ডসন্ন্যাসীর কুকীর্তিকে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে এক প্রসন্ন-মধুর কৌতুকহাস্যের অবতারণা করা হয়েছে—কোথাও আঘাতের জ্বালা নেই।

'বদন চৌধুরীর শোকসভা' (ধুস্তরী মায়া) গল্পটি 'ক্যারিকেচার'নির্ভর। কিন্তু যতই অতিরঞ্জন-প্রয়াস থাকুক না কেন, এর আড়ালে একটি নিগূঢ় সত্য আছে। মৃত ব্যক্তির শোকসভা অবলম্বন করে ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি ও সেই মুহূর্তে সম্ভব অসম্ভব নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করে বসা, আমাদের প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যম, যমদূত, চিত্রগুপ্ত, প্রেতাত্মা প্রভৃতিকে গল্পটির মধ্যে নিয়ে এসে কৌতুককর পরিস্থিতিকে জমিয়ে তুলেছেন। সামান্যতম বিশ্বাস্য উপাদানের উপরে কুশলী শিল্পী পরশুরাম অবলীলাক্রমে অতিরঞ্জনের রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে পারেন।

'দুই সিংহ' (আনন্দীবাঈ) গল্পে আধুনিককালের সাহিত্যিক দলাদলিকে তির্যকদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দামোদর নশকর ও বটেশ্বর শিকদার সাহিত্যক্ষেত্রে এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে কেন্দ্র করে দুটি বিরুদ্ধদলের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের ইতরজনোচিত আচরণকে রঙ্গে-ব্যঙ্গে রসিয়ে তোলা হয়েছে। কোথাও কোথাও অতিমাত্রায় রঙ্ ফলানো হয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই দলাদলির ছবি দেখে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। সাহিত্যের দলাদলি যে কতদূর গড়ায় গোরাচাঁদের উক্তিই তার প্রমাণ : 'গোরাচাঁদ বললে, এই কথা? ওহে ভূপেশ রাজেন অবনী নুরুদ্দিন নবকেষ্ট, এগিয়ে এস তো। আমরা ছজন ছোট-গাল্পিক, বড়-গাল্পিক, রম্য-লিখিয়ে, কবি,সম্পাদক, সমালোচক—আমরা নিখিল বাঙালী সাহিত্যিকবর্গের প্রতিনিধিরূপে অত্র সভায় অস্মিন মুহূর্তে শ্রীযুক্ত বটেশ্বর সিকদার মহাশয়কে উপাধি দিলাম—অপ্রতিদ্বন্দ্বী গল্পশিল্প সম্রাট। যার সাহস আছে সে আপত্তি করুক। আমার দস্তানা নেই, এই বাঁ পায়ের মোজাটা খুলে চ্যালেঞ্জ করছি আমার সঙ্গে যে লড়তে চায় সে মোজা তুলে নিক। সব তাতে আমি রাজী আছি—ঘুষি, গাঁট্টা, লাঠি, থান ইট, যা চাও।'

এইভাবেই রঙ্গ-কৌতুক, ব্যঙ্গের অন্তরালে পরশুরাম সমাজজীবনের

অসংগতিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর শেষদিকের গল্পে সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরটি আরও ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। 'মাৎস্য ন্যায়' (চমৎকুমারী) ও 'উৎকোচতত্ত্ব' (চমৎকুমারী) জাতীয় গল্পে পরশুরামের বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি তীক্ষ্ণতর রূপ লাভ করেছে। গল্পটির মধ্যে রূপক আছে। দরিদ্র দিবাকর বন্ধু গণপতির কাছ থেকে মাৎস্যন্যায়ের দীক্ষা নিয়ে কিভাবে 'সতর্ক কঠোর সাধনার ফলে মাৎস্য সমাজে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠল'—তার একটি ব্যঙ্গাত্মক চিত্র পাওয়া যায়। রজনীকান্ত চৌধুরী-বেশী দিবাকরেরা আমাদের অচেনা নয়, কিন্তু পরশুরাম যখন অভ্রান্ত রেখায় আমাদের পরিচিত লোকেরই ছবি আঁকেন, তখন এই সমস্ত চরিত্রের ভয়াবহতায় চমকে উঠতে হয়।

'উৎকোচ তত্ত্ব' গল্পে উৎকোচের এক অভিনব পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। জেলা জজ লোকনাথের ব-কলমে লেখক উৎকোচের নানা সূক্ষ্ম প্রকারভেদের কথা জানিয়েছেন। উৎকোচের ব্যাপার কত জটিল পথ বেয়ে বক্রগতিতে অগ্রসর হতে পারে গল্পটি তার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। 'সরলাক্ষ হোম' (কৃষ্ণকলি) গল্পটিতেও সরকারের আত্মীয়তোষণ নীতির প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কটাক্ষ আছে। ভাবী শ্বশুর গদাধর ঘোষের সরকারী মহলে অসাধারণ প্রতিপত্তি, তারই জোরে বরুণ বিশ্বাস 'বানর-নির্বাসন অধিকর্তা' হয়েছে। পরিকল্পনার দোহাই দিয়ে যে কত অর্থব্যয় হচ্ছে, তারই কৌতুককর কাহিনী লেখক শুনিয়েছেন। লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তাঁর বক্তব্যের জন্য কাহিনীর রস নষ্ট হয় নি। বরুণ বিশ্বাস-সরলাক্ষ হোম-মাণ্ডবী ঘোষকে দিয়ে তিনি রীতিমতো একটি কৌতুকস্নিগ্ধ প্রেমের ত্রিভুজ রচনা করেছেন। সরলাক্ষ হোম এ যুগের সুযোগসন্ধানী ছেলে, যেন-তেন প্রকারেণ সে কার্যসিদ্ধি করতে পারে।

৫

পুরাণকে অবলম্বন করে পরশুরাম অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। বলাবাহুল্য পুরাণকে আশ্রয় করে গল্পগুলি রচিত হলেও, তার রস পৌরাণিক নয়। কারণ তিনি পুরাণকে ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার দ্বারা লঘু করে তার হাস্যকর

অসংগতিগুলিকে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু পুরাণাশ্রয়ী গল্পরচনায় তিনি এইখানেই থামেন নি। তিনি পুরাণের মন্দাকিনী-ধারাকে গ্রাম্যনদীতে পরিণত করেছেন, আধুনিক জগতের কলকোলাহলের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীগুলি তাদের আভিজাত্য হারিয়েছে। দেব-দেবী, অপ্সরা-মহর্ষিরা তাঁদের চরিত্রগত সমস্ত কৌলীন্য হারিয়ে সাধারণ নর-নারীর মতো দোষ-ত্রুটি স্খলন-পতনের অধিকারী হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীগুলির মাধ্যমে প্রকারান্তরে সাধারণ মানুষের দুর্বলতা ও অসংগতিকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। পুরাণোক্ত দেব-দেবী, মহর্ষিদের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বভাবতই হাস্যোদ্রেক করে, কিন্তু আমাদের সংস্কারবোধ কোথাও আহত হয় না।

দেব-দেবী চরিত্রের অসংগতি নিয়ে হাস্যরস রচনার পদ্ধতি নতুন নয়। কিন্তু পরশুরামের এই শ্রেণীর গল্পগুলির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাঁর মননিষ্ঠ জীবন-সমালোচনার পরিচয় দেয়। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি সেই কাহিনীগুলিকে নিজের খুশীমতো সাজিয়েছেন, পুরাণে যার উল্লেখমাত্র আছে তাকে অতিরঞ্জিত করেছেন, আবার কখনও বা করেছেন অতিপল্লবিত। আবার কখনও পৌরাণিক কাহিনীর সম্ভাব্য সূত্র ধরে অনেকখানি কাহিনীর জাল বুনেছেন। পুরাণকে আধুনিক জগতের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে তিনি এমন এক-একটি বুদ্ধিধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার মৌলিকত্ব বিস্ময়কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ঘটনাবিন্যাসের চাতুর্য, ব্যঙ্গানুকৃতি, পৌরাণিক হিমাচল থেকে লৌকিক নিম্নভূমিতে অবতরণ, 'ক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে'র দ্রুতসঞ্চারী গতি গল্পগুলির মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। পুরাণাশ্রয়ী গল্পগুলির মধ্যে কখনও কখনও রূপকের সূক্ষ্ম আবরণ থাকায় গল্পগুলি অধিকতর উপভোগ্য হয়েছে।

'জাবালী' (কজ্জলী) এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে কালগত দিক থেকে সর্বপ্রথম। পৌরাণিক পরিবেশ ও চরিত্রগুলিকে লঘু করা হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি চরিত্রের যে ক্ষীণ প্রসঙ্গ আছে, পরশুরাম সেই সূক্ষ্ম সূত্রটিকে অবলম্বন করে একটি নতুন কাহিনী রচনা করেছেন। সুতরাং গল্পটিকে সম্পূর্ণভাবেই উদ্ভাবন বলা যায়। কিন্তু এই উদ্ভাবন মূলহীন

নয়। রামায়ণের রাম-জাবালি সংবাদটিই পরশুরামের বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মনকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছিল। রামায়ণের জাবালিকে রামচন্দ্র তিরস্কার করেছিলেন, কিন্তু পরশুরাম জাবালিকে এক সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। জাবালি নির্ভীক যুক্তিবাদী. কোনোপ্রকার ভাবাবেগ বা সংস্কার তাঁকে পরাজিত করতে পারে নি। বালখিল্যদের প্রায়শ্চিত্তবিধান, ঘৃতাচীর মোহমদির নৃত্য, নরকদর্শন, ঋষিদের কোপদৃষ্টি কোনো কিছুই জাবালিকে প্রতিহত করতে পারে নি। পরশুরাম এঁকে স্বাবলম্বী, মুক্তমতি, যশোবিমুখ, লোকায়ত দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। দেহ-মনের বলিষ্ঠতায় জাবালি চরিত্রটি অসাধারণ। গল্পটির মধ্যে বালখিল্যদের কাহিনী ও ঘৃতাচী-উপাখ্যান হাস্যরসের উদ্রেক করে। কিন্তু গল্পটির ফলশ্রুতি হাস্যরস নয়। হাস্যরস এখানে উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। তাই হাস্যরসের লঘুতরল জলাভূমির উর্ধ্বে জাবালি-চরিত্রের মহিমাই অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে।

'হনুমানের স্বপ্ন' ('হনুমানের স্বপ্ন') গল্পটির সঙ্গে 'জাবালি' গল্পটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। দুটি গল্পেই মহৎ চরিত্রের সমুন্নত মহিমা পারিপার্শ্বিক লঘুতা ও চপলতার উর্ধ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পটির মধ্যে দাম্পত্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে কৌতুককর অংশ আছে, তা বিশেষভাবে উপভোগ্য। শতভার্যা-জর্জরিত লোমশমুনিকে বহুপত্নী-বিব্রত একজন বিশেষত্ববর্জিত জীর্ণবৃদ্ধে পরিণত হতে দেখে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিচ্চটরাজ্যের চিলিম্পা-কাহিনীও লেখকের উদ্ভট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। 'জাবালি' ও 'হনুমানের স্বপ্ন'—দুটি গল্পই 'সিরিয়াস'। কৌতুক-নির্ঝরের কলোল্লাস গল্পের উপসংহারে সামুদ্রিক গাম্ভীর্যে পরিণত হয়েছে।

'পুনর্মিলন'কে ('হনুমানের স্বপ্ন') গল্প না বলে 'স্কেচ' বলাই সঙ্গত। পুরাণ নিতান্ত লৌকিক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 'প্রেমচক্র' ('হনুমানের স্বপ্ন') কাহিনীর সঙ্গে পুরাণকাহিনীর বিন্দুতম সংযোগ নেই। পৌরাণিক চরিত্র ও পরিবেশ নিতান্ত কাল্পনিক। 'প্রেমচক্র'র পরিকল্পনার অভিনবত্ব চিত্রসংযুক্ত হয়ে কৌতুকরসকে গাঢ় করে তুলেছে। কাহিনীবিন্যাস ও পরিকল্পনার মৌলিকত্ব যে হাস্যরসকে কতদূর স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলতে পারে, এই গল্পটি

থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরশুরামের হাস্যরসসৃষ্টির জন্য অনেক সময় তেমন কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয় না।

'প্রেমচক্র' লেখার দীর্ঘ দশবছর পরে পরশুরাম লিখলেন 'দশকরণের বানপ্রস্থ' ('হনুমানের স্বপ্ন')। পূর্ববর্তী গল্পগুলির গল্পরস আছে, কিন্তু এখানে গল্পরসের বিচিত্রপ্রবাহ শুষ্কপ্রায়। সেই শীর্ণ গল্পধারার মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বক্তব্য সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। এতকাল গল্পের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহের মধ্যে ও কৌতুকরসের উদ্দামতার মধ্যে যার আভাস-ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যেতো, এখন সেই প্রবাহ যখন শুকিয়ে এলো, তখন আকস্মিকভাবে চোখে পড়লো মননশীলতার দীপ্তরশ্মি, বক্তব্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। 'দশকরণের বানপ্রস্থ' একটি রূপককাহিনী। দর্ভবতীরাজ দশকরণ পঞ্চাশোর্ধে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন। দশগুণ ইন্দ্রিয় ও একমন, দশগুণ ইন্দ্রিয় ও দশটি মন নিয়ে দশকরণ তৃপ্ত হতে না পেরে ব্রহ্মার কাছে তাঁর পূর্বদেহ পূর্বমন প্রার্থনা করেছিলেন। বৃহত্তর মানবসংসারের সেবার মধ্যেই তিনি তাঁর মুক্তি খুঁজে পেলেন।

'তৃতীয় দ্যূতসভা' ('হনুমানের স্বপ্ন') গল্পটিতে উদ্ভট পরিকল্পনা ও গল্পরসের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক কৌটিল্যকে তীব্র শ্লেষাঘাত করা হয়েছে। গল্পের প্রথমেই মহাভারতের ঘটনা ও শ্লোক উদ্ধার করে তিনি পাঠকের বিশ্বাস জমিয়ে তুলেছেন। দুটি দ্যূতসভার মহাভারতীয় বৃত্তান্ত শুনে যখন পাঠকচিত্ত খানিকটা আবিষ্ট, সেই অবসরে লেখক মিথ্যাকথার উপকরণ অনায়াসে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। মহাভারতের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে লেখক বর্তমান যুগের উপযোগী করে তুলেছেন। এক যুধিষ্ঠির ছাড়া কোনো চরিত্রেরই মহাভারতের মর্যাদা রক্ষা করা হয় নি। মৎকুনি চরিত্রটির পরিকল্পনা অভিনব—তার পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণের এমন একটি উৎকট অসঙ্গতি আছে, যা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই হাস্যোদ্রেক করে। তৃতীয় দ্যূতসভার বর্ণনার মধ্যে মহাভারতের যুগজীবনের সামান্যতম আভাসমাত্র নেই। পানোন্মত্ত বলরামের শকুনিকে চপেটাঘাত করা, ঘুর্ঘুর কীটের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের সভয় প্রশ্ন—'কামড়ে দিয়েছে?' ঘুর্ঘুরগর্ভ ও গোধিকাগর্ভ অক্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গল্পটিকে সরস করে তুলেছে। মৎকুনি ও বলরামের

মুখে আধুনিক রাজনীতির কূটকৌশলের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে। নিটোল গল্পাংশের মধ্যেও লেখকের শ্লেষাত্মক মনোভঙ্গি লক্ষণীয়।

৬

'তিন বিধাতা' ('গল্পকল্প') গল্পটিও কোনো পুরাণোক্ত কাহিনী নয়। পরশুরামের পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীর মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি গল্পে পৌরাণিক কাহিনীর ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করে নতুন কাহিনীর অবতারণা করেছেন বা নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; আবার কতকগুলি গল্পে স্বপরিকল্পিত কাহিনীকেই পুরাণের ছদ্ম-আবরণে মণ্ডিত করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনী রূপকধর্মী। 'তিন বিধাতা' দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। আধুনিক যুগের রাজনৈতিক জীবনে বিশ্বসমস্যা মীমাংসার জন্য বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মিলে 'হাই লেভেল টক'-এ নিমগ্ন হন। ব্রহ্মা, গড্ ও আল্লা সমবেত হলেন এক 'শীর্ষ সম্মেলনে'। স্থান, হিন্দুকুশপর্বত। আধুনিককালে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের যেমন একজন 'পি এ' থাকেন তেমনি তিন বিধাতারও 'পি-এ' ছিলেন যথাক্রমে নারদ, সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেব। বাসুকির মুখে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার বিবরণটি কৌতুককর। শয়তানের সঙ্গে তিন বিধাতার চুক্তিও আধুনিক জগতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রবিধাতাদের খুশী করার জন্য শয়তানের মক্কেলদেরও চেষ্টার অন্ত নেই। শয়তানের মুখেই শোনা যাক্ঃ

'আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গীর্জা মসজিদ মঠ আতুরাশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল রেডক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুদের খিচুড়ি খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন, তাদের বড় বড় চাকরি আর মোটরকার দেওয়া হবে। এই সবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলগণকে নিরাপদে রাখবেন।'

বলাবাহুল্য পৌরাণিক ছদ্ম-আবরণের অন্তরালে আধুনিককালের ব্যঙ্গাত্মক চিত্রই অগ্নিরেখায় অঙ্কিত হয়েছে।

'ভীমগীতা'কে ('গল্পকল্প') ঠিক গল্প বলা যায় না। ভীম শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর ক্রোধ ও পৌরুষের কথাই কীর্তন করেছেন। হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত নয়, যেটুকু আছে তাও পারিপার্শ্বিক বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'ভরতের ঝুমঝুমি' ('ধুস্তরীমায়া') গল্পের শেষাংশটুকু বাদ দিলে নিছক রঙ্গ-কৌতুকের কাহিনীই দাঁড়ায়। হৃষীকেশতীর্থের গঙ্গাতীরের ধর্মশালায় দুর্বাসার প্রবেশ এক কৌতুককর সংস্থানের সৃষ্টি করেছে। দুর্বাসার ময়লা দাড়িতে ছারপোকা নির্ভয়ে বিচরণ করছে, তাতে 'ডিডিটি স্প্রে' করার প্রসঙ্গ হাস্যরসের সৃষ্টি করে। পুরাণপ্রসিদ্ধ দুর্বাসা ও মেনকার কাহিনীতে পুরাণের গন্ধটুকুও নেই। দুর্বাসার সম্পর্কে পৌরাণিক ধারণা ওখানে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাঁর চঞ্চল প্রকৃতি ও অশ্রাব্য গালাগালি সার্কাসের জোকারের মতোই আমাদের মনে কৌতুকের সঞ্চার করে। 'শকুন্তলা' নাটকের একটি অলিখিত কাল্পনিক অধ্যায় লেখক লৌকিক জীবনের তরলতায় মণ্ডিত করেছেন। মেনকাও তেমনি, দাঁতন চিবুতে চিবুতে দুর্বাসার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। লাস্যময়ী 'মেনকা একপায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।' মেনকা এখানে তপোভঙ্গকারিণী স্বর্গদূতী নয়, তাকে ঘিরে রোমান্টিক সৌন্দর্যস্বপ্নও মুকুলিত হয়ে ওঠে না। মেনকা যখন দুর্বাসার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন দিব্যাঙ্গনাদের সম্পর্কে আমাদের কল্পনারঞ্জিত মোহমদির ধারণা ধূলিসাৎ হয়। আমাদের রঙীন চশমা ভেঙে যায়, দুর্বাসার সঙ্গে আমরাও কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি : 'অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হল স্বর্গবেশ্যা।' এই নির্মোহদৃষ্টিই গল্পটির প্রাণবস্তু। দুর্বাসার দাড়ির অরণ্যে ভরতের ঝুমঝুমি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপার চমৎকার 'সিচুয়েশ্যানে'র সৃষ্টি করেছে। গল্পটির শেষদিকে ঝুমঝুমির উত্তরাধিকারী দ্বিখণ্ডিত ভরতরাজ্যের দুই রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গ চমৎকার 'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সে'র সৃষ্টি করেছে :

'তারপর মট্ করে ঝুমঝুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা যাতে পাথরকুচি আছে, নড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিপি করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।' দ্বিখণ্ডিত ভরতরাজ্যের একটি 'খোল', আর একটি 'ডাঁটা'—তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎগর্ভ শ্লেষাত্মক 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স'!

'রেবতীর পতিলাভ' ('ধুস্তুরীমায়া') গল্পটির বিন্যাস, গ্রন্থনবৈচিত্র্য ও কৌতুককর ঘটনা-সন্নিবেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। পৌরাণিক চরিত্রকে নিয়ে 'ক্যারিকেচার' করার প্রয়াস এখানে নেই। সুচতুর লেখক সত্যযুগ থেকে একেবারে কলিযুগে অবতরণ করেছেন। ব্রহ্মলোকে রৈবত-নারদের অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সত্যযুগের উনিশ হাত কন্যাকে লাঙলের ফলার আকর্ষণে তিন হাত মানবীতে পরিণত করা, 'সিচুয়েশ্যান' হিসেবেও অত্যন্ত সুন্দর। একাল হলো মানিয়ে নেওয়ার যুগ। তাই বলরাম ও রেবতী পরস্পরকে 'অ্যাড্‌জাস্ট' করে নিয়েছেন।

'অগস্ত্যদ্বার' ('ধুস্তুরীমায়া') গল্পটি কোনো প্রচলিত পুরাণকাহিনী বা ঐতিহাসিক কাহিনীর ব্যঙ্গানুকৃতি নয়। এই পুরাণকাহিনী পরশুরামের স্বপরিকল্পিত। বিন্ধ্য ও অগস্ত্য সম্পর্কিত কাহিনী একটি বহুশ্রুত পৌরাণিক গল্প। এইটুকু সত্যের উপরে লেখক এক মনোহর কাহিনীর সৌধ তৈরী করেছেন। পৌরাণিক যুগের পটভূমিকা ও আবহাওয়াকেও সুকৌশলে সঞ্চারিত করা হয়েছে। কলিঙ্গররাজ কনকবর্মা ও বিদর্ভরাজ বিশাখসেন অগস্ত্যদ্বারে উপস্থিত হয়ে কে আগে দ্বার অতিক্রম করবেন, এই কলহে প্রবৃত্ত হলেন। দুই বিদূষকের মন্ত্রণায় দুই রাজা তাদের বিপরীত রাজ্যে প্রবেশ করলেন। এর ফলে দুই রাণীর কাছে দুজন যে কিভাবে অপমানিত হলেন তারই কৌতুকরসোজ্জ্বল কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিদূষক কোহড়ভট্ট ও বিড়ঙ্গদেবের ভূমিকা সবচেয়ে জীবন্ত। ঘটনার বৈচিত্র্যে গল্প জমে উঠেছে।

'ধুস্তুরীমায়া'র শেষগল্প 'গন্ধমাদন-বৈঠক'ও পুরাণের ছদ্মবেশে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা। সাতজন চিরজীবী পুরাণপ্রসিদ্ধ। তার পরের কাহিনী উদ্ভাবিত। এখানে গল্পরস দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। চরিত্রপ্রধান বা 'সিচুয়েশ্যান'-প্রধান না বলে গল্পটিকে বক্তব্যপ্রধান বলা যায়। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক নেতাদের কাহিনী ও কীর্তিকলাপ এঁদের নখদর্পণে। তাই বিভীষণ বলেছেনঃ "জয়চাঁদ, মীরজাফর, লাভাল আর কুইসলিং-এর দলে আমাকে ফেলেছে।" ব্যাসদেবের মুখে 'প্রোটোপ্লাজমের কথা' শোনা যায়। পৃথিবীর নানা অত্যাচার-অনাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর

বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরশুরাম ধূমপান করে বলেছেন : "ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূ-ভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদের ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই ?"—এ কোন পরশুরামের উক্তি ?

'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' ('কৃষ্ণকলি') গল্পটি ঘটনাবৈচিত্র্যের উপরই নির্ভরশীল। পঞ্চপতির প্রতি অভিমান করে দ্রৌপদী তাঁদের সঙ্গে একমাস বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। তাঁর মানভঞ্জন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাই রসিয়ে বলা হয়েছে। হাস্যরস এখানে তেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' ('কৃষ্ণকলি') গল্পে পরশুরামের কঠিন ও নির্মম শ্লেষ সরস রসিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে। পুরাণোক্ত বালখিল্যদের মাধ্যমে অকালপক্কতাকেই ব্যঙ্গ করেছেন। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই এরা বিদ্রোহের ধ্বজা তোলে, নানাধরণের শ্লোগান আওড়ায়। এক অপরিসীম তিক্ততা পরশুরামের ব্যঙ্গকে মারাত্মক রকম কুটিল করে তুলেছে। সরস কৌতুকের স্থান অধিকার করেছে নির্মম বিদ্রূপ। 'যযাতির জরা' গল্পটির মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে। যযাতির যৌবন গ্রহণ করার জন্য একহাজার জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হস্তিনাপুরে এসেছিলেন—যৌবনকে ফিরে পাওয়ার কি প্রলুব্ধ বাসনা! সুবর্তরাজকন্যা মনোহরার কাহিনী থেকে মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের বিশ্রুতকীর্তি পুরু মনোহরাকে পাওয়ার জন্য পিতৃ-আজ্ঞাপালনের অজুহাত দেখালেন। কাহিনীর এই অংশে লেখকের প্রচ্ছন্ন কৌতুককটাক্ষ লক্ষণীয়।

'নির্মোক নৃত্য' ('আনন্দীবাঈ') পরশুরামের একটি অসাধারণ গল্প। এই গল্পের দুটি দিক আছে—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। গল্পটির বহিরঙ্গে আধুনিক যুগের স্থূলরুচিবোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও গভীর কথা আছে কাহিনীর নিগূঢ় মর্মমূলে। পরশুরাম এখানে অনাসক্ত দার্শনিক। উর্বশী স্বর্গবিতৃষ্ণ, কারণ স্বর্গে সকলকেই জয় করা হয়েছে—দেবতাদের চাটুবাক্য তার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে মর্ত্যকবির বন্দনাও তার

কাছে অধিকতর কাম্য মনে হয়েছে। ইন্দ্র উর্বশীর গর্ব চূর্ণ করার জন্য জিতেন্দ্রিয় তিন ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন; উর্বশীর 'স্ট্রীপ-টীজ' নৃত্য শুরু হলো। পর্বত ও কর্দম ঋষি যথাক্রমে উত্তরীয় ও উর্ধ্ববাস উন্মোচিত হতে দেখেই সংযম হারিয়ে ফেললেন। সমস্ত আবরণ ও আভরণমুক্ত হয়ে উর্বশী যখন যথার্থই 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' হলেন, তখন একমাত্র দগ্ধেন্দ্রিয় কুতুকঋষি রইলেন অবিচলিত। কুতুকের কাছে উর্বশীর নগ্নসৌন্দর্যের কোনো মোহ নেই, সত্যসন্ধানী কুতুকের নির্মোহ দৃষ্টিতে উর্বশীর নগ্নকান্তির কোনো মূল্য নেই :

'মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আমাকে প্রতারিত করবার জন্য এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটি অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।''

কবি বলেছেন 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' কিন্তু সত্যসন্ধানী অনাসক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে ছাগদেহের সঙ্গে নারীদেহের কোনো পার্থক্যই নেই। উর্বশী একটির পর একটি নির্মোক মোচন করেছেন। সত্যসন্ধ কুতুকের সম্মুখে এক-একটি করে রোমান্সের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে সত্যের নিগূঢ় রহস্যলীলাই যেন তিনি আবিষ্কার করতে চান। কুতুক জাবালিরই পূর্ণতর সংস্করণ। ঘৃতাচীর লোধ্ররেণু ভেদ করে জাবালি আবিষ্কার করেছিলেন বার্ধক্যের বলিরেখা। তবু ঘৃতাচী যে বিগতযৌবনা তার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। উর্বশী সম্পর্কে এ প্রশ্ন আসে না। কুতুকের পরীক্ষা আরও কঠিন, তাঁর সিদ্ধান্তও নির্মমতম। কুতুকের সত্যসন্ধানী কঠিন দৃষ্টির নেপথ্যে বিজ্ঞানী পরশুরামের অনাসক্ত দৃষ্টি, অশীতিবর্ষদেশীয় স্থিতপ্রজ্ঞ শিল্পীর এক জ্যোতির্ময় নির্মোহ প্রত্যয়।

৭

অবিশ্বাস্য উদ্ভট পরিস্থিতি ও চরিত্রকে পরশুরাম অনায়াসে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। উদ্ভট কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু কৌতুকশিল্পী যখন রসের তুলি দিয়ে এই ছবি আঁকেন,

তখন এর সঙ্গে আমরা এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা অনুভব করি। 'ভূশণ্ডীর মাঠ' ('গড্ডলিকা') গল্পটিতে ভৌতিক জগতের এক উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেতলোকের কোনো রোমাঞ্চকর শিহরণ বা আতঙ্কপাণ্ডুর বীভৎসতার লেশমাত্র স্পর্শ নেই। ভৌতিক কাহিনীতে যে জাতীয় শ্বাসরুদ্ধকারী পরিবেশের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাকে যেন পদে পদে ব্যঙ্গ করাই হয়েছে। এ যেন সূর্যালোকিত পরিচিত বাস্তব পৃথিবীরই এক বিচিত্র কৌতুক-নাট্য। ভূশণ্ডীর মাঠের বর্ণনাও যেন কৌতুক-রেখায় আঁকা ব্যঙ্গচিত্র :

'ফাল্গুন মাসের শেষবেলা। গঙ্গার বাঁকের উপর দিয়া দক্ষিণা হাওয়া ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে। সূর্যদেব জলে হাবু-ডুবু খাইয়া এইমাত্র তলাইয়া গিয়াছেন। ঘেঁটু ফুলের গন্ধে ভূশণ্ডীর মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। শিবুর বেলগাছে নূতন পাতা গজাইয়াছে। দূরে আকন্দ-ঝোপে গোটাকতক পাকা ফল ফট্ করিয়া ফাটিয়া গেল, একরাশ তুলার আঁশ হাওয়ায় উড়িয়া মাকড়শার কঙ্কালের মত ঝিকমিক করিয়া শিবুর গায়ে পড়িতে লাগিল। একটা হলদে রঙের প্রজাপতি শিবুর সূক্ষ্ম শরীর ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা কাল গুবরে পোকা ভর্‌র্ করিয়া শিবুকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।'

বলাবাহুল্য এর মধ্যে কোনো অবাস্তব অতিলৌকিকের আবেদন নেই। বরং ছোট ছোট বর্ণনার মধ্যে কৌতুক-কণিকা ছড়ানো আছে। কাহিনীর শেষে শিবুর তিন জন্মের স্ত্রী ও নৃত্যকালীর তিন জন্মের স্বামী এক উৎকট দাম্পত্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। গল্পটির শেষে তখনকার সাহিত্যে নীতিবোধ ও শ্লীলতা সম্পর্কে যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, তার আভাস দিয়েছেন। কারিয়া পিরেত, নাদু মল্লিক পরশুরামের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। প্রেতলোকের মধ্যে তিনি বাস্তবজগতের রঙ্গ-কৌতুক সঞ্চারিত করে দুর্লভ শিল্প সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পটি পড়ে প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছিলেন :

"ভূশণ্ডীর মাঠে'র তুলনা নেই। এ ছবিটি আগাগোড়া কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু কি আশ্চর্য রকম realistic। আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভূশণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে very pleased to meet you, sir, না বলে থাকতে পারতুম না।"

'যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট' ('ধুস্তুরীমায়া') গল্পটির ভূমিকায় ক্যালকাটা ফিজিসাজিক ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকের তর্ক-বিতর্ক ও নানাজাতীয় অদ্ভুত গালগল্পের অবতারণা করতে হয়েছে। ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ির অলৌকিক কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এই জাতীয় আড্ডার প্রয়োজন ছিল। বিঘোর বাবা ও পঞ্চী-জটিরামের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে একটি রোমাঞ্চকর ব্যাপার, ধরহীন দুই ছিন্ন মুণ্ডর বীভৎসতাও কম নয়। গঙ্গার ধারে লোকালয়হীন নির্জনতার মধ্যে বিঘোরবাবার আশ্রম—তার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার দুটি ধরহীন মুণ্ড ছিল। সে দুই মুণ্ড আবার প্রয়োজন হলে কথা বলে, নানারকম মন্তব্য করে। এই আধাভৌতিক উদ্ভট কাহিনীর মধ্যেও কৌতুকরসের অভাব নেই। পঞ্চীর পূর্বস্বামী রমাকান্তর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রেমিক প্রেমিকার নবকলেবর হল—পঞ্চীর মুণ্ডতে লাগানো হলো জটিরামের ধর, জটিরামের মুণ্ডতে লাগানো হলো পঞ্চীর ধর—এক উদ্ভট সমাধান। গল্পটির শেষে কৌতুকের 'অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সে'র ধাক্কা গোটা কাহিনীটিকে জমিয়ে তুলেছে : 'পঞ্চী তার মস্কিউলার মদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।'

'শিবামুখী চিমটে' ('নীলতারা') গল্পটিও অদ্ভুতরসের। এর নায়ক কিশোর ঝিণ্টু। রুগ্ন শিশুর জরতপ্ত মনের দুর্বলতাকে লেখক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ে জরতপ্ত মস্তিষ্কে ঝিণ্টু তার পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক পূর্বপুরুষের তোরঙ্গ থেকে শিবামুখী চিমটে আবিষ্কার করেছে। চিমটের আজ্ঞাবাহী পিশাচ ঢুণ্ডদাস চণ্ড আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিনের মতো তার বালক-মুনিবটির সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছে। এর সঙ্গে ঝিণ্টুর পিসীমার সম্ভাব্য পাত্রদের কাহিনী যুক্ত হয়ে গল্পটি সরস হয়ে উঠেছে। আজগুবি কাহিনীর অলৌকিক মুখোশটি খুলে ফেলে লৌকিক জগতের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরশুরামের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। 'গড্ডলিকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন : "বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে

চিরকাল জানি।" পরশুরামের অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টি একটি দুটি নয়, অসংখ্য, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকেও তাদের অনায়াসে চেনা যায়। তার কথকদের মধ্যে দুটি চরিত্র সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কেদার চাটুজ্যে ও জটাধর বকশী। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানা ও নতুন দিল্লীর কালীবাবুর বিখ্যাত দোকান 'ক্যালকাটা টি ক্যাবিন' যথাক্রমে তাঁদের গাল-গল্প করার ক্ষেত্র। এই ধরণের মজলিশি আবহাওয়ায় এই দুটি অসাধারণ পুরুষ তাঁদের মিথ্যাকথার জাল বয়ন করেন। মজলিশি খোশগল্পের এই মেজাজটি বাংলা হাস্যরসাত্মক গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের বিচিত্র-কথক ডমরুধর, প্রমথ চৌধুরীর নীল-লোহিত ও ঘোষালের পাশে চাটুজ্যে মশাই ও জটাধর অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রঙ্গ-কৌতুক, খোশগল্প, 'গসিপ' দিয়ে গল্পকে জমিয়ে তোলার কৌশল ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের নীললোহিত ও ঘোষাল দীর্ঘকাল একই মেজাজে কথা বলতে পারেন নি—উদ্ভাবনীশক্তি কমে এসেছে, হাস্যরসের উৎসও এসেছে শুকিয়ে। ডমরুধর এ বিষয়ে অদ্বিতীয়—স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতল-ব্যাপী তার উদ্দাম কল্পনার স্বচ্ছন্দগতি। এবিষয়ে কেদার চাটুজ্যের স্থান ঠিক তার পরেই।

৮

'হনুমানের স্বপ্ন' পর্যন্ত গল্প-সঙ্কলনগুলি যেন মোটামুটি একই টানে লেখা, তাই গল্পকার পরশুরাম সম্পর্কে কোনো সংশয়ের প্রশ্ন জাগে নি। কিন্তু উক্ত সঙ্কলনটির পর থেকে পরশুরামের গল্পগুলির একটি গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে সমালোচক মহলে দুটি মত দেখা যায়। একদল মনে করেন যে, তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতে 'টেক্‌নিক' ও সুরপরিবর্তন ঘটেছে বটে, কিন্তু সৃষ্টিনৈপুণ্য অব্যাহতই আছে। আর একদল মনে করেন যে, তাঁর শেষদিকের গল্পে প্রথমদিকের গল্পের মতো সৃষ্টিক্ষমতা নেই। গল্পকার পরশুরামের সার্থকতা তথা ব্যর্থতা আলোচনার পক্ষে এই

জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা অপরিহার্য, সন্দেহ নেই। এইজন্য সমস্যাটির মূল অনুসন্ধান করা উচিত।

'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' ও 'হনুমানের স্বপ্ন'—এই তিনখানি গল্প-সঙ্কলনের মধ্যে মোটামুটি একটি ঐক্য আছে। গল্পগুলিতে কোনো ফাঁক নেই, ঠাস বুনোনির কোনো অভাব নেই। গল্পগুলি পূর্ণায়ত ও নিটোল—তাই গল্পরস আস্বাদনেও অতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কথারস সৃষ্টির নিপুণতায় তিনি সিদ্ধ। গল্পগুলির মধ্যে যে হাস্যরস আছে, তা যেমন অনাবিল, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে যে আতিশয্য আছে, তা রসবোধকে পীড়িত করে না, বরং রসসৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠে। জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টি কৌতুকপ্রসন্ন ও সহাস্যসুন্দর। কিন্তু 'গল্পকল্প' থেকে যেন আর এক পরশুরাম দেখা দিলেন। প্রসন্নতার স্থান অধিকার করেছে তিক্ততা ও মানসিক গ্লানি, শ্লেষাত্মক সমালোচনাগুলি অতিরিক্ত ঝাঁঝালো ও অনাবশ্যকরূপে উগ্র হয়ে উঠেছে।

গল্পরসের ধারাও অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে, তার স্থান অধিকার করেছে বক্তব্য। প্রথমদিকের গল্পগুলি যেমন তৃপ্তিদায়ক, এ যুগের গল্পগুলি তেমন নয়। এ যুগের গল্পগুলির মধ্যে গল্পরসের ধারা শীর্ণ, সূত্রকায়—অনেকগুলি গল্প নক্শা-জাতীয়, কতকগুলি গল্প শুধু সামান্য বিবৃতি অথবা যৎকিঞ্চিৎ সংলাপের উপরে গড়ে উঠেছে। এ যুগের প্রথম সঙ্কলনের নাম 'গল্পকল্প'। এই নামটিই যেন এ যুগের গল্পগুলির প্রকৃতি-নির্দেশক—ঠিক গল্প নয়, গল্পকল্প।

এ যুগের গল্পে পরশুরাম যুগজীবনের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। এ যুগের রাজনীতি ও আদর্শচ্যুত সংশয়বাদ তিনি নানাভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। 'গামানুষ জাতের কথা', 'রামরাজ্য', 'তিন বিধাতা' প্রভৃতি গল্পে, গল্পের লঘু আবরণের ভিতর দিয়ে লেখকের মানসিক তিক্ততা ও শ্লেষের জ্বালা উগ্র হয়ে উঠেছে। এ যুগের রাষ্ট্রবিধাতারা যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিভাবে শয়তানের সঙ্গে অপবিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তার একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় 'তিন বিধাতা' গল্পের শয়তানের উক্তি থেকে :

'ব্রহ্মা। নগদ টাকা আমরা নিতে পারি না।

শয়তান। নগদ টাকা নয়। আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ আতুরাশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল-রেডক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুকে খিচুড়ি খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাঁদের বড় বড় চাকরি আর মোটরকার দেওয়া হবে। এইসবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলদের নিরাপদে রাখবেন।'

যুগের গ্লানি ও বিবর্ণতাকে নির্মম সমালোচনা করতে গিয়ে পরশুরামের কৌতুকহাস্যের নির্মল ধারা ক্ষারকটু শ্লেষে পরিণত হয়েছে। তিক্ততায় ও মানসিক যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ধ্বংসের কুঠার উদ্যত হয়েছে যেন ঃ

'মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তারপর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।'

('গামানুষ জাতির কথা' ঃ 'গল্পকল্প')

'পরশুরাম বললেন, "হুঁ, খুব ধূমপান করেছ দেখছি, দশ-বিশ হাজার বৎসর বলতে মুখে বাধে না। ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূ-ভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদেরও ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় একবার অবতীর্ণ হই।" '

('গন্ধমাদন-বৈঠক' ঃ 'ধুস্তরীমায়া')

পরশুরামের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি সম্পর্কে আর একটি কথাও মনে হয়। শেষদিকে গল্পগুলিতে যেন বক্তব্যের প্রাধান্য ঘটেছে—বক্তব্যের ভঙ্গিটিও তীক্ষ্ণকণ্ঠ। সেই জ্বালাময় কণ্ঠই যেন কাহিনীর রসকে ঘনীভূত হতে দেয় নি। কিন্তু শেষজীবনের কোনো কোনো গল্পে তিনি যে গভীর জিজ্ঞাসা ও অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন, তার মৌলিকতা তর্কাতীত। হাস্যরসিকেরা আতিশয্যকে আঘাত করেন, পরশুরামও জীবনের সর্বপ্রকার

আতিশয্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তাঁর যুক্তিবাদী নির্মোহ দৃষ্টি শেষদিকের গল্পগুলিতে মার্জিত ইস্পাত-ফলকের মতো মর্মভেদী হয়ে উঠেছে। 'জাবালি' গল্পের ('কজ্জলী') জাবালিই 'নির্মোক নৃত্য' গল্পের ('আনন্দীবাঈ') কুতুকে পরিণত হয়েছেন, যশোবিমুখ বলিষ্ঠচিত্ত সংস্কারমুক্ত জাবালি অপ্সরী ঘৃতাচীকে বলেছিলেন : "হে সুন্দরি, কিছু মনে করিও না। তুমি নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার? তোমার দন্ত-পঙ্‌ক্তিতে ও কিসের ফাঁক?"

এই গল্পরচনার পর ত্রিশ বছরের বেশী পার হয়েছে। এর মধ্যে দেশ-কালের গভীর পরিবর্তন হয়েছে, পরশুরামের মনোজীবনও দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে—প্রসন্ন ললাটে দেখা দিয়েছে তিক্ততার অগ্নিলেখা, কৌতুক-পরিহাস পরিণত হয়েছে নির্মম শ্লেষ-বিদ্রূপের বজ্র-বিদ্যুতে। কিন্তু 'নির্মোক নৃত্য'-র মতো গল্প একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি ত্রিশ বছর আগে 'জাবালি'র মতো গল্প লিখতে পেরেছিলেন। নির্মোক নৃত্যে উর্বশী পর্বত ও কর্দম মুনিকে কামাহত করলেন, কিন্তু কুতুক রইলেন অবিচলিত। উর্বশীর 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি'র অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে, কুতুক সেই তথ্যই জানতে চান। কুতুকের কাছে উর্বশী অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে তার দেহের কোনো পার্থক্য নেই। জাবালি ও কুতুক অনাসক্ত শিল্পী পরশুরামের শিল্পীসত্তার প্রতীক। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহদৃষ্টি তাঁর পরবর্তীকালের গল্পে তীক্ষ্ণতর হয়েছে।

৯

হাস্যরস এমন একটি বিশেষ রস যে, বছরের পর বছর তাকে সমানভাবে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিকরাও এই বিধান থেকে নিষ্কৃতি পান নি। অবশ্য যাঁরা এক সঙ্গে সাহিত্যের বিচিত্র প্রকরণ ও নানা রস নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কথা আলাদা। কারণ তাঁদের হাতে নানা রঙের তুলি থাকে। কিন্তু যাঁরা মূলত হাস্যরসিক, তাঁরা

দীর্ঘকালব্যাপী ঐ একই রসের চর্চা করলে, এর সজীবতা ও মৌলিকতা অনেক সময়ই হারিয়ে ফেলেন—পুনরুক্তি দোষ ও 'ম্যানারিজমের' সম্ভাবনা দেখা দেয়। তা ছাড়া, হাসির স্বাভাবিক উৎস শুকিয়ে এলে জোর করে হাসানোর চেষ্টা করা নিছক মুখ ভ্যাংচানি মাত্র—তাকে পেশাদারী কাষ্ঠ-হাসি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, হাস্যরসিকের একটি মাত্রাজ্ঞান থাকার প্রয়োজন। সংযম ও শালীনতা অন্যরসের মতো হাস্যরসেরও রক্ষাকবচ।

পরশুরাম আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই দুইটি দুর্লক্ষণের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে তিনি অক্ষতদেহে জয়ী হয়েছেন তা বলা যায় না—পরশুরামের মতো স্থিতধী শিল্পীও বিধ্বস্ত হয়েছেন। পরশুরাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই পীড়াদায়ক প্রসঙ্গটির উল্লেখ না করে পারা যায় না। 'তিরি চৌধুরী' ('নীলতারা') গল্পটিকে পরশুরামের লেখা বলে মানতে ইচ্ছা হয় না।—গল্পরসও নেই, বক্তব্যের গভীরতাও নেই।—আগাগোড়া ছিব্‌লেমি ছাড়া আর কিছু নয় (তবু প্রমথ চৌধুরী কথিত 'গুণপনাযুক্ত ছিব্‌লেমি' যদি হতো!)। হাইকোর্টের জজ করুণাময় দত্তগুপ্তের সঙ্গে চেনা-জানা নেই, সতের বছরের একটি মেয়ে রসিকতা শুরু করে দিল—তাও যদি মাত্রাজ্ঞান থাকত! অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে ঠাকুমাকে টেনে এনে তার সম্পর্কে বলেছে: "আর আমার এই ঠাকুমাকেও দেখুন, বেশ সুন্দরী নয়? যদিও সাতষট্টি বছর বয়সের দরুণ একটু তুবড়ে গেছেন, পুরনো ঘটির মতন।" আবার 'হতে হতে ফস্‌কে যাওয়া ঠাকুদ্দা' গৌরগোপাল সম্পর্কে সে বলেছে: "আহা, ওঁর সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হত তা হলে বাবার রং আর একটু ফরসা হত, আর আমারও রূপ উথলে উঠত একেবারে ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি।" গল্পটি আগাগোড়াই এক অসহ্য রকমের প্রগল্‌ভতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'চমৎকুমারী' ('চমৎকুমারী') গল্পটিরও ঐ একই ধরণের ত্রুটি। গ্রেট মারাঠা সার্কাসের ষ্ট্রং ম্যান গগনচাঁদ চক্কর আহত মনোলোভার সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেছে, তা হাস্যরসের সৃষ্টি তো করেই না, উপরন্তু রসচেতনায় আঘাত করে। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: (ক) 'অমন রামচন্দ্রী স্বামী জোটালেন কোথা থেকে? আপনার কর্তা বুঝি মনে করবেন আমার ওপর আপনার

অনুরাগ জন্মেছে, আমার স্পর্শে আপনি পুলকিত হয়েছেন, এই তো?' (খ) 'আমাকে কি অচ্ছুত হরিজন ভেবেছেন না সেকেলে বঠ্ঠাকুর ঠাউরেছেন যে ছুঁলেই আপনার ধর্মনাশ হবে? মনে মনে ধ্যান করুন—আপনি একটা দুরন্ত খুকী, রাস্তায় খেলতে খেলতে আছাড় খেয়েছেন, আর আমি আপনার স্নেহময়ী দিদিমা, কোলে করে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।'

পরশুরামের শেষদিকের কয়েকটি গল্পে এই ধরণের স্বধর্মচ্যুতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। জোর করে হাসাতে গিয়ে ও ফরমায়েসি গল্প লিখতে গিয়ে পরশুরামের কুঠারের ধার নষ্ট হয়েছে। তাঁর মতো শক্তিশালী শিল্পীর এই স্বধর্মচ্যুতি রসবোধকে পীড়িত করে। তাই কেউ কেউ যে তাঁর শেষদিকের গল্পে ক্লান্তি ও অবসাদ লক্ষ্য করেছেন, তাও একেবারে অযথার্থ মনে হয় না।

পরশুরামের গল্পের হাস্যরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সমালোচকেরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু কয়েকটি গল্পে পরশুরাম জীবনের গভীর মর্মমূলে যে বেদনার উৎস আছে, তাও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। গল্পকার পরশুরামের মননশীলতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—হাল্কা হাসির বুদ্‌বুদ্‌বিলাসই তাঁর গল্পগুলির চরম ফলশ্রুতি নয়, এর নেপথ্যে আছে গভীর 'ফিলজফি—যা হাসায় না, ভাবায়। শেষজীবনের কয়েকটি গল্পে মানবজীবনের আর একটি রূপও উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'ধনুমামার হাসি' (নীলতারা) গল্পটি চরিত্র-প্রধান। একে হাস্যরসের গল্প বলা যায় না, বরং একটি সূক্ষ্ম বেদনারই আভাস আছে। গল্পটির অতর্কিত উপসংহারের মধ্যে যে নীলোজ্জ্বল বেদনার রেখা আছে তার আলোতে ধনুমামার বিচিত্র চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। 'ভূষণ পাল' ('চমৎকুমারী') গল্পটিতে পরশুরাম বেদনার আর একটি উৎস আবিষ্কার করেছেন। খুনী ভূষণ পালের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। জীবনের সেই মুহূর্তে চকিতে একবার খুনী আসামীর অন্তস্তলের স্নেহমমতার গোপন উৎসটি উদ্ভাসিত হয়েছে। কৌতুকশিল্পী যে করুণরসের উদ্বোধনেও কত নিপুণ হতে পারেন, তার প্রমাণ এই গল্পটি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের অভাব হয়নি। শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও কয়েকজন শক্তিশালী হাস্য-রসিকের অবির্ভাব ঘটেছিল। ইন্দ্রনাথ-যোগেন্দ্রচন্দ্র-ত্রৈলোক্যনাথ-প্রভাতকুমার-

প্রমুখ হাস্যরসিকদের দান কম নয়। পরশুরামের সাহিত্যিক মেজাজ ও হাস্যরসের প্রকৃতির সঙ্গে পূর্বসূরীদের বহু পার্থক্য আছে। ইন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রচন্দ্রের মতো তিনি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে লেখনী ধারণ করেন নি, প্রভাতকুমারের চেয়ে তিনি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ ও গভীর। নাগরিক মানস ও বৈজ্ঞানিক পরশুরামের জগৎ ত্রৈলোক্যনাথের জগৎ থেকেও অনেক দূরে। প্রথম দিকের দু একটি গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের পদচিহ্ন থাকলেও, তিনি সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করেছেন। পৌরাণিক যুগের মতো এ যুগেও পরশুরাম একজনই—যাঁর নিপুণ কুঠারের ধারালো রেখায় চিত্র ও চরিত্রের বিচিত্র কারুকার্য, যাঁর অনাসক্ত শিল্পীসত্তার ঐশ্বর্যে হাস্যরসও মহৎ শিল্প।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটি এক নূতন ধরণের সাহিত্যসৃষ্টি। অবশ্য 'পথের পাঁচালী' রচয়িতা বিভূতিভূষণের সঙ্গেই পাঠক-সাধারণের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর। 'পথের পাঁচালী'র অসাধারণ জনপ্রিয়তার একপাশে অরণ্যজীবনের এই মহাকাব্যটি যেন খানিকটা অনাদৃত, সাহিত্য-বিচারের দিক থেকেও এযাবৎকাল এর পূর্ণাঙ্গ মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়নি। অথচ বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, পরিকল্পনার মৌলিকত্বে, প্রকৃতি ও মানুষের অদ্বৈত সম্পর্ক রচনায় ও জীবনদর্শনের গভীরতায় 'আরণ্যক' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। চাকুরী উপলক্ষ্যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রান্তর ও সেখানকার বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে যে নিবিড় একাত্মতা গড়ে উঠেছিল, তাকে স্মৃতি-রোমন্থনের দুর্লভ ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছেন শিল্পী। 'আরণ্যক' নূতন ধরণের উপন্যাস—নূতনত্ব এর বিষয়নির্বাচনে ও রচনারীতিতে।

'আরণ্যক'-এর ভূমিকায় লেখক নিজেই মন্তব্য করেছেন ঃ "ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে, উপন্যাস।"—লেখকের এই কৈফিয়ৎ নিতান্ত অর্থহীন নয়। তাঁর এই উপন্যাসটি যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এ বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। তাছাড়া ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরীর সঙ্গেও হয়তো বা এর কিছু মিল আছে—এমন ধরণের একটি ধারণাও গ্রন্থকারের হয়তো মনে হয়ে থাকবে। 'আরণ্যক'-এর ঔপন্যাসিক ধর্ম প্রসঙ্গে লেখকের এই মন্তব্যটি আলোচনার প্রয়োজন। ডায়েরীতে একটি ব্যক্তিপুরুষের আত্মগত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অথবা অনেকগুলি ঘটনার খণ্ডাংশ থাকে। সাধারণত এই শ্রেণীর রচনায় কোন ধারাবাহিকতা থাকে না। ঘটনার পারম্পর্য ও সংহতি সাধারণত এই শ্রেণীর রচনায় অনুপস্থিত। কেন্দ্রগত সংহতির অভাবে ঘটনাগুলি প্রধানত খণ্ড কাহিনীমূলক বা Episodic হয়ে ওঠে। সচরাচর ডায়েরী সন-তারিখ চিহ্নিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, ডায়েরীতে এক প্রকার প্রত্যক্ষতা ও সত্যভাষণ থাকে—ব্যক্তিগত ভাবনা বা অভিজ্ঞতা-লব্ধ ঘটনাই প্রধানত ডায়েরীর বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। উপন্যাসের সবটুকুই রচনা, বিভূতিভূষণ

বলেছেন "বানানোগল্প"। ডায়েরীর লেখক সত্যভাষী, উপন্যাসের লেখক তুলনামূলকভাবে মূলত কল্পনাশ্রয়ী ও উদ্ভাবনকৌশলী। ডায়েরীর তুলনায় উপন্যাস অনেক বেশী বস্তুধর্মান্বিত। ডায়েরীর আখ্যায়িকাগ্রন্থন বা প্লটরচনা একটি প্রধান বস্তু—ভালো উপন্যাসের আখ্যায়িকা হবে ঘনপিনদ্ধ ও কেন্দ্র-সংহত। ডায়েরী-শ্রেণীর রচনায় প্রসঙ্গচ্যুতি গুরুতর অপরাধ নয়—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে লঘুপক্ষ বিচরণের মধ্যে খেয়াল-খুশীর মেজাজটি সহজেই ধরা পড়ে। এ জাতীয় লেখাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাজে লেখা', প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'খেয়ালী রচনা।' ঔপন্যাসিকের পক্ষে এতখানি খেয়ালী হলে চলে না।

ভ্রমণকাহিনীর ঘটনাও ডায়েরীর মত প্রত্যক্ষগম্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ। ভ্রমণকাহিনী ভ্রমণেরই কাহিনী—ভ্রমণই মুখ্য, কাহিনী গৌণ। কিন্তু উপন্যাসে কাহিনীই মুখ্য, সেখানে কাহিনীরই স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ। তবে ভ্রমণকাহিনীও উপন্যাসধর্মী হতে পারে; যেমন প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'। উপন্যাসের মূল কাহিনী ও তাকে কেন্দ্র ক'রে উপকাহিনীগুলির কেন্দ্র-সংহত ঐক্য ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরীতে মেলা কঠিন। গল্পাংশের প্রতি ভ্রমণকাহিনী-রচয়িতা মমতাহীন—কারণ ভ্রমণের নেশাই এখানে মুখ্য। তাই ভ্রমণকাহিনী ভ্রাম্যমাণের ভ্রমণের নেশাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে বহু কাহিনী আক্ষেপে মরে —ক্ষণিকের জন্য বহু কাব্যের উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার জন্ম হয়। গতির নেশায় ও চলমান জীবনের উন্মাদনায় চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ পরিণতিদানের অবকাশ কোথায়? এইজন্য উপন্যাস ঘটনা, চরিত্র ও জীবন-জিজ্ঞাসা মিলিয়ে একটি সমগ্র জীবনের যে অখণ্ড রূপ উদ্‌ঘাটিত করে, ভ্রমণকাহিনীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যেখানে ভ্রমণকাহিনী এই দাবী পূরণ করেছে, সেখানে ভ্রমণ-কাহিনী উপন্যাসে পরিণত হয়েছে—যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'। ভ্রমণ-কাহিনী ডায়েরীর মতো আত্মনিষ্ঠ না হলেও উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী আত্মগত ভাবনার অবকাশ সেখানে আছে। অবশ্য উপন্যাসেও ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির আলোকপাত ঘটে, কিন্তু তার সঙ্গে ডায়েরীলেখক বা ভ্রমণকাহিনী-রচয়িতার আত্মগত ভাবনার মৌলিক প্রভেদ আছে। উপন্যাসে বস্তুধর্মী জীবনরসকেই ঔপন্যাসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা রসরূপ দেয়, ডায়েরী বা

ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিই সর্বত্র জগৎ ও জীবনের এক একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে 'আরণ্যক'-এর মধ্যে ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী ও উপন্যাস—এই ত্রিধারাকে মিশিয়ে ফেলা সম্ভব—তাই লেখকের এই সতর্কবাণী। 'আরণ্যক' উপন্যাসে লেখক ডায়েরীলেখকের মতো উত্তমপুরুষ ব্যবহার করেছেন। অনেক সময় কাহিনী বা পরিচ্ছেদের মধ্যে যে সুচিহ্নিত কাল-সঙ্কেত দিয়েছেন, তাতে খানিকটা ডায়েরীর ধর্ম ফুটে উঠেছে বই কি! ডায়েরীর মধ্যে যেমন আত্মগত ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, 'আরণ্যক'-এ তার অভাব নেই। তথাপি আরণ্যক' ডায়েরীর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিত্র ও ভাবনার সমষ্টিমাত্র নয়, একটি বিরাট অরণ্য-জগৎ ও বিভূতিভূষণের কবিজনোচিত প্রকৃতি-দৃষ্টি কাহিনীকে একটি ভাবসংহতি দিয়েছে। চরিত্রগুলি বিচিত্র হলেও বিচ্ছিন্ন নয়—এক বিশাল অরণ্যজগতের এক একটি অংশ। বিভূতিভূষণের ব্যাপক ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি মানুষ, ঘটনা ও প্রকৃতিকে একই সূত্রে সমন্বিত করে একটি অখণ্ড জীবনরহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। বিভূতিভূষণের কল্পনাশক্তি প্রত্যক্ষ জগতের অনেক উপরে এক নবীন 'কল্পলোক' সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডায়েরীর লেখক দৈনন্দিন সাময়িকতার সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু বিভূতিভূষণ তাকেও ছাড়িয়ে রচনা করেছেন নবীন 'কল্পলোক'।

'আরণ্যক' উপন্যাসে ভ্রমণকাহিনীর লক্ষণও কিছু কিছু মেলে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন : "আরণ্যকের পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশীনদীর পারে এইরূপ দিগন্ত-বিস্তীর্ণ অরণ্য প্রান্তর পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে।"—লেখকের এই বিবৃতি খানিকটা সত্যাশ্রয়ী ভ্রমণবৃত্তান্তের স্বপক্ষে। কিন্তু গ্রন্থটি কি ভ্রমণ-মুখ্য? 'আরণ্যক'-এর উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়, এমন কি পরিণতিও নয়। উদ্দেশ্য চাকুরী, পরিণতি বিগত দিনের স্বপ্ন-সুন্দর স্মৃতি রোমন্থন। জগতকে ছাড়িয়ে একটি সমৃদ্ধ আকাশচারী প্রেক্ষাপট ও তার অধ্যাত্ম-বিশুদ্ধিমণ্ডিত কবিজনোচিত বর্ণনা 'আরণ্যক'-এর মূল সুর। ভ্রমণকাহিনীতে মুখ্য গতির রস, ভ্রমণকাহিনী-রচয়িতা তাই 'পথের পাঁচালী'-কার। কিন্তু 'আরণ্যক' নীড়াশ্রয়ী মানুষের কল্প-বাসর। বিভূতিভূষণের মন যতই বিচরণ করুক না

কেন, তাঁর চিত্তবৃত্তি যাযাবর নয়। তাই নীড়াশ্রয়ী মানুষের সুখদুঃখপূর্ণ সংসারকে কী মমতাময় দৃষ্টির সাহায্যেই না তিনি দেখেছেন। প্রবোধকুমার সান্যাল যথার্থ যাযাবর—এই যাযাবরবৃত্তি তাঁর উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীর প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিভূতিভূষণ নীড়াশ্রয়ী মানুষ হয়েও কল্পলোকের স্বপ্ন দেখেন—তিনি কল্পপথের যাযাবর। 'আরণ্যক'-এর মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর যে সমন্বয় তা ভ্রমণকাহিনীতে মেলা কঠিন। মূল কাহিনীর নায়ক সীমাহীন বিশ্বপ্রকৃতি, উপকাহিনীতে অনেকগুলি ছোটগল্প—এই দুই কাহিনীরই ভাষ্যকার লেখক স্বয়ং। অরণ্যজগৎ যেন বৃহৎ বনস্পতি, উপকাহিনীর নরনারীরা যেন এক একটি শাখাবিহঙ্গ—এক একটি নীড় তাদের বিচিত্র সংসার। এই অখণ্ড জগতের ছবি এঁকেছেন অনাসক্ত শিল্পী বিভূতিভূষণ।

'আরণ্যক' যে ধরণের উপন্যাস, তা সাহিত্যজগতে বিরলদৃষ্ট। ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের বিচিত্র শ্রেণীর মধ্যেও 'আরণ্যক'-এর দোসর মেলা কঠিন। সাধারণত উপন্যাস রচনায় তিনটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। 'ডাইরেক্ট' পদ্ধতি —এখানে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিকের মতো ঘটনা বলে যান। তিনি নিজে শুধু বক্তা, তার অতিরিক্ত কিছু নন। অধিকাংশ উপন্যাসই এই পদ্ধতিতে লেখা। দ্বিতীয়ত, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক শুধু উত্তম পুরুষে কথা বলেন না, নিজেও একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত, কতকগুলি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পত্রখণ্ড অথবা দিনপঞ্জী সঙ্কলনের মধ্য দিয়ে ঘটনা ও চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। 'আরণ্যক' রচনারীতির দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর উপন্যাসের সঙ্গেও 'আরণ্যক'-এর প্রচুর পার্থক্য আছে। 'আরণ্যক' অনেকটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলেও এর কথাবস্তু সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। মানব-চরিত্র এখানে অনুপস্থিত না হলেও, গৌণ। বিশ্বপ্রকৃতিই 'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক। 'আরণ্যক' নূতন ধরণের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ইংরেজ সমালোচক বলেন : "In adopting the autobiographical form, a novelist may frequently do bring all his materials naturally within the compass of the supposed narrator's knowledge and power ; he may sometime miss the true personal tone"

—এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ কোথাও তাঁর 'personal tone' হারান নি, অথচ তাতে এর সার্বজনীন রসাস্বাদনের কোন বাধা ঘটে না। 'আরণ্যক' উপন্যাস নূতন ধরণের, নূতন বিষয়ের।

২

'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আদিম ও বিশাল আরণ্যক প্রকৃতি। বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন স্বর সংযোজন করেছেন। সমস্যাকাতর, যন্ত্রজর্জর শহরতলীর নানামুখী বিকৃতি ও অবক্ষয়ের চিত্র যে যুগে প্রধান হয়ে উঠেছিল,—সেখানে বিভূতিভূষণ এক আত্মমুগ্ধ মৃত্তিকাশ্রয়ী সহজ জীবনের পিপাসাকে জয়যুক্ত করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির সেই এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড বিভূতিভূষণের শিল্পীমনে অভিনব চেতনার সঞ্চার করেছিল। 'আরণ্যক' প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ জীবনবাণী। এখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী সাধারণ বর্ণনার মধ্যেই তাঁর কবিশক্তিকে সীমাবদ্ধ করেন নি, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি প্রকৃতির মর্মবাণীকে উদ্ঘাটিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মর্মবাণী এমন আন্তরিকভাবে আর কারও রচনায় ধরা দেয় নি।

রোমাণ্টিক যুগের ইংরেজ কবিদের প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমানকালের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলেছেন: 'They (রোমাণ্টিক কবিরা) all had a deep interest in Nature, not as a centre of beautiful scenes, but as an informing and spiritual influence of life. It was as if, frightened by the coming of industrialism and the nightmare towns of industry, they were turning to Nature for protection. Or as if, with the declining strength of traditional religious belief, men were making a religion from the spirituality of their experiences.' সমালোচকের মতে রোমাণ্টিক যুগের কবিদের প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার বৈশিষ্ট্য মূলত তিনটি: তাঁরা প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী রূপের

চেয়ে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গূঢ় শক্তির সঙ্গে একপ্রকার আত্মিক যোগ অনুভব করেছেন। দ্বিতীয়ত, যন্ত্র সভ্যতার যুগে তাঁরা মুক্ত প্রকৃতির বুকে আশ্রয় খুঁজেছেন। তৃতীয়ত, প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তাঁরা নূতন একধরণের 'প্রকৃতি-তন্ত্র' আবিষ্কার' করেছেন।

লবটুলিয়া বইহারের অরণ্যানীতে, বনপাহাড়ে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে, মহালিখারূপ পাহাড়ের পাদদেশে, সরস্বতী কুণ্ডার ধারে স্বপ্নমুগ্ধ লেখক প্রকৃতির নানা রূপচিত্র ফুটিয়েছেন। বর্ণনার বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ণ ও স্পর্শাতুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সহজ আনন্দরসে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। বনপাহাড়ের মুক্ত সৌন্দর্য, দিগন্ত-বিসর্পিত উদাস অরণ্যানী, সূর্য্যাস্তের রঙ, রাঙা পলাশফুলের দীপ্তি, দুগ্ধ-শুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের সূর্যমুখী, রাঙা মাটির জমি, পুষ্পিত কদম ও পিয়ালের সমারোহ, নীরব নিশীথে পীতাভ জ্যোৎস্নার অপার্থিব শিহরণ—এ যেন বর্ণের প্লাবন। রূপের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভব 'আরণ্যক'-এর ছত্রে ছত্রে। কোথায়ও খররৌদ্ররঞ্জিত বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, কোথায়ও পুষ্পিত শাল-পিয়াল-মঞ্জরীর গন্ধখচিত ছায়া—বর্ণগন্ধের জগৎ—এ যেন অস্কার ওয়াইল্ড-বর্ণিত 'suffocating sensuousnes'-এর স্বপ্নরাজ্য। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির দৃশ্যসৌন্দর্য ও বর্ণবিস্তারী মোহাবেশ চিত্রণে ইন্দ্রিয়-সচেতনতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পে অজস্র নাম-না-জানা ফুল, নাম-না-জানা পাখীর পরিচিতি। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি-চিত্র বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রকৃতির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রস-সত্তা আছে, যা বিভূতিভূষণ ছাড়া অপর কারও পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। বনপ্রকৃতির নির্জনসৌন্দর্য, লতাগুল্মের অপার্থিব রহস্য প্রভৃতি চিত্র-রস সমৃদ্ধ। কিন্তু এই চিত্রধর্মিতাই 'আরণ্যক'-এর শেষকথা নয়।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁর 'টিনটার্ণ অ্যাবে' কবিতায় তাঁর প্রকৃতিদর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"The sounding cataract
Hunted me like a passion ; the tall rock,
The mountain, and the deep gloomy wood,
Their colours and their forms were to me

An appetite—a feeling and a love
That had no need of a remoter charm
By thought supplied, nor any interest,
Unborrowed from the eye."

নিছক প্রকৃতি-বর্ণনা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত 'colour' ও 'form'-এর জগৎ। প্রকৃতিচেতনার প্রথম স্তরে কবি রূপ ও বর্ণের আনুগত্য অস্বীকার করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণগন্ধের অন্তরালে এক মহাসত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—সে এক অতিশুভ্র জ্যোতির্ময় চৈতন্যশক্তি। ক্রমশ তিনি প্রকৃতির মধ্যে একজাতীয় ঐশীশক্তি অনুভব করেছিলেন। তিনি বেশীদিন বর্ণগন্ধের কারাগারে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি।

বিভূতিভূষণও বর্ণগন্ধের রূপলোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন নি। এক অতীন্দ্রিয় আবেদন তাঁর স্বপ্নাবিষ্ট চোখের সামনে নতুন পৃথিবীর ছবি তুলে ধরেছে। অরণ্যকুহেলিকা পার হয়ে, মরলোক ছাড়িয়ে বিভূতিভূষণ অনন্ত নক্ষত্রলোকের সভাকবি হয়ে উঠেছেন: "সে যেন খুব উচ্চাঙ্গের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তলে জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তাহার লয়-সঙ্গতি।" জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশবন অবলম্বন করে লেখকের মনে এক অসীম রহস্যানুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। এ সব বর্ণনা 'ল্যাণ্ড্স্কেপ' মাত্র নয়, চিত্রচতুর শিল্পীর বর্ণ-চাতুর্যও নয়—অসীম রহস্যের গূঢ় অনুভব। লেখক বলেছেন: "কিন্তু যে কথাটা বার বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা ছমছমকরানো সৌন্দর্যের দিকটা। জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ায় বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন রূপে, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে।"—প্রকৃতির বাইরের রূপাবরণ সরিয়ে দিয়ে তার দুরধিগম্য রহস্যময়তার দিক

বিভূতিভূষণ দেখেছেন—মিষ্টিক সাধকের মতো। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মধ্যে একটি অসীম রহস্যজিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়েছেন। যাঁরা প্রকৃতির বর্ণনায় এই প্রকার cosmic vision-এর অধিকারী তাঁরা বহিঃসৌন্দর্যের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকতে পারেন নি, যেমন পারেন নি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, যেমন পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। উর্ধ্বের আকাশের নক্ষত্রবাহিনী থেকে নিম্ন সমতলের অপার্থিব জ্যোৎস্না এক অসাধারণ কবিদৃষ্টির ঋজুরেখায় গাঁথা।

বিভূতিভূষণ পার্থিব আরণ্যক জগতের অন্তরালে এক ঐশীশক্তি ও অপার্থিব দেবলোকের সান্নিধ্য অনুভব করেছেন: 'পরিপূর্ণ ছায়াহীন জলের ওপর-পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হইয়াছে অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না; ভোমরা লতার শাদা ফুলে ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্রবস্ত্র উড়িতেছে।'—অপার্থিব দেবলোকের স্বপ্ন, সুর-বালিকাদের নৈশস্নান-বিলাস কীট্‌সীয় সৌন্দর্যলোক উদ্‌ঘাটিত করেছে। কীট্‌স তাঁর সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের সীমায় বসে কত বিস্মৃতপ্রায় মৃতযুগের স্বপ্নকাহিনীই না শুনেছিলেন!—কীট্‌সের পৃথিবী সুরলোকবিহারের পৃথিবী,—"The poetry of the earth is never dead." এক রূপাতীত অতীন্দ্রিয় ভাবুকতা তাঁকে নিছক বহিরাশ্রয়ী প্রকৃতির 'ফটোগ্রাফার' করে তোলে নি, প্রকৃতির মর্মমূলের এক অব্যক্ত ভাষণ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

প্রকৃতির আদিম দুরধিগম্য অসম্বৃত নগ্নসত্তা লেখককে ভয়ে বিস্ময়ে মাঝে মাঝে বিহ্বল করে তুলেছে। সেখানে কত অতিপ্রাকৃত কাহিনী, অরণ্য-রাজ্যের কত স্বপ্ন-সুন্দর রূপকথা, সেখানকার লোকজীবনের অজস্র জনশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মনকেও নিগূঢ়ভাবে আকর্ষণ করেছে। বিভূতিভূষণ কোলরিজের মতো অতিপ্রাকৃতকে সত্যে পরিণত করেছেন ও ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থীয় আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির অধিকারী হয়েও প্রকৃতির এক আদিম, অসংস্কৃত, অরুগ্ন মূর্তিকে ধ্যানলোকের সামগ্রী করে তুলেছেন। বিভূতিভূষণের দৃষ্টি বর্ণগন্ধ-রূপ-বিহ্বল জগৎ ছাড়িয়ে এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানী—এ যেন—

"When the light of sense

Goes out but with a flash that has revealed
The invisible."

বিভূতিভূষণ বুদ্ধির আলো নিভিয়ে এমনি একটি অতীন্দ্রিয় অনুভববেদ্য অসীম সৌন্দর্যলোকের ধ্যান করেছেন। মহালিখারূপ পাহাড় ও অরণ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণের আত্মমুগ্ধ ধ্যান-দৃষ্টি লোকাতীত লোকের সন্ধান করেছে—আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব পৃথিবীও স্বপ্নের মতো মনে হয়ঃ 'জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারদিকে চাহিয়া মনে হয়, এ সে পৃথিবী নয়,—যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু। ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয় রেখা যাকে কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে না, তাহাদের কাছে পৃথিবী ধরা দেয় না কোনকালেই।' পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে অপার্থিব রূপলোকের আস্বাদন বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তিনি পার্থিবকে অপার্থিব করেন, তেমনি অপার্থিবও তাঁর কাছে অবাস্তব নয়—এই দুই পৃথিবী বিভূতিভূষণের বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণনায় এক হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ বিশ্বাস ও স্বপ্নাবিষ্ট গূঢ় ভাবুকতা বিভূতিভূষণকে এক কল্পপৃথিবীর মহাভাষ্যকারে পরিণত করেছে।

৩

'আরণ্যক' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতি, কিন্তু অরণ্যজীবনের বিভিন্ন লগ্নে অনেকগুলি ছোটখাটো কাহিনী শাখা-বিহঙ্গের মত অরণ্য-বনস্পতিতে নীড় রচনা করেছে—এই কাহিনীগুলিই 'আরণ্যক' উপন্যাসের শাখা-কাহিনী। অরণ্যের প্রশান্ত-মধুর শ্যামলিমায়, ভীষণ রমণীয়তায়, অপার স্তব্ধতায় ও শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রায় এই সব কাহিনী ও চরিত্র বহু হয়েও এক। আদিম অরণ্যছায়ায় মানব-চরিত্রের কত ভীড়, কত আপাত-বৈচিত্র্য! অধ্যাপক বটুকনাথের উদার-শান্ত জীবনাদর্শ, সৌন্দর্যসাধক যুগলপ্রসাদের গভীর রাত্রে নির্জন অরণ্য-বিচরণ, কবি বেঙ্কটেশ্বরের গ্রাম্য

অথচ সহজ কবি-প্রাণ, সাঁওতালরাজ দেবারুপান্নার আন্তরিক আতিথেয়তা, নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়ার শিল্পপ্রাণতা, তরুণী ভানুমতীর সুকুমার হৃদয়াবেগ জীবনরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাখালবাবুর বিধবা পত্নী, দরিদ্র বাঙালী পরিবারের অনূঢ়া কন্যা ধ্রুবা-জবাও একটি ছোট্ট উপকাহিনীর সৃষ্টি করেছে; কুন্তার জীবন-কাহিনীও মানবীয় রস-সমৃদ্ধ। কতকগুলি অপ্রধান গ্রাম্যচরিত্রও অরণ্যজীবনের বিস্তৃত মঞ্চে ক্ষণিকের জন্য এসেছে, কিন্তু সেই ক্ষণটুকুর মূল্যও কম নয়।

বিভূতিভূষণ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মূলকাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনীকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর পদ্ধতি দুটি: এক, অরণ্যজীবনের ছত্রছায়া, দুই, লেখকের সমগ্র ও আন্তরিক দৃষ্টি। এই দুটি সূত্রে সমগ্র বিচ্ছিন্ন কাহিনী, অনেক টুক্‌রো কথা, অনেক ক্ষণিক আবেদন, পলায়নপর অনেকগুলি মুহূর্ত একটি ধ্রুপদী মহিমায় বাঁধা পড়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে যে পার্থক্য তা বহিরাশ্রয়ী মাত্র, আন্তরিক নয়। অরণ্যজীবনের এক সুগভীর মর্মস্পন্দন প্রতিটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঝঙ্কৃত হয়েছে। চরিত্রগুলি যেন অরণ্যগাথার এক একটি শ্লোক—তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকলেও নিগূঢ়ভাবে তারা এক। নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া যেন সরস্বতী কুণ্ডার নৃত্যশীল জলধারা, সৌন্দর্যসাধক যুগলপ্রসাদ যেন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঝরে-পড়া জ্যোৎস্না, সাঁওতালরাজ দেবারুপান্না যেন অরণ্যজগতের আপাত-রিক্ত মহিমা, তরুণী ভানুমতী যেন অরণ্যজীবনের শ্যামল পত্রাভরণ, বিহারপ্রবাসী বাঙালী কন্যারা যেন মৃত্তিকার কঙ্করময় অতি কর্কশ জীবনযাত্রার প্রতীক। এই জগতে আনন্দবেদনা, বিরহ-মিলন যেন এক বৃন্তে বিধৃত, সেখানে লাভ-ক্ষতির ভেদরেখাটুকুও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়—শুধু জেগে থাকে সুবৃহৎ অরণ্যভুমি, মায়াময় রাত্রি, পীতবর্ণের জ্যোৎস্নাভরণ ও একটি সহজ কবিমন। এমনি করেই বিভূতিভূষণ বিচিত্রকে এক করেছেন, আপাত পার্থক্যকে মহাসমন্বয়ের সুরে ভরে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণের মানব ও প্রকৃতির এই সম্পর্ক-চিত্রণ অতি সহজেই কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতি সাধারণ চরিত্র ও তুচ্ছ ঘটনা তাঁর অতীন্দ্রিয় জিজ্ঞাসাকে তীব্রতর করেছে। কর্মনিরতা একটি বালিকার

নির্জন-সঙ্গীত, অথবা অস্তসূর্যের আলোয় হ্রদের ধারে আর একটি বালিকার প্রশ্নচঞ্চল কণ্ঠ অথবা পার্বত্যপ্রদেশে জোঁক অনুসন্ধানকারী একজন গ্রামবৃদ্ধের আত্মকাহিনী-বিবৃতি—প্রভৃতি অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এক অপার্থিব রহস্যানুভূতি জাগিয়ে তুলেছে। তবুও তাঁর সমস্ত চরিত্র প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে গাঁথা নয়, তাঁর কবিতায় এমন চরিত্রও আছে, যা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয় নি: 'Among the pictures which has left us the influence of Nature on human character, Peter Bell may be taken as marking one end, and the poems on Lucy, the other end of the scale. Peter Bell lives in the face of Nature untouched alike by her terror and her charm; Lucy's whole being is moulded by Nature's self; she is responsive to sun and shadow, to silence and to sound and melts almost into an impersonation of a cumbrain valleys' peace.'—(Wordsworth: Myers). বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলিতেও সর্বত্র প্রকৃতির প্রভাব একই প্রকার তা বলা যায় না। কোনো কোনো চরিত্রে প্রকৃতির প্রভাব কেন, বিশুদ্ধ প্রকৃতিকেই পাওয়া যায়। 'আরণ্যক'-প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি চরিত্র দুটি: নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া ও সৌন্দর্যসাধক যুগলপ্রসাদ। ধাতুরিয়া যেন অরণ্যের চঞ্চল মৃগ—তেমনি নৃত্যশীল ও ক্রীড়াপরায়ণ—তার বিস্ফারিত চোখে সভ্যজগৎ সম্পর্কে বিস্ময়কর কৌতূহল! ধাতুরিয়ার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোধানও তেমনি। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে তার মৃত্যুর চিত্রটি বেদনার নীলরেখার মতো জেগে থাকে। ধাতুরিয়া যথার্থ শিল্পী—সে অর্থলোলুপ নয়, নিজের ভালোমন্দ বোঝে না, শুধু বোঝে তার শিল্প। সে অনাসক্ত। তার যথার্থ গুরু কেউ নেই—হয়তো ঝর্ণাধারার নিকট, হয়তো বনহরিণীর নিকট, হয়তো বা অতি পরিচিত নীল গাইয়ের নিকট সে তার শিল্পের দীক্ষা নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর ('গল্পগুচ্ছ': দ্বিতীয় খণ্ড) সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। তারাপদ সঙ্গীতমুগ্ধ, অনাসক্ত ও বন্ধন-ভীরু। ধাতুরিয়া-চরিত্র অধিকতর মানবীয়—সেইখানে তার চরিত্রের আড়ালে একটি করুণ সঙ্গীত

বেজে উঠেছে। উদ্ভিদতত্ত্ব বিশারদ সৌন্দর্যরসিক যুগলপ্রসাদ আর একটি প্রকৃতি-মানব। গভীর রাত্রিতে এক আদিম মৃত্তিকা তাকে আহ্বান করে। লতা-পাতা-ফুল প্রভৃতির সঙ্গে তার কী নিবিড় আত্মীয়তা! এমন করেই যুগলপ্রসাদ তার 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' সাধন করে। সরস্বতী কুণ্ডাতে বনভোজনরত রায়বাহাদুর ও তার দলটি এই অরণ্যজগতের সঙ্গে একেবারেই মিলতে পারে নি—এই দলটি যেন ধাতুরিয়া ও যুগলপ্রসাদের বিপরীত কোটি। অন্যান্য চরিত্র এই দুই কোটির মাঝামাঝি। এমন কি, বিহারপ্রবাসী বাঙালী মেয়েদের চরিত্র তাদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আভিজাত্যহীন অনাড়ম্বর অরণ্যজীবনের সভাসদ হয়ে উঠেছে। আধুনিক নাগরিক জীবনের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে যেখানে লোকচক্ষুর অগোচরে অরণ্যপ্রকৃতির একটি নিজস্ব কাহিনী আছে, সেখানে এই সব চরিত্রও লতা-পাতা-ফুলের মতো ফোটা-ঝরার সমতাল রক্ষা করে চলেছে। অরণ্য-মর্মর থেকেই তাদের উদ্ভব—তাই অরণ্যমণ্ডলী থেকে তাদের পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়—কালিদাসের ভাষায়—দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ।

৪

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ এক নির্জন প্রান্তরবাসী! এর জন্য দায়ী তাঁর মানসিক প্রকৃতি। যে যুগে তাঁর মানসজীবন গড়ে উঠেছে তার সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য কম নয়। বহু-শাখায়িত সমস্যা যখন আমাদের দেশ ও কালকে নানাদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন বিভূতিভূষণ যে-জগৎ তুলে ধরলেন তার স্বাদ স্বতন্ত্র, রস নূতনতর। যুগ-জীবনের বিভ্রান্তি, সমস্যার করাল ছায়া, জীবনের অবসাদ ও বিকৃতি কোন কিছুই যেন বিভূতিভূষণকে স্পর্শ করে নি। জীবনের যে রস-পিপাসা আনন্দ ও সৌন্দর্যের মহাভাষ্য-রূপে দেখা দিল, তা-ই প্রকৃতির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। সহজ জীবনের রূপকার হয়ে উঠলেন। কবি বিভূতিভূষণের দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় অতি সহজেই ধরা দিল লবটুলিয়া বইহারের আরণ্যক প্রকৃতি, মোহনপুরা এস্টেটের পার্বত্য অঞ্চল, সরস্বতী কুণ্ডার জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারা।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের কবি ও কথাসাহিত্যিকদের দৃষ্টি থেকে এ-দৃষ্টি স্বতন্ত্র। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিশ্বপ্রকৃতি আর কোথাও এমন করে ধরা দেয় নি। তারাশঙ্করের উপন্যাসে বাংলাদেশের আর একটি আঞ্চলিক প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের প্রাণ. কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও প্রকৃতির ছাপ মানব-চরিত্রের ওপর সব সময় তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর চর নিঃসন্দেহে চিত্র নয় চরিত্র, কিন্তু মানবজীবনের উপর তার প্রভাব তেমন নিগূঢ় নয়। 'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশাল অরণ্যানীর যেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের বিশ্বপ্রকৃতি-বর্ণনায় প্রধানত একটি সুরেরই লীলা। একটি বিশ্বাসমুগ্ধ কবিদৃষ্টি উপন্যাসটির সর্বত্র প্রসারিত—তারাশঙ্করের প্রকৃতির নিষ্ঠুর হাসি, নির্মম প্রতিহিংসা ও ধ্বংস-করালমূর্তি এখানে অনুপস্থিত। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি লালন-পরায়ণা, চিরসহিষ্ণু, ক্ষমাশীলা মাতৃহৃদয়। ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থের বিশ্বপ্রকৃতি-চিত্রণ প্রসঙ্গে হাক্স্‌লির মন্তব্যটির কথা মনে পড়ে: 'A few weeks in Malaya or Borneo would have undeceived him. Wandering in hothouse darkness of the jungle, he would not have felt so serenely certain of those. 'Presence of Nature,' those 'Souls of lonely places' which he was in the habit of worshipping on the shore Windermere and the Rydal.' [Wordsworth in the Tropics : Aldous Huxley.]

বাংলাদেশের কোন অখ্যাত পল্লী অঞ্চলে হোক, অথবা গয়া জেলার অরণ্যানী হোক্, বিভূতিভূষণের দৃষ্টিকোণের কোন পরিবর্তন ঘটে না। 'আরণ্যক' উপন্যাসের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এক দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাপ্রকৃতি। আরণ্যক জীবন অসংস্কৃত, আদিম। মানুষ ও প্রকৃতি মিলে যে একটি ভূখণ্ড গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রকৃতি যেমন অনায়াস-বন্য, মানুষও তেমনি বন্য হয়েও সহজ ও প্রকৃতি-অনুগ। টমাস হার্ডির উপন্যাসে Egdon Heath-এর যে বিশাল অকর্ষিত প্রান্তরের অসাধারণ চিত্র আছে তার ভয়াবহ রহস্য ও মানব-ভাগ্যের উপর নিষ্করুণ ছায়াসম্পাত এক

অখণ্ড সঙ্কেত ঘনিয়ে তোলে। Egdon Heath-এর অনুর্বর আদিমতা, জড়-প্রকৃতির ক্রূর কুটিল রহস্যের মহাকাব্যের প্রসার লবটুলিয়া বইহারের অরণ্য প্রকৃতির চেয়েও বিস্তৃত ও গভীর। কিন্তু হার্ডির নিয়তিবাদ ও দুঃখবাদের স্বরূপ এই বিশাল প্রকৃতিচিত্রটিকে এক ক্ষমাহীন অন্ধ শক্তিতে পরিণত করেছে। তাঁর 'দি রিটার্ণ অব দি নেটিভ' গ্রন্থে Egdon Heath-এর এই অন্ধ প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'In Hardy's novels it may not be fate that is shown working through us but it is certainly the earth working through us, both the earth and ourselves being part of the expression of the Immanent Will, or you prefer, the blind Creative Principle',—প্রকৃতির মূর্তি বিভূতিভূষণের কবিপ্রকৃতির অনুকূল নয়। বিভূতিভূষণের বিশ্বপ্রকৃতি ধ্যানমৌন, স্বপ্ন-সুন্দর, রহস্য-নিবিড়, তবু তার বিশাল ছায়ায় এক একটি লোকালয় পালিত হয়। বিভূতিভূষণের অরণ্য শেষ পর্যন্ত যন্ত্রদানবের কাছে ধরা দিয়েছে। কিন্তু হার্ডির প্রকৃতি আদিম বর্বর ও অপরিবর্তনীয়, তেমনি তার ক্রূরতা: 'The untameable, Ishmaelitish thing that Egdon now was, it always had been. Civilisation was its enemy, and ever since the beginning of vegetation its soil had worn the same antique brown dress, the natural and invariable garment of the particular formation.'

প্রকৃতির মাধ্যমে বিভূতিভূষণ রোমান্সের ধারাকে পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। এবং রহস্যময় আদিম প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে জীবন ও জগৎ-সত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। প্রকৃতির একদিকে আদিম অরণ্যভূমি, অন্যদিকে অন্তরীক্ষ —এক দিকে আদিম লোকায়ত সংস্কৃতি, অন্ধ কুসংস্কার, সরল আদিম বিশ্বাস; অন্যদিকে তাঁর রোমান্স-প্রবণ মনের কবিত্বময় অনুভূতি: 'কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ে সে কি আনন্দ। সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না, কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।'—কবি বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিকের বুদ্ধিধর্মী বিশ্লেষণের পথে না গিয়ে অনুভূতির অতলে ডুব দিয়েছেন। এই গভীর

সৌন্দর্যদৃষ্টি বিভূতিভূষণের প্রকৃতিরসের প্রাণ: 'যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজীর মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতের নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নব নব প্রাণের বিকাশ কী রূপে নিহিত!'—প্রকৃতির লীলা-সুন্দর আনন্দরূপের উপাসক তিনি। হার্ডির উপন্যাসে 'এগ্‌ডন হীথ'-এর ভয়াবহ রহস্যের দানবীয় বজ্রমুষ্টির নীচে মানুষ নিয়তি-পিষ্ট।

যন্ত্র-সভ্যতা ও আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি কলকাতার উপকণ্ঠের অধিবাসী হয়েও বিভূতিভূষণ সুদূর অতীত অথবা রহস্যময় পল্লীপ্রকৃতির স্বপ্নে আবিষ্ট। 'আরণ্যক' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে এই যন্ত্র-জীবিত জীবনের প্রতি বিক্ষোভ ফুটেছে। এখানে হার্ডির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত মিল। যা অপরিবর্তিত, প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার প্রতীক, সভ্যতা যাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি—তাকেই তাঁরা রূপ দিয়েছেন। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-চেতনার তিনটি ধাপ—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টি প্রদীপ'-এ প্রকৃতি থাকলেও, মানুষ গৌণ নয়। 'আরণ্যক' দ্বিতীয় ধাপ—এখানে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। 'আরণ্যক'-এর পরে আর একটি চেতনাও দেখা দিয়েছিল—সেখানে মানব অথবা প্রকৃতি, কোনটিই মুখ্য নয়—সেখানে অপুর রেলগাড়ী নেই, অরণ্য-জমিদারীর ম্যানেজার বাবুর ঘোড়াও নেই—সে এক জ্যোতিবাহিত পথ—আলোক রথ—মুক্ত শুভ্র দেবযান।

'আরণ্যক'-এর পূর্ববর্তী উপন্যাস সমূহে প্রকৃতি আছে, কিন্তু সে প্রকৃতি লোকালয়-ঘনিষ্ঠ—সাধারণ বাংলা দেশের গার্হস্থ্যজীবন থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়নি। 'আরণ্যক'-এ লোকালয় থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো হয়েছে। সেখানকার লোকালয়গুলি যেন বিশ্ব-প্রকৃতির দয়ায় তাদের সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু নিয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্য ও ঋতুনাট্যগুলিতে প্রকৃতির আর এক ঐশ্বর্যদীপ্ত মূর্তি ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির চূড়ান্ত ধাপে সঙ্গীত ও নৃত্য মাধ্যম। বিভূতিভূষণ কথাসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার তাঁর ছিল না। 'আরণ্যক' উপন্যাসের কল্পনা-প্রসার, উজ্জ্বল বর্ণনা, অর্থগূঢ় সাঙ্কেতিকতা, উপন্যাস ও কাব্যের এক দুর্নিরীক্ষ্য সন্ধিসীমায় উপনীত হয়েছে।

৫

বিভূতিভূষণ স্মৃতি-রোমন্থনের সুদক্ষ শিল্পী। গড়ের মাঠে বসে কলকাতার কোলাহলক্লান্ত অপরাহ্নে বিভূতিভূষণ ফেলে-আসা দিনের স্মৃতিসূত্র অনুসরণ করে এক রূপকথা-মুগ্ধ জগতের ছবি এঁকেছেন। তাই উপন্যাসটি এক হিসেবে স্মৃতিচিত্র।—এতে স্মৃতির রসও আছে এবং বর্ণের বর্ণনাও আছে। গল্প ও কথাচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনা ও কল্পনার মসৃণ-চিক্কণ সূক্ষ্ম বয়ন লেখকের মনোলোকের শিল্পিত রূপের পরিচয় দেয়। এই আবিষ্ট মনের ভাবনার বাতাবরণের মধ্যেই বিভূতিভূষণের মানসলোকের ছায়া-সঞ্চরণ। সুপ্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে আবিষ্ট-চিত্ত বিভূতিভূষণ ভাবেন: 'ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশীবটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।'—এই 'সময়ের উজানে' পার হয়ে যাওয়ার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা 'আরণ্যক' উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। স্মৃতির মালা গাঁথার শিল্পে বিভূতিভূষণ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। পৃথিবী, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ—ভূলোক-দ্যুলোকের পার্থিব-অপার্থিব সব কিছু মিলিয়ে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি-রস-প্রবাহ একটি সর্বন্ধর ভাবদৃষ্টির কেন্দ্রে যেন সংহত। একাদশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনার্যরাজ দেবারুপান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধি-প্রান্তে দাঁড়িয়ে লেখক এক প্রাচীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, মহাকালের যুগান্ত-প্রসারিত রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃতি দেখেছেন—'পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।'

বিভূতিভূষণের এই ভাবুকতার মধ্যে শুধু স্মৃতিরসই নয়, তার সঙ্গে এক ঐশী-চেতনার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অনুভবও অলক্ষ্যগোচর নয়। সরস্বতী-হ্রদয়ে জলজ পুষ্পে, দরিদ্র অন্ত্যজ পরিবারে, মহালিখারূপ পাহাড়ে, স্থল-জল-অন্তরীক্ষে সেই একই আনন্দরূপের প্রকাশ। এখানে বিভূতিভূষণ তাই সহজেই বলতে পারেন: 'আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজিমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্ত মেঘস্তূপের, কত দিগন্ত

হারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃসংশয়ে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন!"

এই প্রীতি-সমুজ্জ্বল ও ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের উপরেও পড়েছে। কুন্তার দুঃখক্লিষ্ট জীবনের প্রতি সহানুভূতি, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা মঞ্চীর গৃহত্যাগের পরিণাম চিন্তায় বেদনা-বোধ, বাঙালীঘরের অনূঢ়া কন্যা ধ্রুবার কাহিনীকে কল্পনায় ও বেদনায় নূতন স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করা রাজু পাঁড়ের পূর্বরাগের অন্তরালে একটি সহজ গ্রাম্য জীবনের রস আবিষ্কার করা প্রভৃতি এক একটি চিত্র-সংলগ্ন করুণ-সুন্দর ভাবনা বিভূতিভূষণের বিশেষ ধরণের জীবনদৃষ্টি থেকেই উদ্ভূত। প্রবাসী বাঙালী-কন্যা ধ্রুবার সমবেদনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র অনুসূয়া-প্রিয়ংবদার কথা মনে পড়েঃ 'শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।'

কিংবদন্তী অথবা লৌকিক প্রবাদ অবলম্বন করে অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনা করা বিভূতিভূষণের একটি স্বভাবসিদ্ধ অধিকার। 'বউ চণ্ডীর মাঠ', 'খুঁটি দেবতা,' 'অভিশপ্ত', 'হাসি' প্রভৃতি গল্পে ভৌতিক কিংবদন্তী সমূহের মধ্যে তিনি এক গূঢ় ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করে এক প্রেত-পিঙ্গল বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে কয়েকটি অতি-প্রাকৃত চিত্রণ আছে। সেগুলি প্রধানত স্থানীয় লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রামচন্দ্র আমীন, আসরফি টিণ্ডেল, বোমাইবুরু, বৃদ্ধ ইজারাদার ও তার তরুণ পুত্রটিকে নিয়ে যে নাতিদীর্ঘ কাহিনীচক্রটি রচিত হয়েছে তার অতি-প্রাকৃতরস একটি নিগূঢ় অর্থ-সংকেতে ভরে উঠেছে। জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি এখানে এক অশরীরী প্রতিহিংসার প্রতীকরূপিণী হয়ে উঠেছে। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে বিরাটাকৃতি

বন্য মহিষের দেবতাটির অতি-প্রাকৃত বর্ণনাও সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মোটকথা, 'আরণ্যক' উপন্যাসের অতি-প্রাকৃত বর্ণনায় এমন কিছু অসাধারণ পরিবেশ অথবা উপাদানের প্রয়োজন হয় নি—লেখক 'মিথ্'কে সহজেই শিল্প করে তুলেছেন।

'আরণ্যক' উপন্যাসে শিল্প ও যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ বিরূপতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের মানসিক গঠনই তার জন্য দায়ী। 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় 'অপরাজিত'র নিকৃষ্টতার এও একটা কারণ। নাগরিক জীবন অথবা সহরতলীর জীবনযাত্রা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নিতান্ত বর্ণবিরল। শরৎচন্দ্র পল্লীচিত্র এঁকেছেন, কিন্তু সে ছবির সঙ্গে বিভূতিভূষণের পল্লীচিত্রের পার্থক্য কম নয়, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লী ও পল্লীর মানুষের সমস্যা বাদ পড়ে নি, পল্লী-জীবনের শ্রীহীনতা, দীনতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততাও তার অঙ্গীভূত হয়েছে। বিভূতিভূষণের পল্লী রোমান্স-রসের কেন্দ্রভূমি—যেখানে 'কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' সেখানে লেখকের বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টি পল্লীপ্রকৃতির উপরেই নিবদ্ধ, পল্লীর মানুষ যেন একটু অন্তরালে। জীবনের বৈচিত্র্য এখানে একটু কম—সংঘাতহীন, নিস্তরঙ্গ কিন্তু মধুর! 'আরণ্যক'-এর প্রস্তাবনা অংশে লেখক যে বেদনার কথা নিবেদন করেছেন, সেই বেদনা গ্রন্থটির সর্বাংশে ছড়িয়ে আছে: 'কিন্তু আমার এ অনুভূতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতে বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা আমায় কখনও ক্ষমা করিবে না জানি।'—চতুর্দশ পরিচ্ছেদ তৃতীয় অধ্যায়ে অরণ্যজগৎ ও নূতন গড়ে-ওঠা লোকালয়ের পাশাপাশি দু'টি ছবির ভেতর দিয়েও লেখকের মনের প্রতিক্রিয়াটি সুন্দর ধরা পড়েছে: 'প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাড়া বইহার, অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে? কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনারের খেত, শোনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণি-মনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক। হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।'—মানুষ-বিবর্জিত বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিভূতিভূষণের কাছে শ্রেষ্ঠ প্রশস্তি লাভ করেছে। কেউ কেউ

জীবনানন্দের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা করেছেন। তুলনাটি বহিরাশ্রয়ী। —জীবনানন্দের প্রকৃতিদৃষ্টি অসাধারণ, কবি ও ঔপন্যাসিক দু'জনই নক্ষত্র-লোকের সন্ধানী, ইন্দ্রিয় সচেতনতাও উভয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। কিন্তু জীবনানন্দ বিভূতিভূষণের মতো সহজ নন। জীবনানন্দের কবিতায় অনুভব ছাড়া বুদ্ধিও আছে। বিভূতিভূষণের সবটাই যেন বিশুদ্ধ অনুভব।

৬

কবি-সমালোচক মোহিতলাল বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি একজন ঔপন্যাসিক নহেন, শক্তিমান সাহিত্যশিল্পী মাত্র।"—মোহিতলালের মন্তব্যটি অত্যন্ত মননশীল। এই একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যপ্রকৃতির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'আরণ্যক' থেকেই বিভূতিভূষণের ঔপন্যাসিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কবৈচিত্র্য নির্ণয় ও একটি বিশিষ্ট জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন উপন্যাসে চাই। ভালো মন্দ সমস্ত কিছু নিয়ে জীবনের একটি সমগ্র রূপকে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রখর জিজ্ঞাসার আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলবেন! ঔপন্যাসিক জীবনের রূপকারই নন, ভাষ্যকারও। কিন্তু এই জীবন আত্মসর্বস্ব, ভাবময় ও আত্মভাবমুগ্ধ পিপাসাই নয়—এ এক বিস্তৃত বস্তুনিষ্ঠ জীবনরস—যাতে বহু সুর, বহু কণ্ঠ, বহু পদধ্বনি। আধুনিক সমালোচক তাই উপন্যাসকে প্রাচীন মহাকাব্যের বংশধর বলেছেন।

বিভূতিভূষণের মানসজীবনের সঙ্গে খাঁটি ঔপন্যাসিকের জীবনতন্ত্রের একটি পার্থক্যও আছে। বিভূতিভুষণ আত্মময় ভাবনার সাধক, তাঁর হাতে কবি-বাউলের একতারা—তাঁর মন্ত্র আত্মরসের, বিষয়বস্তু তিনি স্বয়ং। তাই তিনি এই বিশেষ রসের সাধনায়ই সিদ্ধ। সেখানে বাইরের বস্তু হৃদয়ের রসে বিগলিত হয়ে হৃদয়েরই একটি অংশে পরিণত হয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের 'লিরিক' আস্বাদনটি শুধু তাঁর কবিধর্মেরই স্বরূপ নয়, তিনি যে জীবনকে অবলম্বন করেছেন তাও বিশুদ্ধ 'লিরিক'—'লিরিক'-এর মতোই আত্মময়, ঐকতানমণ্ডিত সুরৈক্যের সাধক তিনি। কিন্তু ঐ সাধনার আন্তরিকতা ও

বিভোরতা যতই থাকুক না কেন, প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের জীবন-বৈচিত্র্য তাতে নেই। মোহিতলালের ভাষায় ঔপন্যাসিকের সাধনা 'কেবল সুন্দরের কথাই নয়, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব-ঘটিত এক অপূর্ব রহস্যরসের কথা।' —বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্বোত্থিত জীবনের কোন ছবি নেই। স্বর-বৈচিত্র্যের অভাব এখানে আছে। 'আরণ্যক'-এর বিভূতিভূষণ যে রসের সাধনা করেছেন, তা বিশুদ্ধ, খানিকটা অতিমর্ত্য। জীবনে যে ঊর্ধ্বায়ন আছে, তারই জটিলতাহীন চূড়ান্ত বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি সংহত—সেখানে জীবনের দ্বন্দ্ব নেই, বিক্ষোভ নেই, মোহের আধিক্য নেই, আবার মোহভঙ্গ-জনিত অবসাদও নেই,—একটি বিশেষ ভাব বা আইডিয়া সেখানে বড় হয়ে উঠেছে যা প্রধানত 'লিরিক' কবির প্রতিভার অনুকূল। তাঁর একতন্ত্রী আইডিয়া জীবনরহস্যের নূতন নূতন রংমহলের দ্বারোদ্ঘাটন করে নি।

আসল কথা, খাঁটি ঔপন্যাসিকধর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে বিভূতিভূষণের সাহিত্য-জীবন বিচার করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। উপন্যাস-রচয়িতা এবং খাঁটি ঔপন্যাসিক, ঠিক এক কথা নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্য-সাধনার মূল্য তার জন্য বিন্দুমাত্রও কম নয়। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একালে তার মতো অপরূপ গদ্যরীতি ও ভাষাশিল্পে অধিকার কার? 'আরণ্যক'-এ বিভূতিভূষণের গদ্য-স্টাইলের একটি পরিণত রূপ চোখে পড়ে। শব্দ-সম্পদ ও সহজ অলঙ্করণ বাদ দিলেও এই ভাষার একটি সাবলীলতা ও নিজস্ব গতিচ্ছন্দ আছে—এ ভাষা ভাবুকতার, ভালো লাগার। ভাষার বাঁধুনি ও গতিচ্ছন্দ শিল্পীর বিশেষ মানসিকতার স্বরূপ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে তৎসম শব্দ ও সমাস-বিন্যাস, কোনটিই এই ভাষার স্থিতি-স্থাপকতা নষ্ট করতে পারে নি। বাংলা কথাসাহিত্যে ক্রমাগত যেন ভাষা ও স্টাইলের কর্ষণা কমে আসছে—কিন্তু গল্প বলার ভঙ্গি ও ভাষাকে পৃথক করা সম্ভব নয়: বিভূতিভূষণের চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেই আছেন, কিন্তু তাঁর মতো শিল্পী তাঁদের কেউই সম্ভবত নন।

'আরণ্যক'-এর ভূমিকায় লেখক ডায়েরী ও ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা বলেছেন। বিভূতিভূষণের উপন্যাস ডায়েরীর আস্বাদনবাহী। ডায়েরীর স্থির চিত্রগুলি

যেন উপন্যাসের রীতিতে বিন্যস্ত। বিভূতিভূষণ ডায়েরী রচনায় কৃতকর্মা—ডায়েরী-রচয়িতা বিভূতিভূষণের স্বাভাবিক প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ডায়েরীর আত্মগত ভাবনা, খণ্ডচিত্র তাঁর উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ। এতে বিভূতিভূষণের অগৌরবের কিছু নেই, বরং তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয়েছে। তিনি যে পথের পথিক সে পথ জনহীন, শুধু একজন পূর্বসূরীর উজ্জ্বল পদচিহ্ন সেই পথে—সে পূর্বসূরী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই কারণেই বাংলাসাহিত্যে 'আরণ্যক'-স্রষ্টা অতুতীয়।

———

তারাশঙ্কর : মন ও শিল্প

সাহিত্যক্ষেত্রে তারাশঙ্করের আবির্ভাবলগ্ন কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই অসাধারণ শক্তির বলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়, পরের বছর বৈশাখ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় 'হারানো সুর'। তারাশঙ্কর ১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের গণনা শুরু করেছেন। ঐ সময় থেকে শুরু করে 'ধাত্রীদেবতা' প্রকাশের পূর্ববর্তী প্রায় দশ বছর কালকে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। কিন্তু এই প্রস্তুতিপর্বের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁকে সন্ধান করতে হয় নি, সহজেই তিনি স্বক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁকে গল্প খুঁজে বেড়াতে হয় নি, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তাঁর হাতে শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। তাঁর দেখার মধ্যে যেমন কোনো ফাঁক ছিল না, অনুভবের মধ্যেও ছিল না তেমনি কোনো ফাঁকি। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠকসাধারণের মর্মস্থান অধিকার করে নিলেন।

তারাশঙ্কর যেকালে বাংলাসাহিত্যে পদক্ষেপ করেন, তখন শরৎচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত শীর্ষে অধিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির আশীর্বাদ তখনো অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু গল্প ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পুরনো পথ ছেড়ে দিয়ে নূতন পথ ধরেছেন। তিরিশের যুগে যুদ্ধোত্তর পর্বের নূতন সাহিত্যের অগ্নিময় প্রতিশ্রুতি দেখা দিল 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'। বাংলাসাহিত্যের পটপরিবর্তন শুরু হলো। সাহিত্য তার অভিজাত রাজপথ থেকে অখ্যাত ও অনাবিষ্কৃত গলিপথে যাত্রা শুরু করলো। জীবনের যে অংশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তার উপরে পড়লো কৌতূহলী তরুণ লেখকদের দৃষ্টিপ্রদীপ। তথাকথিত সমাজ-বিগর্হিত বস্তু বলিষ্ঠ শিল্পপ্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর তরুণলেখকেরা জীবন-রহস্যকে আবিষ্কার করতে ব্রতী হলেন।

বাংলাসাহিত্যে যখন পট পরিবর্তনের অধ্যায় শুরু হয়েছে, তখন সমাজসেবা ও রাজনীতির মধ্যে তারাশঙ্কর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন; সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছিলেন—কিন্তু তা নাটকের মাধ্যমে। আর্ট থিয়েটারের নাট্যাধ্যক্ষ তা না পড়েই ফেরত দিলেন। তারাশঙ্কর আবার কংগ্রেস-সংক্রান্ত কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্থানীয় 'পূর্ণিমা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যসাধনার সাধ মেটাতে লাগলেন। কিন্তু অতৃপ্তি থেকেই গেল। পথ পেলেন অদ্ভুত ভাবে। তারাশঙ্করের নিজের ভাষাতেই বলা যাক :

'ঠিক এই সময়ে একদিন—সিউড়ীতেই হবে, এক উকিলের বাড়িতে উঠেছি কংগ্রেসেরই কাজে। রাত্রে ঘুম আসে না। হয় গরম নয় শীত, ছুটোর একটা হেতু বটে।...জেগে বসে বিড়ি খাই আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাই। এমন অবস্থায়, হঠাৎ হাত্‌ড়ে মিলল একখানা মলাটছেঁড়া 'কালিকলম' পত্রিকা।

আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।

'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।

ওল্‌টালাম পাতা। এবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!'[১]

তারাশঙ্করের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি এক প্রশস্ত শিল্প-প্রাঙ্গণে মুক্তির প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মফঃস্বল-শহরের একটি বিশেষত্ব-বর্জিত বিনিদ্র রাত্রি এই ভাবীকালের শক্তিধর শিল্পীর সম্মুখে এক অলিখিত কাহিনীর পাণ্ডুলিপি প্রসারিত করলো। এক সদ্যজাগ্রত জীবনবোধের সঙ্গে কমলিনী বৈষ্ণবীর বাস্তব ছবি অবিরোধে মিশে গেল—'রসকলি' গল্পের

১ আমার সাহিত্য জীবন, পৃ: ১৯-২০

পটভূমি রচিত হলো। নাট্য-যশোলিপ্সু তারাশঙ্কর ব্যর্থমনোরথ হয়ে 'মারাঠা-তর্পণ' নাটকের পাণ্ডুলিপি আগুনে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় পাবকশিখাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। তারাশঙ্করের সাহিত্যিক জীবনে এ ঘটনাটির একটি তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত আছে। তিনি ভুল করেছিলেন—তাঁর অলিখিত কাহিনী তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সংঘাতময় ভারত-ইতিহাসের মধ্যে নিহিত ছিল না, গ্র্যাণ্ড ডাফের তিন ভল্যুম মারাঠা ইতিহাসের তথ্য-পঞ্জীতেও চিহ্নিত ছিল না, ঐতিহাসিক রোমান্সের ভাস্কর্যচিত্রিত মর্মর-প্রাসাদের মধ্যেও তা নিবদ্ধ ছিল না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে কিসের সংকেত নিহিত ছিল? অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষ সেদিন কিসের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল? 'পোনাঘাট পেরিয়ে' তীক্ষ্ণতায় ও তিক্ততায় এক নূতন পৃথিবীর আস্বাদন এনেছিল। বলাইয়ের নিষ্ঠুর আক্রোশ নির্মমতম পরিহাসে পরিণত হয়েছে। শৈলজানন্দের গল্পে বীরভূমকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক সাহিত্যসৃষ্টির বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছে। এই দুটি মন্ত্র তারাশঙ্করের সুপ্ত অন্তরেন্দ্রিয়কে জাগিয়ে দিল। তিনি প্রত্যহের ধুলির মধ্যেই খুঁজে পেলেন ঐশ্বর্য, উত্তর-রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর মাটির মধ্যে আবিষ্কার করলেন এক অনাবিষ্কৃত মহাকাব্যের শিলালিপি। আর দেখলেন সুখ-দুঃখে বিচিত্রিত মানবজীবন—আদিম অন্ধ জৈববৃত্তির নাগপাশ যাদের বন্ধন, অথচ সেই বন্ধনকে ছিন্ন করাই যাদের জরা-মৃত্যুজয়ী অমৃতপিপাসার অভয় মন্ত্র! পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর লিখেছেন:[২]

'জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে! সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।'

এই হলো তারাশঙ্করের উপলব্ধি! মাটি ও মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ মানুষ—

২ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২০

প্রকৃতির আদিমতা ও মানবপ্রকৃতির অন্ধ আদিমতা এখানে যেন একই মহাশিল্পীর রচনা। সেই অরুগ্ন অমার্জিত অথচ সহজ জীবন-উৎসের অতল গভীরে কত নিষ্ঠুর সত্য, নির্মম 'নেমেসিস্'এর কত নিগূঢ় নির্দেশ। আর্টিস্টের অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন তারাশঙ্কর— মানুষের আদিম অপরাধ-প্রবণতা, জান্তব বুভুক্ষা, দেহ-মনের কুৎসিৎ ব্যাধি, পতনোন্মুখ জমিদারের বিলুপ্তবৈভব শেষরশ্মি, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ, আর তার পাশাপাশি আদিম মানুষ বেদে-বাউরী-সাঁওতাল- রাজবংশীর দল। নাগরিক সভ্যতার বিদ্যুৎরেখা যে জীবনকে কৃত্রিম প্রসাধনে বিচিত্র করে তোলে নি, আধুনিক শিক্ষা ও রুচি মোলায়েম ভদ্রতায় ও মাপা কথায় যেখানকার প্রাণরস শোষণ করে নি-- বাংলার সেই আদিম সংস্কৃতি সমাজ-জীবনের নিম্নতম স্তরে জনজীবনের সঙ্গে কত নিগূঢ়ভাবে জড়িত! বৈষ্ণবীর ছায়ানিবিড় আখড়ায় এখনো পদাবলীর সুরমাধুর্য শোনা যায়, গ্রাম্য কবিয়ালের অমার্জিত রুচি সহজ সৌন্দর্যের সন্ধান পায়, কাহার-সমাজের বিচিত্র কাহিনী মহাকাব্যের বিশালতা নিয়ে প্রাচীন বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে থাকে, নাগিনী কন্যাদের নিষ্ফল বেদনা নিষ্ঠুর পাষাণশিলায় বারবার মাথা কোটে!

বাংলাসাহিত্যে এ কাহিনী নূতন, কাহিনী-বর্ণনার ধরণটি আরো নূতন। রবীন্দ্রকাব্যের প্রারম্ভিক লগ্নে 'অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা' আস্বাদনের পিপাসা জেগেছিল, জোগছিল 'আরব বেদুইন' হওয়ার রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা দুএকটি 'লিরিক'-এর ইন্দ্রধনু—কবিমানসের স্বর্ণমেঘস্তরে কদাচিৎ তার সন্ধান মেলে। 'গল্পগুচ্ছ'র গল্পমালায় ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবনযাত্রা ও পল্লীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার রসোজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম সার্থকভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে। এই জীবনযাত্রা তথা আঞ্চলিক সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন শৈলজানন্দ। কিন্তু শৈলজানন্দ পথ দেখালেন মাত্র— দু একটি খণ্ডচিত্র নিপুণরেখায় অঙ্কিত হলো, কিন্তু সে ছবিতে খণ্ডতার অতৃপ্তি রয়ে গেল। একটি বিশেষ পর্যায়ের মধ্যেই 'কয়লা কুঠি'র লেখক আবদ্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু তাঁর গল্প একটি মহত্তর প্রতিভাকে প্রদীপ্ত করে তুললো। শৈলজানন্দ যার আভাস মাত্র দিলেন, তারাশঙ্কর

তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায় ও জীবনরহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিলেন। প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারও প্রতিধ্বনি নন— প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।

২

'কল্লোল' পত্রিকাই তারাশঙ্করকে আবিষ্কার করেছিল, এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ঘটেছিল তাঁর সম্ভাবনাদীপ্ত বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ। তখনকার কালে 'প্রবাসী' ছিল সবচেয়ে অভিজাত পত্রিকা— আত্মপ্রকাশ-অভিলাষী তরুণ লেখকদের প্রশ্রয় ছিল না সেখানে। তা ছাড়া 'প্রবাসী'র কৌলীন্যের দুর্গদ্বার তরুণদের জন্য ছিল অবরুদ্ধ। 'কল্লোল'-এর সুর বন্ধনমুক্তির, সংস্কারের নাগপাশ বন্ধনমুক্ত করাই ছিল তার দুঃসাধ্য ব্রত। প্রচলিত সাহিত্যের জীর্ণ সংস্কারকে এই পত্রিকার সাহিত্যিক-ব্রতচারীরা আঘাত হানতেই চেয়েছিলেন। তাই তাঁরা চাইলেন সংস্কারমুক্ত নূতন দৃষ্টি, বিষয়বস্তুর নূতনত্ব, জীবনের সবকিছুকে স্পষ্ট করে বলার স্পর্ধিত দুঃসাহস। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এ পর্যন্ত যাদের স্থান হয় নি, সেই নোঙ্‌রা বস্তিবাসী ও অসংস্কৃত নরনারীর আদিম জীবনযাত্রা এখানে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলো। নর-নারীর প্রেমসম্পর্ক দীর্ঘকালব্যাপী যে নীতি ও আদর্শবাদের রঙীন কুয়াসায় মণ্ডিত হয়েছিল, তাকে ভেদ করে অতির্যক রেখায় বর্ষিত হলো বুদ্ধিদীপ্ত মনের রঞ্জনরশ্মি। অকুণ্ঠ সত্যভাষণ ও সংস্কাররাহিত্য বিচিত্র করে তুললো নরনারীর যৌনজীবন। 'কল্লোল' দুঃসাহসী তারুণ্যের যৌবনদ্রোহ—প্রচলিত জীবনের বাঁধভাঙা যৌবন-কল্লোল!

তারাশঙ্করের নূতন সুর তাই 'কল্লোল'-এর কলধ্বনিতে স্বীকৃত হলো। কিন্তু 'কল্লোল'-এর লেখক হলেও 'কল্লোল'গোষ্ঠীর তিনি অন্তরঙ্গ হতে পারলেন না। এইখানেই তাঁর শিল্পীব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য। 'কল্লোল'গোষ্ঠীর লেখকেরা ছিলেন নাগরিকমানস। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যুদ্ধোত্তর বাংলার জীবনচর্যা তখনকার কালের শিক্ষিত তরুণমনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাই 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় বিদ্রোহবাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। জীবনের সবগুলি

পথই যখন রুদ্ধ, কোনো দিকেই যখন নিষ্ক্রমণের পথ নেই, তখন এই ব্যর্থতা-বোধ ও নৈরাশ্য চিত্তবিক্ষোভে পরিণত হলো। তাই বাংলাসাহিত্যের এই ক্ষণদীপ্ত ও স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়টির মধ্যে যতখানি আঘাতপ্রবণতা ছিল, ততখানি নূতন মূল্য সন্ধানের প্রচেষ্টা ছিল না। 'কল্লোল' পুরাতনের দুর্গদ্বারে আঘাত করেছে, তার জীর্ণ কবাটে ফাটল ধরিয়েছে সত্য, কিন্তু নূতন মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রথম থেকেই 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের এই দুটি সূত্রের প্রধান পার্থক্য ছিল। তিনি যথার্থই পল্লীপ্রাণ। 'কল্লোল' পত্রিকাতে যে পল্লীকেন্দ্রিক গল্প লেখা হয় নি এমন নয়। কিন্তু তারাশঙ্করের গ্রামীণ চেতনার সঙ্গে এর পার্থক্য নেহাৎ কম নয়। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের অনেকেই তাঁদের নাগরিক চেতনা দিয়ে পল্লীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ পল্লীর খণ্ডচিত্রকে ও বাইরের দু' একটি স্পন্দনকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পল্লীর এমন সমগ্র রূপ আর কারো রচনায় চোখে পড়ে নি। দ্বিতীয়ত, তারাশঙ্করের জীবনবোধ ছিল প্রসারিত, তাই তিনি মহাকালের প্রলয়লীলাকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন নি, সবার উপরে তাঁর দক্ষিণপাণির আশীর্বাদও স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই তিক্ততা ও গ্লানি তাঁর সাহিত্যের গতিপথ নির্ণয় করে নি, নাগরিক জীবনের বিকৃতি ও কুটিল সংশয় তাঁর চরিত্রগুলিকে স্পর্শ করতে পারে নি। ব্যাধিকে তিনি নিপুণ ও অভ্রান্তভাবেই দেখিয়েছেন—তবু তাঁর রচনাতে ব্যাধির যে নিদান আছে, তাও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। বিষামৃতময় জীবনের মূলে প্রবেশ করেছেন তারাশঙ্কর—তাই এ কালের মূল্যবোধহীন গ্লানিজর্জর ক্ষয়িষ্ণুতা তাঁর মানসলোক স্পর্শ করতে পারে নি।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহবাণীকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের প্রভাব। হুইট্‌ম্যানের কবিতা, লরেন্স-হাক্স্‌লির কথাসাহিত্য, হ্যাম্‌সুন-গোর্কি প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা এই গোষ্ঠীর লেখকদের উদ্বোধিত করেছিল। এখানেও 'কল্লোল'-এর সুরের সঙ্গে তারাশঙ্করের সুর মেলে নি। তারাশঙ্কর কোনোদিনই ওই পথে পা বাড়ান নি। তাতে তাঁর মহত্ত্ব কমে

নি, বরং বেড়েছেই। পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়ানোর জন্য পশ্চিমী সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়াকে কোনো কোনো লেখক তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির উপায় হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশী মরশুমী ফুল ভালো ভাবে ফুটতে পারে নি। সৌভাগ্যের বিষয়, তারাশঙ্কর সুলভ সিদ্ধির এই পথ বর্জন করেছেন—স্বেচ্ছায় নয়, তাঁর শিল্প-নিয়তির অমোঘ নির্দেশেই।

মাটিই তাঁকে এই পথ দেখিয়েছে, মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে, সেই সব মানুষ তাকে জীবনপথের নিশানা দিয়েছে। হুইট্‌ম্যান-লরেন্স-গোর্কির দ্বারস্থ তাঁকে হতে হয় নি। যে অঞ্চল তাঁর ধাত্রী, তাকে তিনি রূপ দিয়েছেন নানা ভাষায়। শুধু তার বর্তমান জীবনধারাই নয়, তার জনশ্রুতি-কিংবদন্তী-ঘেরা অস্পষ্ট অতীত ও ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলিও সূত্রান্বিত হয়ে মহাকাব্যোচিত সমগ্রতা লাভ করেছে। তারাশঙ্কর এমন একটি মনের অধিকারী যেখানে তথাকথিত 'ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়াল্'দের স্বরচিত বৃত্ত-পরিক্রমা ও মনোবিকার অনুপস্থিত। সদ্যশানিত ইস্পাতফলকের অসহ্য ধাতবদীপ্তি এখানে চকিত করে না, কিন্তু শাল-মহুয়ার উন্মত্ত অরণ্যপ্রকৃতি, বৃষ্টিহীন দগ্ধ মৃত্তিকার জ্বালাময় অভিশাপ, বর্ষাস্ফীত কোপাইয়ের মত্ত জীবনরস —এখানে আদিম জীবনের ভীষণ রমণীয়তায় বিস্ময়বিমূঢ় করে।

জীবনের মর্মমূলে যে একটি আদিম প্রাণরস আছে, তাকে সযত্নে আবৃত করে, স্বভাবকে অনেকখানি বিকৃত করে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে; সভ্য মানুষ আজ আর প্রকৃতির মতো সহজ হতে পারে না। কিন্তু আলোক-বঞ্চিত নখদন্তসমন্বিত মানব-প্রকৃতির মধ্যে জীবনের সেই রস আজও অবিকৃত। ইক্ষুদণ্ড থেকে পেষণযন্ত্রের সাহায্যে রস নিষ্কাষিত করা হয়,—নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ডে সেই রস প্রত্যাশা করা যায় না। তারাশঙ্কর যাদের কথা বলেছেন, তাদের জীবন সভ্যতার পেষণযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয় নি। বাংলাসাহিত্যের পক্ষেও এ ভূমি কুমারী-মৃত্তিকা। তাই তারাশঙ্করকে জটিল জীবনের জটিলতর ভাষ্য রচনা করতে হয় নি, বহু ফাটলে বিদীর্ণ জীবনের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি আহরণ করতে হয় নি। আধুনিক সভ্যতার প্রথম পদপাতের মুহূর্তেই শেষবারের মতো তিনি গোটা মানুষের পূর্ণপ্রতিকৃতি এঁকেছেন।

স্নেহ-প্রেম-ঈর্ষা-হিংস্রতা-বর্বরতা—মানুষের যে কোনো প্রবৃত্তিই এখানে উঁচুস্বরে বাঁধা—সে স্বর আদিম উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকল্প জৈবজীবনের। তাই প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যকেও ছাপিয়ে জীবনের সেই আদি ও অকৃত্রিম স্বরই প্রবল হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে ও গল্পে যে সংঘাতের চিত্রগুলি তা যেমন রক্তক্ষয়ী, তেমনি মর্মান্তিক। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সঙ্কেতে তিনি এই বিরোধগুলিকে আভাসিত করেন না; কারণ এ সংঘাত একই আদিমশক্তির দুই বিরুদ্ধ রূপের মধ্যে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মধ্যে পরম-বনোয়ারী ও করালী-বনোয়ারীর সংঘর্ষ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য-শক্তিকে প্রকাশ করেছে।

গ্রাম-বাংলার মধ্যযুগের বিলীয়মান রশ্মিকণা তারাশঙ্কর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রেখায় এঁকেছেন—প্রাচীন মাটির গন্ধে, প্রাচীন পৃথিবীর জীবনরসে যেমন কাহিনীগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি নূতনকালও জন্ম নিয়েছে সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকেই। ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেও তারাশঙ্কর এগিয়ে চলেছেন—কারণ তিনি মানুষের অপরাজেয় অভিযানে বিশ্বাসী। এই দুইকালের দ্বন্দ্ব জীবন-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে:

'.. আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চিরকল্যাণের একটি ধারা আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এ কালে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ করেই, একদা আমাকে দেখা দেবেন। সেদিন আমার মাল্য রচনা সার্থক হবে।'[৩]

৩

তারাশঙ্করের উপন্যাসে ও ছোটগল্পে 'আঞ্চলিকতা'র প্রসঙ্গটি একটি বহু আলোচিত বিষয়। সম্ভবত, তারাশঙ্করের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টি তেমনভাবে দেখা দেয় নি। বৃহত্তর অর্থে কথাসাহিত্য কম-বেশী আঞ্চলিক।

৩ আমার কালের কথা, পৃঃ ২২২

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে 'আঞ্চলিক' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থেই প্রয়োগ করা উচিত, তা না হলে শব্দটির কোনো বিশিষ্ট অর্থ-দ্যোতনাই থাকে না। যে সাহিত্যে একটি বিশেষ অঞ্চলের ছাপ থাকে, তাকেই *আঞ্চলিক সাহিত্য* বলা যায় না। কারণ সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যদি শুধু সাধারণ পটভূমি হিসেবেই ভৌগোলিক পরিবেশ সন্নিবেশিত হয়, তাহলেও তাকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যায় না।

আঞ্চলিক সাহিত্যে বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে যে একজাতীয় 'লোকাল্ কালার'-এর সৃষ্টি হয়, তাকে গভীর রেখায় অঙ্কিত করা উচিত। কিন্তু ঐ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অঞ্চল-বিশেষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য শুধু পটভূমির পর্যায়েই যদি থাকে, তাহলেও যথার্থ আঞ্চলিক সাহিত্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে বাধা ঘটে। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ, তার জল-হাওয়া ও বহিঃপ্রকৃতি ঐ অঞ্চলের নরনারীর জীবনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করবে, যার ফলে তাদের জীবনের মর্মবাণী উক্ত আঞ্চলিক প্রকৃতির চরিত্রধর্মেরই অনুরূপ হয়ে উঠবে। আঞ্চলিক পরিবেশ ও নরনারীর চরিত্র এখানে যেন একই অদৃশ্য শিল্পীর রচনা। আঞ্চলিক উপন্যাসে বিশেষ ভূখণ্ডের প্রাণরসে চরিত্র-গুলি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। চরিত্রগুলির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

একালে পটভূমিকার বৈচিত্র্যবৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো লেখক নূতন জগতের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু বিশেষ ভৌগোলিক পরিধিকে পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহার করলেও, তা যথার্থ আঞ্চলিক সাহিত্য হয় না, লেখকের ব্যক্তিজীবন ও মননের সঙ্গে অঞ্চল-বিশেষের নিগূঢ় যোগাযোগ ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর আঞ্চলিক সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অনেকক্ষেত্রে অঞ্চল-বিশেষের পটভূমি আছে, কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তাঁর নরনারী-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করে নি। এই জন্য শরৎ-সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'র অনেকগুলি গল্পেও পদ্মা-লালিত গ্রাম-বাংলার পটভূমি আছে, কিন্তু সেই আঞ্চলিক জীবনের বিশেষ তাৎপর্য সেখানে পরিস্ফূট হয় নি।

তারাশঙ্করের সাহিত্যকে শুধু ব্যাপক অর্থেই নয়, বিশেষ অর্থেও আঞ্চলিক বলা যায়। যে অঞ্চলকে তিনি রূপ দিয়েছেন তা শুধু তাঁর ধাত্রী ও পালয়িত্রীই নয়, এই উত্তর-রাঢ়ের মৃত্তিকা ও জনপদজীবন তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গেও নিগূঢ়ভাবে যুক্ত। নূতন পটভূমি-অন্বেষণকারী ঔপন্যাসিক বা 'ট্যুরিস্টে'র দেখার সঙ্গে এ দেখার পার্থক্য অনেক। তারাশঙ্করের আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আঞ্চলিকতার আংশিক লক্ষণ থাকলেও সমগ্রভাবে আঞ্চলিকতার গূঢ় রূপ ফুটে ওঠে নি। পটভূমিকার অতিবিস্তৃতি ও বিক্ষিপ্ততাও আঞ্চলিক রসটিকে দানা বেঁধে উঠতে দেয় না। সেখানে বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, এমন কি লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসগুলি পর্যন্ত চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া চাই। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য উত্তর-রাঢ়ের মহাকাব্য। এই ভূগোল-ভূমিকে বাদ দিয়ে তাঁর মানসলোককে যেমন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি এই ভূখণ্ডের মন্ত্রপূত গণ্ডী ছাড়া তিনি যেন সহজও হতে পারেন না। বীরভূমের প্রাচীন ও রহস্যময় ভূখণ্ড, লোকজীবনের সর্বস্তর তাঁর লেখনী থেকে বিচিত্ররূপে উৎসারিত হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'র প্রারম্ভেই আছে :

'বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজ-রাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনকুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম; বড়গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণবাহুর মত উর্ধ্বলোকে প্রসারিত। বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই—এই দুই নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।'

এইটুকু হলো তারাশঙ্করের ভূগোল-ভূমির অতি সংক্ষিপ্ত প্রান্তরেখা। কিন্তু ঐ ভূগোলবৃত্তের মর্মমূলের কাহিনী অজস্র বৈচিত্র্যে লীলায়িত। রৌদ্রদুঃসহ রাঢ়ভূমির লাল মাটি, মহামারী ও অনাবৃষ্টির প্রলয়ঙ্কর পরিবেশ, বেনাঘাস ও কাশের জঙ্গলে আচ্ছন্ন রক্তপিপাসু রহস্যময়ী কালিন্দীর চর, হাঁসুলী বাঁকের মহাকাব্যধর্মী বিশাল পশ্চাৎপটের রোমাঞ্চকর ও অলঙ্ঘনীয় প্রভাব, ধূমধূসরিত

তৃণচিহ্নহীন 'ছাতিফাটার মাঠ', 'আখড়াইয়ের দীঘি'র অন্ধকার গর্ভদেশের হিংস্র হাসি, ময়ূরাক্ষীর গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ 'হড়পা' বান প্রভৃতি চিত্রগুলির সঙ্গে জনশ্রুতি-কিংবদন্তীর রোমান্স-রস মিশে থাকে। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে এই জগতের সংযোগ নেই—তাই এই জগৎ যেমন আদিম, তেমনি রহস্যচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। এই অঞ্চলের পূজা-পার্বণ, অন্ধ সংস্কার, অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস প্রভৃতি তারাশঙ্করের নখদর্পণে। এ দিক থেকে হার্ডি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তারাশঙ্কর সম্পর্কে তা অনায়াসে বলা যায়ঃ 'Acutely, painfully conscious of the modern world as he was, he looked back to the past and summed up in his fiction a life that was dying when he was a child, a life cut off from the main stream of national life, more primitive, more pagan'.[৪]

তারাশঙ্করের উপন্যাসের আঞ্চলিক রস ছাড়া প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। প্রকৃতির রুক্ষ ধূসর ভৈরবীমূর্তি তারাশঙ্করের রচনায় অপরূপত্ব লাভ করেছে। অবশ্য বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যই এই। কিন্তু শুধু আঞ্চলিক প্রকৃতির সুদক্ষ চিত্রকর হিসেবে তারাশঙ্করকে বিচার করলে তাঁর উপর অবিচারই করা হবে। বীরভূমের বহিঃপ্রকৃতির এমন নিপুণ ছবি আর কারো রচনায় এমন ভাবে ফোটে নি, এ কথা আজ অবিসংবাদীরূপে সত্য। কিন্তু প্রকৃতি কি এখানে শুধুই বহিঃপ্রকৃতি? তারাশঙ্করের শিল্পীসত্তার সঙ্গে বীরভূমের প্রকৃতির একটি অন্তরঙ্গ যোগ আছে। এইজন্যে তিনি প্রকৃতির গহন অন্তস্তলে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছেন সহজেই। তাঁর শিল্পীসত্তার মধ্যে আদিম প্রাণধারার প্রতি কৌতূহলী যে একটি সহজ বলিষ্ঠ প্রত্যয় ছিল, তা এই প্রকৃতিরই দোসর।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্পর্ক অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। কিন্তু আদিম অসংস্কৃত প্রকৃতির বন্য ভয়াল মূর্তি রবীন্দ্রসাহিত্যে কদাচিদ্ই রূপ পেয়েছে। সৃষ্টিরহস্যভেদকারী কবিকল্পনার প্রসার ও তার ভাবসমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনাকে এক

8 The English Novel, Walter Allen, Page 233

ঊর্ধ্বতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার একটি স্বগোত্রীয়তা আছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি ও মহাজাগতিক স্বপ্ন এক জ্যোতির্ময়-লোকের আশ্বাস দেয়। তারাশঙ্করের প্রকৃতির রূপ ও স্বরূপ দুই-ই স্বতন্ত্র। প্রকৃতি এখানে যেমন আদিম, তেমনি রৌদ্ররসরঞ্জিত। 'ধাত্রীদেবতা'য় অনাবৃষ্টি, মহামারীর মর্মান্তিক আঘাতে কৃষিনির্ভর গ্রামজীবনের বিপর্যয়ের চিত্রটি তথ্য ও হৃদয়াবেগের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রৌদ্রদগ্ধ তৃষাতুর লালমাটি, মৃত্যুছায়াবিবর্ণ আতঙ্কপাণ্ডুর পরিবেশ, রক্ষাকালী পূজার অতিপ্রাকৃত রোমাঞ্চ প্রকৃতির এক ভয়াবহ রূপ প্রকাশ করেছে। শিবনাথের ভাবদৃষ্টিতে আনন্দমঠের 'অন্ধকার সমাচ্ছন্ন', 'কালিমাময়ী', 'হৃতসর্বস্বা', 'নগ্নিকা' মাতার সঙ্গে প্রকৃতির এই মূর্তির কোনো বিরোধ নেই।

'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর চর একটি প্রধান অংশ অধিকার করেছে। 'সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর' কালিন্দীর চরের সঙ্গে বহুকালের জনশ্রুতি, কিংবদন্তী জড়িত। স্থানীয় চাষী, সাঁওতাল থেকে জমিদারগৃহিণী সুনীতি পর্যন্ত সকলেরই মনে এই সর্বনাশা চর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই চর যেন ক্রূর দৈবশক্তির মতো সমস্ত উপন্যাসে এক হিংস্র ইঙ্গিত ছড়িয়ে দিয়েছে। সাঁওতাল-জাতির আদিম জীবনযাত্রার পটভূমি হিসেবে, উপন্যাসের বিপর্যয় ও রক্তপাতের একটি নিগূঢ় সঙ্কেত হিসেবে এই চরটিকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

তারাশঙ্করের প্রথম যুগের উপন্যাস 'আগুন'-এ প্রকৃতিচিত্রণের একটি সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে। চন্দ্রনাথের দৃপ্ত পৌরুষ, মীরার উন্মাদনা, হীরুর উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালী জীবনযাত্রা ও যাযাবরীর সহজ প্রগল্‌ভতা উপন্যাসটির মধ্যে যে বিচিত্ররস সৃষ্টি করেছে, তা মানভূমির অরণ্য-রহস্য ও চন্দ্রনাথের বিশাল কারখানার দানবমূর্তির পটভূমিকায় নিবিড় অর্থদ্যোতনায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রকৃতিচেতনার বিশিষ্টতা চূড়ান্তশীর্ষে আরোহণ করেছে। কোপাই নদীর বাঁকে কাহার-পল্লীর গোষ্ঠি-জীবনের সঙ্গে এখানকার আদিমপ্রকৃতি এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতি এখানে তার রহস্যময় আলোছায়া-সঙ্কেতের দ্বারা সেই আদিম জনগোষ্ঠিকে

নিয়ন্ত্রিত করেছে। সংস্কার কিংবদন্তী ও উপকথা জড়িত হয়ে এখানকার প্রকৃতিকে নিয়তির মতোই নির্মম ও রহস্যময়ী করে তুলেছে। উপকথা-কিংবদন্তী-ঘেরা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' তারাশঙ্করের আর একখানি সার্থক সৃষ্টি। হিজলবিলে মা-মনসার আটনের যে অপরূপ পটভূমি আঁকা হয়েছে, তা যেন কিংবদন্তীজড়িত বিস্মৃতপ্রায় অস্পষ্ট অতীত-চিত্রের একটি সুদৃশ্য 'ফ্রেম'।

৪

তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, কৃষিনির্ভর পুরাতন গ্রামীণ সমাজই এখানকার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। অধঃপতিত জমিদারসম্প্রদায়, পাশ্চাত্য শিক্ষাবিমুখ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, গ্রাম্য চাষীসম্প্রদায়, সাঁওতাল-বেদে-বাগদী-কাহার প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ ও বিচিত্র শ্রেণীর নরনারী এই সমাজকে জীবন্ত করে তুলেছে। তারাশঙ্করের রচনার একটি বিরাট অংশই তথাকথিত ভ্রাম্যমান অন্ত্যজ সম্প্রদায় অধিকার করেছে। এদের সঙ্গে হিন্দুসমাজের মূল কাঠামোর কোনো যোগ নেই—এদের আদিম রক্তধারা ও জীবিকার্জনের অদ্ভুত পন্থা, নৃত্য-গীত, পণ্যানারীর জীবনচর্যা, অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি কবিয়াল ও তার ইতর শ্রোতৃবৃন্দ জীবন-রহস্যের এক নূতন উপকরণ রচনা করেছে।

'গল্পগুচ্ছ'র কোনো কোনো গল্পে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসমাজের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু ছোটগল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে বিস্তৃত সমাজচিত্রণের অবকাশ ছিল না। শরৎচন্দ্র তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে পল্লীসমাজের যে ছবি এঁকেছেন, তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের আদর্শ ছিল। শুধু তাই নয়, পল্লী-জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনায় শরৎচন্দ্রই ছিলেন পথপ্রদর্শক। তারাশঙ্করের পল্লীসমাজের বিস্তৃতি অনেক বেশী। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের ছবি কোথাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, নর-নারীর হৃদয়সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলার জন্য পল্লীসমাজের যতটুকু ছবি প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র ততটুকুই এঁকেছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর পল্লীসমাজের একটি সমগ্র রূপ ও তার বিচিত্র অভিব্যক্তিগুলিকে রূপ

দিয়েছেন। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'—এই দুখণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসকে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ পল্লী-সমাজচিত্রণ বলা যায়। সমগ্রতায় ও ব্যাপকতায় পল্লীসমাজের এই-জাতীয় ছবি বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। এই দুখণ্ডব্যাপী সুবৃহৎ উপন্যাসে ছোট-খাটো খণ্ড-কাহিনীর অভাব নেই—কিন্তু এই স্পন্দনগুলি অখণ্ডপ্রবাহের অতিরিক্ত কিছুই নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্র। কোনো চরিত্রই এখানে তেমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, অথচ বিশেষ ধরণের 'টাইপ' চরিত্রের অভাব নেই। প্রথম খণ্ডে দেবু ঘোষের দেশসেবা ও আদর্শবাদ যে অত্যুচ্চ ভাবলোকের সৃষ্টি করেছিল, সেখানে তার আন্তরিক পরিচয় উদ্ঘাটিত হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু 'পঞ্চগ্রাম'-এর অতিসাধারণ গ্রাম্যসমাজ-পরিবেশে তার নেতৃত্বের নূতন পরীক্ষা হয়েছে। এখানে তার পূর্বস্মৃতি রোমন্থন ও ভাবুকতা ব্যক্তিহৃদয়কে উদ্ঘাটিত করেছে।

তারাশঙ্করের সমাজ আলোচনা করতে গেলে তাঁর নিজেরই একটি মন্তব্যের উল্লেখ করতে হয় : 'এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লী-জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ। আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু—শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতিপথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না, ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে।' [৫]

তারাশঙ্করের এই মন্তব্যটি থেকে তার সমাজচিত্রণের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিহৃদয়ের বার বার সংঘর্ষ হয়েছে। প্রায় পঁচিশ বছর পর তারাশঙ্কর যখন সমাজকে দেখেছেন, তখন সেই পুরাতন সমাজ মুমূর্ষু। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে লেখক ধ্বংসোন্মুখ সমাজের যে কার্যকারণ সূত্রগুলির বর্ণনা করেছেন, তার নৈপুণ্য অনস্বীকার্য। প্রাচীন সমাজের শেষরশ্মিও ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের

৫ আমার সাহিত্য-জীবন. পৃঃ ৪৮

দেশত্যাগ অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। দীর্ঘকালব্যাপী যে জীবনচর্যা একদা সমস্ত সমাজদেহকে ধারণ করেছিল, তার প্রয়োজন আজ নিঃশেষিত হয়েছে। ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পিতামহের পথকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সাম্যনীতির প্রচারক হয়ে উঠেছে। 'গণদেবতা'য় যে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ-জীবন তার আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তি হারিয়েছে, 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে তার পতন সম্পূর্ণ হয়েছে। সমাজ-জীবনের মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রসংহতি ছিল, তা বহুকাল থেকেই শিথিল হয়ে আসছিল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব ও সমাজশক্তির শিথিলতার সুযোগে গ্রাম্য দলাদলি ও অব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে উঠেছিল। বহুজীর্ণ ও অন্তঃসারশূন্য সমাজ-জীবনের রন্ধ্রপথ দিয়ে ভাঙনের শনি প্রবেশ করেছে। কৃষিনির্ভর চাষীসম্প্রদায়ের জীবিকার ক্ষেত্র ও উপায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে—মাটি ছেড়ে তারা শহরের কল-কারখানার দিকে ছুটে চলেছে।

'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'র মধ্যে তারাশঙ্কর পল্লীসমাজের যে খণ্ডরূপের পরিচয় দিয়েছেন. 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে তাই একটি অখণ্ড ও সমগ্র চিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া পূর্ববর্তী দুটি উপন্যাসে জমিদার-শাসিত পল্লীসমাজের যে ভাঙন দেখা গিয়েছে, পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। ইন্দ্র রায় প্রাচীন জমিদারের সর্বশেষ প্রতীক—শেষবারের মতো তিনি কঠিন হাতে নেতৃত্বদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেন নি। কালের নির্মম বিধানে শাসনদণ্ড তাঁর হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। যন্ত্রদানব শুধু কালিন্দীর চরকেই অধিকার করে নি, কারখানার মালিক বিমলবাবু ইন্দ্র রায়ের হস্তচ্যুত নেতৃত্বদণ্ড গ্রহণ করেছেন। ইন্দ্র রায় নূতন বিধান ও নূতন কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর কাশীবাসের সঙ্কল্প, নূতনের কাছে পুরাতনের নতি স্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু 'গণদেবতা'র দ্বারিক চৌধুরীর পরিণতি আরো শোচনীয়। তিনি জমিদারী হারিয়ে সাধারণ চাষীতে পরিণত হয়েছেন।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সামাজিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। পতনোন্মুখ জমিদারসম্প্রদায়ের অস্তাচলগামী মহিমাকে তিনি সৃষ্টিসাফল্যে মণ্ডিত করেছেন। জমিদার-সম্প্রদায়ের বিলাসমন্থর অবসরপুষ্ট

জীবনযাত্রা, তাদের দয়া-দাক্ষিণ্য, অত্যাচার-উৎপীড়ন—কোনো কিছুকেই বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ জমিদার-সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত সামাজিক জীবনের কেন্দ্রশক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের উত্থান, সমৃদ্ধি, ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা ও পতনের সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস বিচিত্র রেখায় বিন্যস্ত। অনাসক্ত সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেও এ সত্য প্রচ্ছন্ন নয়। তাই এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তারাশঙ্কর জমিদার-শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজের কাহিনীকে নেপথ্যকাহিনী হিসেবে একাধিকবার শুনিয়েছেন এবং নূতন যুগের সঙ্গে এই বিলীয়মান যুগের সংঘাত ও পরাজয়ের 'ট্রাজিক' বেদনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন।

বিলীয়মান যুগের ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে একজাতীয় করুণ-মধুর রোমান্স-রস আছে। তারাশঙ্করের রচনায় এই রসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায় ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের শেষ প্রতিনিধি। অভিমানক্ষুব্ধ আভিজাত্য-বোধ তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। নূতন ধনী গাঙ্গুলীবাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে এক বসন্তবিহ্বল জ্যোৎস্নামত্ত রাত্রিতে সুরা ও বাইজীর যৌবন-মদিরার মোহে কিছুকালের জন্য যেন অতীত বৈভব ও বিগত যৌবনকে ফিরে পেয়েছিলেন। কিন্তু দিনের আলোকে সে হারিয়ে যায়, প্রাচীরবিলম্বী পূর্বপুরুষদের মত্ত হাসি ফুটে ওঠে। নিয়তির নিগূঢ় সঙ্কেত উপলব্ধি করেন রায়—বাতি নিভিয়ে দিয়ে জলসাঘর বন্ধ করার হুকুম দেন। আর 'হাতের চাবুকটা শুধু সশব্দে আসিয়া জলসাঘরের দরজায় আছড়াইয়া পড়িল।' শেষবারের মতো যেন অতীতের উদ্যত শাসনদণ্ড নিরুপায় বেদনায় অদৃষ্টের পাষাণ-শিলায় মাথা কুটে মরেছে। অতীতের ক্ষয়িষ্ণুতার বেদনাকে তারাশঙ্কর হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। নূতনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পুরাতনের অন্তর্বেদনা ও 'ট্রাজিক' রসকে তিনি নিপুণ নিষ্ঠায় রূপ দিয়েছেন, অন্যদিকে নূতনের স্পর্ধিত পদক্ষেপ ও অব্যাহত জয়যাত্রাকে অবিকম্পিত রেখায় দ্বিধাহীন ভাবে ফুটিয়েছেন। রায়বংশের জীর্ণ প্রাসাদের উপর যেমন নৈশ নীরবতা এক মৃত্যু-বিবর্ণ ছায়া বিস্তার করেছিল, তেমনি তার পাশে 'এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তি-

বিশিষ্ট একটি বিজলী-বাতি অবিকম্পিতভাবে জ্বলিতেছিল।' তারাশঙ্কর পুরাতনের অন্তর্জীর্ণতা ও তার মহিমাস্থগম্ভীর আভিজাত্যের মধ্যে যেমন এক মর্মান্তিক 'ট্রাজিক' চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, তেমনি নূতনের আবির্ভাবকেও অবশ্যম্ভাবী করেই ফুটিয়েছেন। জগৎ-বিধান তথা সমাজ-বিধানের এই সত্য নির্মম নৈপুণ্যে রূপ দিলেন তারাশঙ্কর। 'ধাত্রীদেবতা'য় ধ্বংসোন্মুখ জমিদার-তন্ত্রের উপর সমাজসেবা ও দেশপ্রেমের মুক্ত আলো বর্ষিত হয়েছে, 'কালিন্দী'তে ইন্দ্র রায়ের হাত থেকে শাসনদণ্ড স্খলিত হয়ে পড়ে নূতন শিল্পপতি মিঃ মুখার্জির শক্তি বৃদ্ধি করেছে, 'পঞ্চগ্রাম'-এ ন্যায়রত্ন নবীনের সঙ্গে সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়ে দেশত্যাগ করেছেন—পৌত্র বিশ্বনাথ উপবীত বর্জন করে সাম্যবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বনোয়ারীর পরাজয় নবীনের জয়ধ্বনিকেই ঘোষিত করেছে। 'জলসাঘর' গল্পেই নয়, আরো অনেকগুলি গল্পে তারাশঙ্কর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তবু তারাশঙ্কর পুরাতনকে জীর্ণ ও গতিশক্তিহীন বলে নির্মম হতে পারেন নি। ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব তার শিল্পীসত্তার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। গ্রামীণ সংস্কৃতির ও পল্লীসমাজের সঙ্গে তাঁর মানসিক সংযোগ এতো নিবিড় যে তাকে খুব সচেতনভাবে তিনি যেখানেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন, সেখানেই অনভ্যস্ত পথে নানা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। যুগ-জীবনের রূপান্তর-লীলাকে তিনি বাধা দিতে চান নি, কিন্তু পুরাতনের পতনের মধ্যে যে অস্তসূর্যের মহিমা আছে, তার প্রতি তাঁর একটি বেদনাময় সশ্রদ্ধ মনোভাব আছে। নূতনের কাছে পুরাতনের পরাজয় ঘটেছে, জমিদারদের স্থান অধিকার করেছেন মিল-মালিকেরা, চাষীরা পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে। কিন্তু এই নূতনের মধ্যেও তেমন কোনো বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি নেই, পুরাতন ব্যবস্থাকে নির্মম আঘাতে ভেঙে দেওয়াই যেন তার সবচেয়ে বড়ো কাজ। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র শেষে মৃত্যুর আগে গঙ্গারাম বলেছে: 'পিঙলা যেমুন করে চলে গেল—তারপর আর কি কন্যে আসে? কন্যে আর আসবেন নাই। কন্যে আর আসবেন নাই।'—এ বেদনা শুধু শিরবেদে গঙ্গারামেরই নয়, শিল্পী তারাশঙ্করেরও।

৫

যে জীবন ও সমাজ-পটভূমি তারাশঙ্করের শিল্পপ্রত্যয়ের ভিত্তি রচনা করেছে তা-ই আবার তাঁর চরিত্র রচনারও প্রধান উপকরণ। চরিত্ররচনার জন্য তাঁকে কোনো 'পৃথক যত্ন' নিতে হয় নি, অন্ততঃ তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হবে না। তিনি চরিত্র-অনুযায়ী উপন্যাসের পটভূমি রচনা করে ঘটনা পরম্পরাকে বিন্যাস করেন না, উপন্যাসের পটভূমিই তার প্রাণরসের সহজ শক্তিতে চরিত্র রচনা করে। চরিত্রসৃষ্টির এই বিশেষ রীতিটি যেন প্রাচীন মহাকাব্যেরই আধুনিক সংস্করণ। উপন্যাসের বিস্তৃতি ও সমগ্রতা যে দেশ-কালকে দ্যোতিত করে, চরিত্রগুলি সেই যুগমৃত্তিকারই শস্য। তাই চরিত্র বিচার করতে গেলে উক্ত দেশ-কাল ও সমাজ-পরিবেশের স্বরূপধর্ম আলোচনা করতে হয়। ঘটনাপ্রবাহকে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে রেখে তিনি চরিত্র রচনা করতে বসেন না, আখ্যায়িকার সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টি মিশে থাকে।

তারাশঙ্করের আখ্যায়িকা-বিন্যাস সরল, সহজ ও অবিসর্পিত। চরিত্রগুলিরও সাধারণ ধর্মের সঙ্গে আখ্যায়িকার সাধারণ ধর্মের একটি মিল আছে। গ্রাম্যসমাজের মধ্যযুগীয় বিন্যাসের সঙ্গে তারাশঙ্করের অনেকগুলি চরিত্রের একটি অন্তরঙ্গ যোগ আছে। মৃত্তিকার গূঢ় রসে ও পরিবেশের সহজ লালনে যেন চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। এক এক সময় মনে হয় চরিত্রগুলি যেন কারো রচিত নয়, বীরভূমের আঞ্চলিক প্রকৃতির মতো তারা বেড়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে কোনো একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাবৃত্ত গড়ে ওঠে না, গল্পরস ও আখ্যায়িকা-বিবৃতির অপরিহার্য অঙ্গরূপেই চরিত্র সৃষ্ট হয়।

তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি মোটেই জটিল নয়, কয়েকটি ঋজুরেখায়, অবিকম্পিত ভঙ্গিতে তিনি চরিত্র আঁকেন। আধুনিক কথাসাহিত্যে জটিল চরিত্র সৃষ্টির দিকে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর সে পথ বর্জন করেছেন। আলো-ছায়ার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় তিনি চরিত্রগুলিকে উদ্ভাসিত করে তোলেন না, জটিল মনস্তত্ত্বের তির্যক রেখায় তাদের বিচিত্রিত করেন না। কিন্তু চরিত্রগুলির আশ্চর্য রকমের সজীবতা! তারাশঙ্করের চরিত্রগুলিতে রুগ্নতার কোনো স্পর্শ নেই। দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিতে বিকৃত, জান্তব লালসায় উন্মত্ত চরিত্রের অভাব এখানে নেই। মাতাল, ভবঘুরে খুনী ও বিকলাঙ্গ

চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতে এখানে দেরী হয় না। কিন্তু কোথায়ও তাদের রুক্ষতা নেই—বীরভূমের রৌদ্রদগ্ধ কঠিন-কঙ্করে তারা রচিত।

আধুনিক যুগের বাংলা কথাসাহিত্যে যুগজীবনের অবক্ষয় ও গ্লানি চরিত্রগুলিকেও রুগ্ন করে তুলেছে। শক্তিশালী য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যিকেরাও এই 'রুগ্ন-চিত্রণ' থেকে বাদ পড়েন না। মনে হয় যুগ-জীবনের মারাত্মক ব্যাধি তাঁদের মানসিক জীবনকে পরাভূত করেছে। মনোবিকার ও উৎকটপ্রবণতাগুলি তাই চরিত্রগুলির ব্যাধিগ্রস্ত মনের নিত্যসহচর হয়েছে। তারাশঙ্করের চরিত্রগুলিতে আদিমপ্রবণতার অভাব নেই, কিন্তু তা প্রান্তরভূমি, অরণ্য-পত্র-পল্লবের মতোই স্বাভাবিক—আদিম প্রাণোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনে হয় প্রকৃতি থেকেই সরাসরি তিনি যে-সমস্ত চরিত্রকে এনেছেন, তাদের উপর নূতন করে রঙ্ ফলানোর চেষ্টা করেন নি। তাদের মধ্যে যে আদিমবৃত্তিগুলি আছে তাদের বহিঃপ্রকাশের মধ্যেও এক অকপট সারল্য বিদ্যমান। তাদের মধ্যে যে স্থূলতা ও নগ্নতা আছে তা কোনো রুগ্নতার পরিচায়ক নয়। তারাশঙ্কর যে-জীবনের কথা বলেছেন, সেখানে মানুষের আদিম বৃত্তি ও আদিমতম সংস্কার তেমনি উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারাশঙ্কর তাকে সুলভ মনোরঞ্জনী বৃত্তির প্রলেপ দিতে চান নি। যেটুকু অসংস্কৃত স্থূলত্ব ও অমার্জিত রূঢ়তা চোখে পড়ে, সেটুকু বাদ দেওয়া সম্ভব নয়—কারণ তা উক্ত জীবনেরই স্বরূপ-ধর্ম, লেখকের মনঃকল্পিত বা স্বেচ্ছাআরোপিত কোনো উপকরণ নয়।

আদিম জীবনের যে উৎসকে তারাশঙ্কর উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন, তার উদ্দাম অব্যাহত গতির মধ্যে কোনো মালিন্য নেই, কোনো কলুষ সেখানে স্পর্শ করে না। কাগজের কৃত্রিম ফুলে ধুলি জমে, কিন্তু বনফুলের উপর ধূলি জমলেও তার স্বাভাবিকত্ব ও সজীবতা নষ্ট হয় না।[৬] পশুকল্প মানুষ তিনি এঁকেছেন, পাশববৃত্তির নির্মমতম কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন। সভ্যতা ও আধুনিক জীবন যে দ্বিধা, সংশয়, বিকার ও রুগ্নতার সৃষ্টি করে, তারাশঙ্করের সৃষ্ট-চরিত্রে তা অনুপস্থিত। আদিম অকর্ষিত কুমারী মৃত্তিকার প্রাণরসের মধ্যে

৬ 'দুর্ভেদ্য জটিলতার প্রতি মোহে তিনি রুগ্ন ক্ষয়িষ্ণু মনোবিকারের দিকে আকৃষ্ট হন নাই, বিরল, বীভৎস ব্যতিক্রমের মধ্যে তিনি জীবনের তাৎপর্য খোঁজেন নাই।'—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ ৪৪১, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুর্বার ও দুর্বিনীত জৈবশক্তি আছে, তারই সহজ ও অরুগ্ন দাক্ষিণ্যে তাঁর চরিত্রগুলি রচিত হয়েছে। 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী'-জাতীয় গল্পে মানুষ ও পশু এক নিগূঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ। দুর্দান্ত মহিষ কালাপাহাড়ের প্রচণ্ড আসক্তির কাহিনীকে তারাশঙ্কর নিপুণ রেখায় রূপ দিয়েছেন। পশুসঙ্গী কুম্ভকর্ণ ও মানবপ্রভু রংলাল এখানে একই বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। পাশব আসক্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে 'নারী ও নাগিনী' গল্পটিতে। সাপিনীর জৈব আসক্তির সঙ্গে ক্রূরকুটিল ঈর্ষা সমন্বিত হয়ে এই গল্পটি জীবনের এক অতলান্ত গূঢ় রহস্যকেই ব্যঞ্জিত করেছে। খোঁড়াশেখও দেহ-মনে আর একটি পশু : 'শুধু পা খানিই তাহার খোঁড়া নয়, যৌবনে কদাচারের ফলে কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাকটা বসিয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা যায় শুধু একটা বীভৎস গহ্বর। তারপর হয় তাহার বসন্ত, সেই বসন্তের দাগে কুৎসিৎ খোঁড়া দেখিতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।' উদ্দাম বন্য মহিষ, বিষধর সাপের কুটিল ফণা—পশুস্বভাব মানুষের আদিম বৃত্তির সঙ্গে সমভূমিতে বিদ্যমান।

তাই চরিত্রগুলির সংগ্রাম-সংঘর্ষ, উল্লাস-উদ্দামতা ও বেদনা-ব্যর্থতা ভীষণ গম্ভীর উচ্চতানের সৃষ্টি করে—ঋজু ও বলিষ্ঠ রেখায় তারাশঙ্কর তাদের ফুটিয়ে তোলেন, সূক্ষ্ম কলাকৌশলের প্রয়োজন সেখানে নেই। জৈবানুভূতি-সর্বস্ব মানুষের জীবনকে তারাশঙ্কর এক গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানবিক বেদনাবোধের দ্বারা তিনি তাঁর জৈবানুভূভূতি-সর্বস্ব নরনারীকে এক নূতন স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কবি' উপন্যাসে রূপোপজীবিনী বসন্তের উদ্দাম ও অসংযত জীবনের অন্তরালে রিক্ততার বেদনাকে তারাশঙ্কর অপূর্ব মমতায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। বসন্তের সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদৃশ্যটি বঞ্চিতা নারীর মর্মবেদনায় করুণ হয়ে উঠে উঠেছে :

'মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি ?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে, বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সজোরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বসন

বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘর-সংসার কি দিয়েছে? না।

* *

বসন আবার পাশ ফিরিয়া বলিল্—গোবিন্দ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মতো।'

ঝুমুরের দলের এই উচ্ছৃঙ্খল পণ্যানারীর শেষ কাতোরোক্তি যে অশ্রুগম্ভীর মহিমার সৃষ্টি করেছে, তা তুলনাহীন। 'তমসা' গল্পটিতেও অন্ধ কুৎসিত ভিখারী-ছেলে পঞ্চুর অন্ধকারাচ্ছন্ন জৈবজীবনের মধ্যে থিয়েটারের দলের একটি মেয়ের কণ্ঠমাধুর্য ও স্পর্শসুধা এক জ্যোতির্ময় নূতন দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে। জৈবজীবনের অন্ধকারজাল অপসারিত হয়ে তার চিন্ময় দৃষ্টি এক অপূর্ব রূপলোকের সন্ধান পেয়েছে। তারাশঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন কামলোককে রূপলোকে উত্তীর্ণ করেছেন—ভূগর্ভের গলিত অগ্নিপ্রবাহকে স্বরলোকের দাহহীন ধ্রুবজ্যোতিতে পরিণত করেছেন। এইখানেই তাঁর জীবনরসিকতার প্রৌঢ় পরিণতি। বসন্তের চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করের শক্তির এক নূতন পরীক্ষা হয়েছে। ঝুমুরের দলের এই মেয়েটির চরিত্রসৃষ্টিতে এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। শরৎ-সাহিত্যের তথাকথিত পতিতাদের চরিত্রে সামঞ্জস্যের অভাব উৎকট হয়ে উঠেছে। তাঁরা যেন এক জ্যোতির্লোকবাসিনী!—স্নেহে-মমতায়, সেবাপরায়ণতায় তাঁরা অতুলনীয়া। তারাশঙ্কর বসন্তের উদ্দাম ভোগপ্রবৃত্তি ও অসংযত জীবনের বর্ণনাকে আদর্শায়িত করার চেষ্টা করেন নি, অথচ অন্তর্নিহিত অতৃপ্তি ও বঞ্চিতা নারীর তীব্র দহনজ্বালাও এখানে অনুপস্থিত নয়। আদর্শবাদের আতিশয্য ও ভাবালুতা এই জাতীয় চরিত্রকে সচরাচর অবাস্তব করে তোলে। বসন্ত-চরিত্র-অঙ্কনে তারাশঙ্কর এই সমস্ত দোষ থেকে অনেকখানি মুক্ত। কুপ্রিন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সে কথা তারাশঙ্কর সম্পর্কেও এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে: 'But even if he may be said to have used too much of the oil of sentimentality in mixing his colours for the portraits, his portraits are subordinate to the background; and there his eye is true

and keen, his hand steady and unflinching, his colours and brush work unimpeachable'.[৭]

যাঁরা মনে করেন, তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে কিঞ্চিৎ 'সেন্টিমেন্ট্যাল' হয়ে উঠেছেন, সমালোচকের এই উক্তিটি তাঁদের স্মর্তব্য।

বুদ্ধদেব বসু তারাশঙ্করের উপন্যাসে আদিরসের অভাব লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন : 'Another respect I find Tarashankar lacking in is what our Sanskrit aesthetician called the 'adirasa' or the primary feeling (though 'feeling' is not quite the word, 'rasa' being untranslatable) : I mean the mutual attraction of the two sexes, capable of infinite forms, but invariable in substance, the subject, totally or partly, of so large, so overwhelmingly large a body in the world's literature'.[৮]

উদ্ধৃত অভিমতটির মৌলিকতা অবশ্যস্বীকার্য। এই নেতিবাচক মন্তব্যটি তারাশঙ্করের মানস বিশ্লেষণের সাহায্য করবে। তাঁর রচনায় প্রেমচিত্রণ নিতান্ত বিশেষত্বহীন ও স্বভাব-শীতল, এ ধরণের অভিযোগও কেউ কেউ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যথার্থ কিনা এবং যথার্থ হলে এই ধরণের মনোভাব তারাশঙ্করের শিল্পপ্রকৃতির কি পরিচয় দেয়, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে প্রেমের বিচিত্র লীলা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আলো-ছায়া সঞ্চার, ব্যতিক্রমগুলির তীব্র-তীক্ষ্ণ দ্যোতনা রচনায় প্রাধান্য বিস্তার করে নি। সমকালীন লেখকদের সঙ্গে এইখানে তাঁর খুব বড় পার্থক্য সন্দেহ নেই। আদিম বৃত্তির অন্ধলীলার তিনি দক্ষশিল্পী, কিন্তু প্রেম যেখানে বিচিত্র লীলায় ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় বিলসিত, সেখানে তাঁর দৃষ্টি কদাচিৎই আকৃষ্ট হয়েছে।

এর মধ্যে আবার দাম্পত্য প্রেমের চিত্র সবচেয়ে অনুজ্জ্বল। তারাশঙ্কর এই আদিম বৃত্তিটির প্রাথমিক (Elemental) রূপকে তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎ-রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু তার পরবর্তী স্তরগুলির বিচিত্র বিকাশ তাঁর

৭ Yama, translated by Bernard Gilbert Guerney ; Introduction, XXI

৮ An Acre of Green Grass, Page 84

লেখায় অনুপস্থিত বললেও হয়। তারাশঙ্কর প্রেমকে আদিম বৃত্তিগুলির অন্যতম হিসেবেই দেখেছেন। অন্ধ বাৎসল্য, হিংস্র প্রতিহিংসা-স্পৃহা, নির্মম ক্রূরতা, নির্লজ্জ লালসা ও অসংযত জৈবক্ষুধা এখানে অকপট ও সহজভাবেই প্রকটিত। কিন্তু এই 'আদিরস' সভ্যসমাজের মধ্যে যে বিচিত্র প্রসাধনলীলায় উৎসারিত হয়েছে, তারাশঙ্করকে কদাচিৎই তা কৌতূহলী করেছে। জীবনের সমগ্র বিশাল স্থাপত্য-মহিমাই তাঁর রচনায় উদ্ভাসিত হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে তিনি কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখানোর চেষ্টা করেন নি। তারাশঙ্করের মনোজীবনের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে তথাকথিত প্রেম-বৈচিত্র্য-চিত্রণে বিমুখী করেছে।

কিন্তু কদাচিৎ যখন তিনি ব্যতিক্রমের পথে পা বাড়িয়েছেন, তখন তাঁর শিল্পদক্ষতা এই নূতন ক্ষেত্রেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'কবি' উপন্যাসটিতে তারাশঙ্কর প্রেমের বৈচিত্র্য, আনন্দ-বেদনা, স্থূল ভোগস্পৃহা থেকে দিব্য অনুভূতি পর্যন্ত স্তর-পরম্পরাগুলিকে অসাধারণ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। ঝুমুরের দলের স্থূল ও ইতর পরিবেশের মধ্যে নিতাইয়ের কবিত্বশক্তি ও প্রেমচেতনার উন্মেষকে লেখক অসাধারণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথচ ক্লেদপঙ্কিল ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার সঙ্গে কবিত্বের সৌকুমার্য ও প্রেমের বেদনাবিধুর কোমল লাবণ্য বিস্ময়করভাবে সমন্বিত হয়েছে। কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরঝি ও বসন্তের সম্পর্ক প্রেমের বহুবিচিত্র লীলাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। ঠাকুরঝি ও নিতাইয়ের অর্ধস্ফুট, আলোছায়ামিশ্র বিচিত্র সম্পর্ক প্রেমিক-কবির ভাবদৃষ্টিতে একটি ব্যঞ্জনামধুর প্রতীকে পরিণত হয়েছে। সঞ্চরমান 'স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল' প্রেমমধুর কাব্যব্যঞ্জনার সার্থক প্রতীক। বসন্ত প্রেমচেতনার আর একদিক—অন্তর্জ্বালা ও উদ্দাম সম্ভোগস্পৃহা তার বঞ্চিত জীবনের রুদ্ধদ্বারে বার বার মাথা কুটে মরেছে। ঠাকুরঝির অর্ধগুণ্ঠিত রহস্যময় ব্যক্তিত্বটি যেন নৈশ আকাশের নিঃশব্দগতি ছায়াপথ, বসন্তের দহনজালাময় জীবনটি যেন বসন্তবিহ্বল প্রমোদরাত্রির রৌদ্রদুঃসহ বৈশাখী পরিণাম! এই একখানি উপন্যাসই তারাশঙ্করের প্রেমচিত্রণ-দৌর্বল্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কারণ বাংলাসাহিত্যে 'কবি'র কোনো দোসর নেই।

উত্তরকালে তারাশঙ্করের প্রেমচেতনা এক নূতন পৃথিবীর সন্ধান করেছে। কিন্তু তাঁর মানসলোকে এই নবীনের প্রত্যাশা বহুপূর্বেই মুকুলিত হয়ে উঠেছিল। কন্যা বুলুর মৃত্যুর পর 'শ্মশান ঘাট' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পের মধ্যে শোকাহত পিতৃহৃদয়ের যে প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠা বৃহত্তর সত্যের অনুসন্ধান করেছিল, তাই পরবর্তীকালে তারাশঙ্করকে নবীন উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'শ্মশান-ঘাট' গল্পে যার সূচনা ঘটেছিল, তার গভীরতর রূপ ফুটেছে 'কবি' উপন্যাসে। বসন্তের মৃত্যুর পর নিতাইয়ের বৈরাগ্য-ধূসর পরম উপলব্ধি নূতন তীর্থপথের সন্ধান পেয়েছে—মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণ যবনিকার আড়ালে উপলব্ধি করেছে এক প্রশান্ত জ্যোতির্লোকের। রৌদ্ররঞ্জিত বৈশাখী দ্বিপ্রহর এক অনাসক্ত অসীম বৈরাগ্যে চিহ্নিত হয়েছে ঃ 'সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল।'

'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'—উপন্যাস-চতুষ্টয়ে তারাশঙ্কর পুরাতন ও নূতন সমাজ-জীবনের সংঘাতে নূতন যুগের দেশপ্রেম, সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে এক প্রশস্ত মানবিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তারাশঙ্করের সংশয়-বিক্ষত মনের যথার্থ বিশল্যকরণী এখনো মেলে নি, আর একটি নূতন দিগন্ত ছিল তার সামনে। 'কবি' উপন্যাসে সেই দিগন্ত মৌক্তিকবর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক প্রসারিত দৃষ্টি অধ্যাত্মরসে শুচিস্মিত হলো।

পরিণত বয়সে তাঁর দুইটি রচনায় এই দৃষ্টি সবচেয়ে মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই দুইটি গ্রন্থ হলো 'আরোগ্য নিকেতন' ও 'সপ্তপদী'। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস ও 'সপ্তপদী' বিলম্বিত লয়ের ছোটগল্প। গল্পাংশের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, তারা একই মানসলোকের নিকটতম প্রতিবেশী। 'সপ্তপদী' গল্পে কৃষ্ণেন্দু ও রিনা ব্রাউনের সম্পর্ককে এক নূতন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাশঙ্কর। কৃষ্ণেন্দু হিন্দুঘরের ছেলে, রিনা ব্রাউনের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টান হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেও সে রিনাকে পায় নি। আসানসোলে রেভারেণ্ড আর্নেস্টের বাংলোয়

রিনা ব্রাউনের কাছে সে পেলো চরম প্রত্যাখ্যান, নির্মম ধিক্কার : 'তুমি ভয়ঙ্কর কৃষ্ণেন্দু, তুমি ভয়ঙ্কর। একটি নারীর জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরকে ছাড়তে পার। কৃষ্ণেন্দু, আমার চেয়ে সুন্দরী নারী অনেক আছে। তা হলে তাদের কাউকে যখন দেখবে, সংস্পর্শে যখন আসবে, তখন আমাকেও তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেবে তুচ্ছ বস্তুর মত। ঈশ্বর, যে ঈশ্বরকে তোমার আপনার বলে এতদিন জেনে এসেছ, ভালবেসেছ—। ওঃ! তুমি যাও! তুমি যাও! আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু না। বিবাহ করতে আমি পারব না। তুমি ভয়ঙ্কর।'

কৃষ্ণেন্দুর মৃত্যু হলো, তার ভস্মাবশেষ থেকে জন্ম হলো রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামীর। কুষ্ঠরোগীর সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। মানবসেবার ভিতর দিয়ে এক আধ্যাত্মিক শুভ্রতা তার অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। রিনা ব্রাউনের প্রত্যাখ্যান তাকে বৃহত্তর মানবপ্রেম ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের মধ্যে মুক্তি দিল—'মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জলিয়া।' রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী রিনাকে হারিয়ে পেয়েছেন এক আলোকতীর্থের সন্ধান। প্রেমের এই মহতী রূপান্তর প্রৌঢ় তারাশঙ্করের চেতনায় পরম বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'আরোগ্য নিকেতন' তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য কম নয়। ঔপন্যাসিকের স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা সমন্বিত হয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক তারাশঙ্করের এই উপন্যাসে শক্তির ক্ষীণতা লক্ষ্য করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে তিনি এখানে পূর্ববর্তী পথ পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু যে নূতন পথ ধরেছেন তার মৌলিকতা ও ভাব-গভীরতা অনস্বীকার্য। জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও মৃত্যুরহস্য-জিজ্ঞাসার গূঢ় অনুভূতি এই উপন্যাসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা রহস্যরূপিণী মৃত্যুর গাঢ় ছায়া উপন্যাসটিকে ঘিরে রেখেছে, বিদ্যুতের চকিত দীপ্তির মতো জীবনের ক্ষণিক বিকাশগুলি সেই ছায়ায় মিলিয়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন আয়ুর্বেদ গুহাহিত মৃত্যুরহস্যের যবনিকা উন্মোচিত করেছিল। জীবন মশায় সেই প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা চিকিৎসকদের শেষ প্রতিনিধি।

নাড়ীজ্ঞান তাঁর অভ্রান্ত, দৃষ্টি তাঁর অন্তর্ভেদী। কিন্তু নূতন যুগের পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে অস্বীকার করতে চায়। এই দুই চিকিৎসা-পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণটি চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস ও বিলীয়মান প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি লেখকের সশ্রদ্ধ মনোভাব আলোচ্য উপন্যাসটিতেও পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসের মূল সুর নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব নয়—এই দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ সমাধান মিলেছে এক প্রশান্তমধুর দিব্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বহুবার জীবনমশায় মৃত্যুর রহস্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে তাঁর কুলবিদ্যার অবিকম্পিত শিখা সেই গুহাহিত সত্যকে আবিষ্কার করেছে। একদিকে বিচিত্ররূপিণী নিঃশব্দসঞ্চারিণী পিঙ্গলবর্ণা অন্ধ-বধির কন্যার অলক্ষ্য ও অব্যর্থগতি, অন্যদিকে সাধকের মৃত্যুরহস্যভেদী অন্তর্দৃষ্টির ধ্রুবজ্যোতি এখানে এক মহিমা-সুগম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'আরোগ্য নিকেতন' তারাশঙ্করের পরিণত শিল্প-প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

৭

'টাইপ'-চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর পর্যবেক্ষণ-নিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলির মধ্যে এমন সমস্ত অসমতল বন্ধুরতা আছে যা বর্ণনার আলোকে সহজেই দীপ্যমান হয়ে ওঠে। অতিবিশ্লেষণ অথবা জটিল বর্ণনায় তিনি চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলেন না। কিন্তু এর অভাব পূরণ করেছে তাঁর চরিত্র পর্যবেক্ষণের বিশেষ ভঙ্গিটি; বিশেষ কোনো চরিত্রকে তিনি এমনভাবে উপস্থিত করেন, যেখানে দীর্ঘ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন হয় না। এই সব চরিত্র জনতার ভিড়ে মিশে থাকলেও তাদের চিনতে অসুবিধা হয় না। কারণ তাদের চরিত্রে এমন বিশেষত্ব থাকে যা তাদের চিনিয়ে দেয়। একটু অদ্ভুত, উৎকট ও ব্যতিক্রমের দিকেই চরিত্রস্রষ্টা তারাশঙ্করের প্রবণতা। 'মতিলাল' গল্পের মতিলাল, 'রায়বাড়ী' গল্পের কালী বাগ্‌দী. 'রাখাল বাঁড়ুজ্যে' গল্পের রাখাল বাঁড়ুজ্যে, 'দেবতার ব্যাধি' গল্পের ডাক্তার গড়গড়ি প্রভৃতি

অবিস্মরণীয় চরিত্র। চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনেকগুলি গল্পের কেন্দ্রমূলে।—বিচিত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গল্পগুলি দানা বেঁধে উঠেছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলির মধ্যেও অনেকক্ষেত্রেই প্রধান চরিত্রের চেয়ে অপ্রধান চরিত্রগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে নায়েব রাখাল সিংহ, মাষ্টারমশাই রামরতনবাবু, গোঁসাইবাবা প্রভৃতি চরিত্র শুধু কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক চরিত্র নয়, তাদের চরিত্র ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম'-এর মতো সুবৃহৎ উপন্যাসেও ছোট ছোট 'এপিসোড্' ও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র এর মন্থর ও পল্লবিত বিন্যাসকে সজীব করে রেখেছে। দেবু ঘোষের আদর্শদীপ্ত চরিত্রের পাশে এই চরিত্রগুলি ক্ষণদীপ্ত জোনাকির মতো মনে হতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যে ও পর্যবেক্ষণ-দক্ষতায় চরিত্রগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের স্মৃতিমন্থর দীর্ঘ বিবৃতির মধ্যে রংলাল ডাক্তারের বিচিত্র চরিত্র এক তীব্র আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। এই ধরণের আশ্চর্য মানুষের অদ্ভুত চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর সিদ্ধ শিল্পী। অসমতল জীবনের বহুকোণ বিশিষ্ট বৈচিত্র্যকে তিনি রূপমণ্ডিত করে তুলেছেন। সুমসৃণ পারিবারিক জীবনের সহজরূপ কদাচিৎই তাঁকে আকর্ষণ করেছে।

পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও অভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টির মূল। চরিত্র-রচনার জন্য তাঁকে কল্পনার খাদ মেশাতে হয় না, তেমন কিছু উদ্ভাবনও করতে হয় না—জীবন থেকে সরাসরি তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সমালোচকেরা চরিত্ররচনার মোটামুটি দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন ঃ

'Some writers seem to snatch their characters out of thin air, with no conscious reference to any body they ever heard of ; slap any old names to them and by a few quick casual strokes that leave most of their personalities unexpressed make them vivid and notable. Others must document, correlate, catalogue their fictional people, laboriously selecting externals indicative of needed traits, and if not literally transcribing living humans bodily to paper, at least

building composites, all of whose parts are drawn straight from life'.[৯]

বলাবাহুল্য, তারাশঙ্করের চরিত্রসৃষ্টি সমালোচক-বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বগোত্র। জীবনের মর্মমূল ভেদ করে যে প্রাণধারা উৎসারিত হয়েছে, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন। যেটুকু তিনি উদ্ভাবন করেছেন, তার সম্ভাবনাও ঐ জীবনোৎসের মধ্যেই নিহিত ছিল।

তারাশঙ্করের বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি-প্রসঙ্গে 'আগুন' উপন্যাসটির কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে। শুধু চরিত্রসৃষ্টি কেন, লেখক এখানে নূতন টেক্‌নিকেরও প্রয়োগ করেছেন। চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবু, চন্দ্রনাথের পাঞ্জাবী স্ত্রী মীরা, হীরু, যাযাবরী—গ্রন্থবর্ণিত কয়েকটি চরিত্রই অসাধারণ। তারা কেউই সাধারণ মানুষের সমতলবাহী জীবনপথের পথিক নয়। এই বিচিত্র চরিত্রগুলিকে গভীর রেখায় আঁকা হয়েছে। নরুর পূর্বস্মৃতির পটভূমিতে পৌরুষপ্রবল, অস্থির ও চঞ্চলমতি চন্দ্রনাথ যেন 'মধ্যগগনচারী কালপুরুষ' : 'কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। ঐ নক্ষত্রটির খড়্গধারী ভীমাকার আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটি সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্তভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এই উন্মত্ত যাত্রা তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।'

উপন্যাসের শুরুতেই তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণভাবেই চরিত্র-দ্যোতক। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে তার এই প্রখর অথচ চঞ্চল ব্যক্তিত্ব নানারেখায় সুচিহ্নিত—'গ্রোথ অব্ দি সয়েল্'-এর বিরাট স্বপ্নের পরিণতি বারবার অর্ধপথেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। নিশানাথবাবুর অধ্যাত্ম-সাধনা ও কঠোর ব্রতনিষ্ঠা জীবনের আর এক অধ্যায় উদ্ঘাটিত করে। হীরুর উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা জীবনযাত্রা যাযাবরীর প্রেমের উন্মাদনায় ক্ষণিকের জন্য পথের মাঝে নীড় রচনা করেছে মাত্র, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুরন্ত বেগে অনির্দেশের পথে পাড়ি জমিয়েছে। চন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের আড়ালে মীরার অবদমিত

৯ The Short Story. Page 206 : Kenneth Payson Kempton.

জীবনোচ্ছ্বাস উন্মাদনায় পরিণত হয়েছে। চরিত্রগুলির তীক্ষ্ণতা ও অদ্ভুত প্রবণতা উপন্যাসটিকে সজীব করে তুলেছে। 'আগুন' উপন্যাসে তারাশঙ্কর-প্রতিভার চূড়ান্ত সিদ্ধির স্বাক্ষর নেই সত্য, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর বিশিষ্ট শিল্পকলা ও মনোধর্ম সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তেমন গভীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এখানে নেই, কিন্তু সংশয়হীন ও অবিকম্পিত রেখায় তিনি যে কয়েকটি স্কেচ্ এঁকেছেন তা সে অভাব পূরণ করেছে।

'আগুন' উপন্যাসে তিনি যে টেক্নিক ব্যবহার করেছেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর অধিকতর প্রতিশ্রুতি-মণ্ডিত উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। গোটা উপন্যাসখানিই নরুর পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এই স্মৃতি-আলেখ্যটির রচয়িতা নরু—উপন্যাসে সে 'আমি'—উত্তমপুরুষ। উপন্যাসের কথক যে 'আমি' সে শুধু দ্রষ্টা মাত্র না হলেও উপন্যাসের ঘটনা ও পরিণতির সঙ্গে তার সংযোগ তেমন নিবিড় নয়। কতকগুলি খণ্ড খণ্ড ঘটনা কথকের অখণ্ড দৃষ্টিসূত্রে সমন্বিত হয়েছে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটির বিবৃতির মধ্যেও একটি বিশেষত্ব আছে। সমস্ত গল্পটির আড়ালে শোনা যায় এক অদৃশ্য কথকের কণ্ঠস্বর। জনশ্রুতি-কিংবদন্তী-ঘেরা বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি রহস্যময় অধ্যায় বিলম্বিত লয়ে বলা হয়েছে—কোন্ এক অদৃশ্য কথক যেন হিজলের বিলে মা মনসার আটনের বিচিত্র উপকথা শুনিয়েছেন। মূল কথক ধন্বন্তরী-বংশের বিখ্যাত ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য প্রাচীন কবিরাজ শিবরাম সেন। কিন্তু শিবরাম কবিরাজের কাহিনীকেও আর একজন কথক বলে চলেছেন। তা ছাড়া শিরবেদে মহাদেবের মতো আরো দু একজনের কথা-বিন্যাসও আছে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-তে একাধিক কথকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অদৃশ্য কথকের একটি সর্বব্যাপী কণ্ঠস্বরের মধ্যে অন্যান্য কথকের কণ্ঠ মিশে গিয়েছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসটি মধ্যযুগের প্রাচ্যকাহিনীগুলির টেক্নিক্ স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আরোগ্য-নিকেতন' উপন্যাসও স্মৃতিমন্থর। জীবনমশায়ের পূর্বস্মৃতি পর্যালোচনায় কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। বর্তমানের কাহিনী এগিয়ে চলেছে—তার সঙ্গে সঙ্গে অতীত স্মৃতি আর এক সুবিস্তৃত কাহিনী রচনা করেছে। অতীত ও বর্তমান মিলেই উপন্যাসের সুদীর্ঘ পটভূমি গড়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগের ছোটগল্পে বাইরের ঘটনাকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সহজ বিবৃতির পথ ছেড়ে ছোটগল্প স্বল্পসংক্ষিপ্ত তির্যক ভাষণ ও সঙ্কেতের পথ ধরেছে। জীবনের একটি অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত এখানে বিদ্যুদ্দীপ্তিতে আভাসিত হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি প্রধানত বিবৃতিধর্মী। গঠন-শৈথিল্য ও মন্থরতা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অঙ্কনের একটি প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পগুলির একটি বিরাট পার্থক্য আছে। সাঙ্কেতিকতার গূঢ় দীপ্তি এখানে অনুপস্থিত। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে তিনি একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দীর্ঘতর বিবৃতি ও পল্লবিত ঘটনাবিন্যাসের এমন অবকাশ থাকে, যা সহজেই উপন্যাসের শিল্পরূপ গ্রহণ করতে পারে। ছোটগল্পের অতিসূক্ষ্ম শিল্পরূপ কোথায়ও কোথায়ও ব্যাহত হলেও, জীবনকে দেখার গভীর অন্তর্দৃষ্টি বিস্মিত করে। মোপাসাঁ-পূর্ববর্তী যুগের ফরাসী সাহিত্যে বিলম্বিত লয়ের বিবৃতিধর্মী 'টেল্'-জাতীয় আখ্যায়িকাই খ্যাতিলাভ করেছিল। ব্যাল্জাক্, মেরিমেঁর মতো গল্পলেখকরাও আধুনিক গল্পের মাপকাঠিতে 'টেল্'-রচয়িতা। কিন্তু জীবন-রসিকতায় ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-দক্ষতায় তাঁদের গল্পগুলি ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনা-পাঠকের কাছে সেই চিরন্তন প্রশ্নটিই নূতনভাবে ধ্বনিত হবে : 'Life is greater than Art'. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ ই বলেছেন : "তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন যতটা জীবনরসের রসিক।"[১০]

৮

তারাশঙ্করের রচনাশিল্প ও আঙ্গিকের আলোচনা করলেও তাঁর শিল্পীপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনোধর্মের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে 'স্বভাবকবি'দের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সুন্দর-অসুন্দর সব কিছু মিলিয়ে জীবনের যে রহস্যরস উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে কোনো

১০ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (২য় সং) পৃ ৪২৫

'সচেতন' শিল্পপ্রয়াস নেই, কাহিনী রচনার মধ্যে সেই জীবনকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনরূপ চাতুর্য ও টীকা-ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। এক বস্তুনিষ্ঠ ও অনাসক্ত দ্রষ্টার আসনেই তিনি উপবিষ্ট—জীবনের কোনো অংশকেই তিনি কলাকৌশলের যত্নকৃত রূপরচনা দিয়ে সাজাতে চান নি, কারণ তাতে ঐ বস্তুনিষ্ঠ জীবনশিল্পের মহিমাই হয়তো ক্ষুণ্ণ হতো। যে সহজ সরল জীবনের তিনি রূপকার, সেই জীবনেরই একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি যেন তাঁর স্টাইলে ধরা পড়েছে।

তারাশঙ্করের ভাষায় তির্যকভাষণের গূঢ় দীপ্তি ও সাঙ্কেতিকতা অনুপস্থিত। বিভূতিভূষণের ভাষার সূক্ষ্ম লাবণ্য ও লিরিক-মাধুর্য, প্রেমেন্দ্র মিত্রের তীক্ষ্ণদীপ্ত সাঙ্কেতিকতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবচেতন মনের বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ কোনোটিই এখানে নেই। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে পরিবেশ ও প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে, তা অনেক সময়ই কলাকৌশলবর্জিত ও বিশেষত্বহীন মনে হবে। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে আধুনিক ছোটগল্পের বিদ্যুৎগর্ভ অতর্কিত পরিসমাপ্তি ও তীক্ষ্ণ সাঙ্কেতিকতার অভাব। পল্লবিত কাহিনীবিন্যাস ও শিথিল পদক্ষেপ তাঁর গল্পগুলিকে অপেক্ষাকৃত মন্থর করে তুলেছে। কোনো কোনো গল্পকে তাই সহজেই উপন্যাসে পরিণত করা সম্ভব।

তারাশঙ্করের ভাষা ও স্টাইল কলাকৌশলবর্জিত—সহজ, সরল, অতির্যক ও উজ্জ্বল। বীরভূমের রুক্ষ ধূসর মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁর আভরণহীন ভাষার একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তারাশঙ্কর তাঁর ভাষা সম্পর্কে যা বলেছেন, তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না:

'…আমার পাত্রপাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায়—রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হই নি। সে শক্তি বোধহয় আমার নেই এবং সে চর্চা করার ঝোঁকও আমার জাগে নি।'[১১] তারাশঙ্করের গদ্যরীতিতে যাকে 'ত্রুটি' বলা হয়েছে, তা আসলে তাঁর শিল্পধর্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর শিল্পপ্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন মহাকাব্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। মহাকাব্যের এমন একটি বস্তুনিষ্ঠতা

১১ 'আমার সাহিত্য-জীবন' পৃ ২২

ও সরলতা আছে, যাকে বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি বলে মনে হয় না। উপন্যাস আধুনিক যুগের মহাকাব্য। তারাশঙ্করের কয়েকখানি উপন্যাস পড়লে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের শিল্পরীতি সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন ঃ 'বস্তুত, তারাশঙ্করের হাতে অজন্তার ভাস্করের তুলি নেই—তিনি তিব্বতী তান্ত্রিকদের রীতিতে 'মার'-এর ভয়ালতম রূপ ফুটিয়ে তুলতে চান।'[১২]

তারাশঙ্করের ভাষা, স্টাইল ও আঙ্গিকের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির প্রসঙ্গ কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় দুর্বলতা যথার্থ ঔপন্যাসিক প্রতিভার পক্ষে তেমন মারাত্মক ত্রুটি নয়। সমারসেট মম্, ব্যাল্‌জাক্, ডিকেন্স, তলস্তয় ও দস্তয়ভ্‌স্কি-সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'It is odd that the four greatest novelists the world has known should have written their respective languages so ill. It looks as though to write well were not an essential part of the novelist's equipment, but that vigour and vitality, imagination, creative force, observation, knowledge of human nature with an interest in it and sympathy with it, fertility and intelligence are more important.'[১৩] তারাশঙ্করের রচনারীতি ও আঙ্গিক সম্পর্কেও উদ্ধৃত অভিমতটি স্মর্তব্য।

তারাশঙ্করের রচনাশিল্পের ত্রুটি-দুর্বলতা তাঁর মৌলিক দৃষ্টি ও জীবনরসিকতাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কলাকৌশল, ভাষাশিল্পের নৈপুণ্য ও স্টাইলের চমৎকারিত্ব কথাসাহিত্যিকের অন্যতম শিল্পকৃতিত্ব হলেও, অপরিহার্য গুণ নয়। জীবনকে যিনি সমগ্রভাবে ও গভীরভাবে দেখতে পেয়েছেন তাঁর পক্ষে রচনাশিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি মারাত্মক দুর্বলতার কারণ নয়। আঙ্গিক রচনায় ও ভাষাশিল্পের সৌকর্যে অনেক তরুণতর কথাসাহিত্যিকও মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। কিন্তু তার জন্য তারাশঙ্করের গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ জীবন যেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতাবর্জিত নিতান্ত মনঃকল্পিত কয়েকটি

১২ 'বাংলা গল্প-বিচিত্রা' পৃ ১১৮

১৩ The World's Ten Greatest Novels (Premier Edition) Pages 66-67

চিত্র— তা যত উজ্জ্বল ও চিত্তহারীই হোক না কেন, প্রথম শ্রেণীর শিল্পের উপকরণ হতে পারে না। তারাশঙ্কর কৃত্রিম বা মনঃকল্পিত জীবনের নকৃশা রচনা করেন নি। অনাসক্তভাবে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের সুন্দর-অসুন্দরকে দেখেছেন। তাই জীবন থেকে নির্মম, কুৎসিৎ ও বীভৎসকে তিনি বর্জন করতে পারেন নি—জীবন-যজ্ঞশালায় সুন্দর-কুৎসিতের যে পূর্ণাহুতির লীলা চলেছে, তিনি তার কৌতূহলী দ্রষ্টা। এই তান্ত্রিকসুলভ দৃষ্টি তাঁকে জীবনরহস্যের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে কুৎসিৎ ও বীভৎস রস সযত্নে বর্জিত হয়েছে। এ কালের শক্তিশালী কথাসাহিত্যবিদের মধ্যে দু'একজন এই বিশেষ রসটির দিকে দু-একবার দৃষ্টিপাত করেছেন, কিন্তু তাও যেন নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসেবেই। এই রসের সাধনায় তারাশঙ্কর সিদ্ধশিল্পী। কারণ তাঁর বীভৎস উপকরণ, প্রকারান্তরে সুন্দরেরই পূজার অর্ঘ—এই বামদৃষ্টির অভ্রান্ত শরসন্ধানে তিনি অতলান্তশায়ী জীবনকেই বিদ্ধ করেন। কবি-সমালোচক মোহিতলাল 'কবি' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গির যে বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

'জীবনের রূপকার হইতে হইলে, জীবনের গ্রন্থই পাঠ করিতে হয়; সকল রূপকারই অল্পবিস্তর তাহা পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকলেই আপনাপন রুচি ও রসবোধের গণ্ডীর মধ্যে তাহা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ নিজ নিজ পিপাসায়—নিজ নিজ রসকল্পনার দৃষ্টিতে যেটুকু দেখিবার তাহাই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তারাশঙ্কর যেন জীবনকে আদৌ একটা ভিন্নতর পিপাসার বশে— রসাস্বাদনের জন্য বা রসকল্পনার বশে নয়—তাহার কলকব্জা, তাহার জটিল জাল-গ্রন্থি খুলিয়া দেখিবার একটা দুর্দমনীয় কৌতূহলে কেবল দেখিবার ও জানিবার আকুল ইচ্ছায়—বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। গল্পের প্লট সংগ্রহ করিবার জন্য নয়, জীবনকে চায়ে চুমুক দিবার মত সৌখীনভাবে একটু আস্বাদন করিবার জন্য নয়,...জীবনকে এক পলকমাত্র আধা-চোখে দেখিয়া, সেই দেখার অভিমানে গর-গর হইয়া জীবন-রহস্যের মহারসিক বা জীবনতত্ত্বের মহা-আচার্য বনিবার জন্যও নয়,—কেবল জীবনকে দেখার জন্যই, তাহাকে দেখার এই পিপাসা তারাশঙ্করের

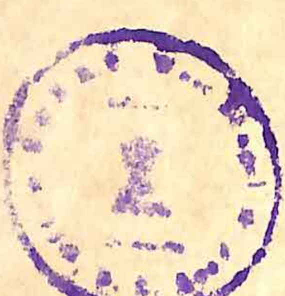
যেমন আছে, বা ছিল বলিয়া মনে হয়, ঠিক তেমনটি আমাদের ঔপন্যাসিক বা গল্পলেখকের ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না।'[১৪]

ব্যাল্‌জাক্ যেখানেই যেতেন, সেখানেই তাঁর সঙ্গে একটি নোটবই থাকত। যে সব ঘটনা ও চরিত্র প্রয়োজনীয় মনে করতেন, তা টুকে নিতেন। এইভাবেই গড়ে উঠত তাঁর ভবিষ্যৎ উপন্যাসের খসড়া। তারাশঙ্করের রচনার মধ্যেও এই জাতীয় বাস্তবের এক-একটি সুদৃঢ় 'ফ্রেম' আছে। সেই 'ফ্রেম'কে কারুখচিত করার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সকলেরই এই দুর্লভ শক্তি নেই, কারণ এঁদের মধ্যে সকলেই 'মূলত কথাশিল্পী' নন। প্রসঙ্গক্রমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। বিভূতিভূষণ মূলত কবিদৃষ্টির অধিকারী। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এক অভিনব ভাবদৃষ্টিতে বিগলিত করে তিনি মুগ্ধ মনের সঙ্গীত রচনা করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের দৃষ্টি নাট্যকারের দৃষ্টি, সেখানে বস্তুনিষ্ঠতা ও অনাসক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত জীবনকে তিনি এমনভাবে দেখেছেন যে, সেখানে তাকে নূতন করে শিল্পিত করে তোলার অবকাশ নেই। তাই তারাশঙ্করের অনেকগুলি উপন্যাসই নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ।

শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর অগ্রণীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। 'টাইপ' চরিত্রসৃষ্টিতে, জীবনরসিকতায়, হৃদয়াবেগবর্জিত অনাসক্ত দৃষ্টির মহিমায় তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলাসাহিত্যে তার আস্বাদন নূতন। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের প্রথম লগ্নে অনেকেই মনে করেছিলেন যে তিনি শরৎচন্দ্রের দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে ভুল ভেঙেছিল। যে যুগে তিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের নূতন রসাস্বাদনের ভিতর দিয়ে একটি রুচি গড়ে উঠেছিল। দেশের মাটির সঙ্গে তাঁদের যতখানি না পরিচয় ছিল, তার চেয়ে বেশী পরিচয় ছিল বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে। কিন্তু তারাশঙ্কর একটি আঞ্চলিক জীবনের মধ্যে, আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতার মধ্যে, এখনো যারা সেই বহু প্রাচীন সংস্কার-বিশ্বাস, ধর্মসাধনা, আচার-আচরণ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে নি তাদের মধ্যে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির যেটুকু

১৪ 'সাহিত্য-বিতান' (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ২৫৯

লুপ্তাবশেষ আছে, তাকে রূপ দিয়েছেন ; রাঢ়ের বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে বহুকাল-প্রচলিত বিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারগুলিকেও প্রাণরস-সমৃদ্ধ করেছেন। কারণ ঐগুলি বাদ দিলে একটি জাতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। অথচ বিশেষ দেশ-কালের মধ্যেই তিনি জীবনের শাশ্বত সত্যকেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই দুর্লভ জীবনরসিকতাই তারাশঙ্করকে অমরত্বের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করবে।



সাহিত্য-বিচিত্রা বারোটি প্রবন্ধের সংকলন। বিদ্যাসাগরের রচনা ও অন্তর্জীবন বিশ্লেষণে, হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাবলীর নূতন মূল্যনির্ণয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিচারে, রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতি পযালোচনায়, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশচন্দ্র, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ, তারাশংকরের শিল্পীমানস পরিক্রমায় ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যকৃতির আড়ালে সাহিত্যিকের অন্তর্জীবনকেও উদ্ভাসিত করা হয়েছে। লেখকের অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থের মতো এখানেও শ্রমনিষ্ঠ গবেষণার সঙ্গে রসদৃষ্টির বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছে।

জিজ্ঞাসা

মূল্য ॥ ৮·৫০ পঃ